নায়কের মতো

নায়কের মতো

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন প্রভাতী সংবাদপত্রের সামনে সহস্র হৃদয় সহসা মুহূর্তেক স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ধূ ধূ শূন্যতা, হাহাকার, এবং ইত্যাদি··· । কেননা প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হরফের এবং বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের স্থানিক গুরুত্বে ছিল সেই মর্মান্তিক সংবাদ। রুপালী পর্দার প্রেম-প্রণয়-শৌর্যবীর্যের একচ্ছত্র নায়কোত্তম, উদ্ভিন্ন এমন কি অগণিত অন্ত্য-যৌবনারও হৃদয়-হুতাশ এবং লক্ষ যুবকের স্বপ্ন-পুরুষ অরুণকুমার চিত্র গ্রহণের সময় গুরুতর আহত হয়ে নার্সিং হোমে।

সংবাদটির আবেগ-মূল্য—ইমোশন্যাল ইমপ্যাক্ট—এবং সে কারণে সংবাদ-মূল্য সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। ফলত তথ্যের সঙ্গে অনুমানের মিশেল দেয়া বিস্তৃতি প্রতিটি সংবাদপত্রের বিবরণেই ছিল। শহর সেই সকালে সংবাদপত্রে অতি-মাত্রায় মনোযোগী হয়েছিল সন্দেহ নেই, এবং সেই আবেগ ও মনোযোগ ছিল নিখাদ খাঁটি সোনা।

অবশ্য কিছু মানুষ নির্বাচন, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ডের আটপৌরে দলের কাছে ভারতীয় দলের শোচনীয় পরাজয় প্রভৃতি গতানুগতিক খবরের মতো এ খবরটিকেও নিরাবেগ অভ্যাসে গ্রহণ করেছিল। এদের বোধ হয় স্বাভাবিক মানুষ বলা যায় না।

কিন্তু একটি সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে, প্রধানত তার রুজি-রোজগার এবং ভবিষ্যতের ভাবনায়, খবরের কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল। সামনে নিচু পর্দায় খোলা রেডিও, অর্থাৎ আকাশবাণীর খবরে কি বলে তাও তার জানা দরকার।

প্রশ্নটা বলা যায় তার অস্তিত্বের। কারণ সে অরুণকুমারের ডামি।

গতকালের ঘটনার সময় সেও দৃশ্যে ছিল। এ ছবিতে অরুণকুমারের অভিনয় দ্বৈত চরিত্রে। তাছাড়া প্রচুর অ্যাকশন। অ্যাকশনের দৃশ্যগুলিতে ডামি নিলয়কেই অভিনয় করতে হয়। অরুণকুমারের পক্ষে দৌড়ঝাঁপ ঘুষোঘুষি সম্ভব নয়। ঝুঁকি নেবার চেষ্টাও সে করবে না বা কেউ তাকে ঝুঁকি নিতে বলবেও না। অথচ আজকাল অ্যাকশন ছাড়া ছবি চলে না। তাদের প্রিয় নায়ক জীবনের দুরন্ত সমস্যাগুলোকে টপাটপ লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে, দু'চারটে ঘুষি-লাথি-ক্যারাটের প্যাঁচ-পয়জারে কুপোকাত করে দিচ্ছে, এসব না থাকলে আর দর্শকের আনন্দ কি? সিনেমা

দেখাই বা কেন ? সিনেমার বাইরে জীবনটা বড় হ্যাপা হে। কোনো কাজ সহজে হবার উপায় নেই। অথচ সিনেমায় দেখ কত সহজে ব্যাপারগুলো মিটে যাচ্ছে। আর সেই মিটিয়ে দেবার ব্যাপারগুলো যদি অরুণকুমারের মতো নায়ককে দিয়ে হয় তবে কথাই নেই।

আহা কি চেহারা, কি তাকানো, কি ডায়ালগ বলার কায়দা। বাকিটুকু করে দেবার জন্য আছে নিলয়। দুরন্ত ঘোড়ার পিঠে উর্ধ্বশ্বাস দৌড়ে অরুণকুমার। লং শট্। বাসের এয়ার-হর্নের মতো তীক্ষ্ণ শিসের শব্দে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। অরুণকুমারের সঙ্গে নিলয়ের চেহারার যেটুকু অমিল দূরত্ব তাও মুছে দিয়েছে। অতএব···জিতা রহো গুরু ! ক্লোজে-আপে ঘোড়ার পিঠে অরুণকুমারের শরীরের উর্ধ্বাংশ দুলছে, কেয়ারি-করা চুল এলোমেলো হয়ে ঘামে-ভেজা মুখের ওপর অদ্ভুত অগোছাল গোছানো কায়দায় নেমে এসেছে। অরুণকুমার বেঞ্চে বসে শরীর দোলাচ্ছে। হাতের লাগামের অন্যদিক ডাইরেকটরের হাতে—ক্যামেরার ফ্রেমের বাইরে। এবার সম্পূর্ণ ঘোড়া—ঘোড়া ঘুরল—অরুণকুমারের পেছন—নিলয়। অরুণকুমারের গলা—হেট্ হেট্ জলদি। গোটা ফ্রেম জুড়ে দিগন্তের ব্যাকগ্রাউণ্ডে ঘোড়ার পিঠে অরুণকুমারের ছায়ামূর্তি—নিলয়। নিলয় নয়, অরুণকুমার ! অরুণকুমার ! মারহাব্বা ! আকাশে হেলিকপটার। হেলিকপটার থেকে নেমে এল দড়ির সিঁড়ি। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে দড়ি ধরে শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে হেলিকপটারে উঠে যাচ্ছে নিলয়। নাঃ নিলয় নয়, অরুণকুমার। অরুণকুমার !

আসলে নিলয় নামের একজন সুন্দর শরীরের এবং আশ্চর্য শারীরিক দক্ষতার অধিকারী তিরিশ বছরের যুবকের শরীরী অস্তিত্বের অতিরিক্ত যে 'আমি'টুকু, যা মানুষকে দেয় বেঁচে থাকার অহংকার—গৌরব, তা যেন কেমন অস্পষ্ট অবাস্তব হয়ে গেছে। তবু, মানুষকে বেঁচে থাকতেই হয়, বেঁচে থাকার জন্য ভাবতে হয়, বেঁচে থাকার ফন্দিফিকিরগুলো না খুঁজলে চলে না।

মাঝে মাঝে সিনেমা হলে বসে অরুণকুমারের কোনো ছবি দেখতে দেখতে তার নিজের অভিনীত দুঃসাহসিক দৃশ্যগুলোকেও নিলয় নিজের বলে ভাবতে পারে না, মনে হয় একদা কোনো অলীক স্বপ্নে হয়তো বা সে নিজেকে এইসব দৃশ্যের নায়ক ভেবেছিল। মানুষের অস্তিত্বের কতটুকু তার নিজের ? অথবা নিজের বলে সত্যিই কিছু আছে কি ? এমনতর জটিল দার্শনিক প্রশ্নও যে কখনো কখনো তার মনে উঁকি দিয়ে যায় না তা নয়।

"স্থানীয় সংবাদ পড়ছি ··। দ্রুত খবরের কাগজের পাতা থেকে চোখ সরিয়ে রেডিওর চাবি ঘোরাল নিলয়। আওয়াজ বাড়ল, বেশি নয়, পাশেই খাটে ঘুমোচ্ছে বাবুসোনা —নিলয়ের দু'বছরের ছেলে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বারোদ্ঘাটনের খবরের পরেই অরুণকুমারের খবর। নাঃ, নতুন কিছু নেই। খবরের কাগজে যা লিখেছে তা-ই। নার্সিং হোমের নাম খবরের কাগজে দেয়নি, রেডিও-ও বলেনি। না বলার কারণও আছে। ভিড় সামলাতে তাহলে সেখানে শহরের সমস্ত পুলিসকে জড়ো করতে হবে। আইনশৃঙ্খলার সমস্যা বলে কথা। কালই হয়তো প্রশাসনিক ও পুলিসী ব্যর্থতা নিয়ে বড় বড় নেতাদের বিবৃতি বেরুবে কাগজে। এ জিনিস চলতে দেয়া যায় না, দেয়া উচিত নয়, অবিলম্বে হস্তক্ষেপ না হলে দেশ রসাতলে যাবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ছকটা নিলয়ের জানা হয়ে গেছে।

কিন্তু তার এখন কর্তব্য কি? দু'এক জায়গায় খোঁজ নিলেই সে জানতে পারবে অরুণকুমার কোন্ নার্সিং হোমে আছে। তারপর? তারপর হয়তো সেখানে টেলিফোন করে খবর নিতে পারে। কিন্তু সত্যিই কি কোনো প্রয়োজন আছে? যখন টেলিফোনে ওরা জানতে চাইবে তার পরিচয়, তখন কি বলবে সে? বলবে যে, সে অরুণকুমারের ডামি? অসম্ভব। হাস্যকর। এটা কোনো মানুষের পরিচয় হতে পারে না। বলবে শুধু তার নাম নিলয় মজুমদার? এটা আরো হাস্যকর। এ নামটি তার খুব কাছের কয়েকটি মানুষ ছাড়া কারো কাছেই কোনো অর্থ বহন করে না। অর্থাৎ, অরুণকুমার যদি সজ্ঞানেও থাকে তবু নিলয় মজুমদার নামের একটি মানুষ যে তার খোঁজখবর নিয়েছিল সে খবর তার কাছে পৌছবে না। আর না পৌছলে খবর নেয়াও অর্থহীন। সে তো এমন কোনো মানুষ নয় যারা অন্য মানুষের খবর নিলেও (এমন কি টেলিফোনেও) সেটা খবর হয়ে যায়।

অনেক অনুরোধ করেও নিজের নিলয় মজুমদার নামটা সে কোনো ছবির ভূমিকা-লিপিতে তোলাতে পারেনি। তাতে নাকি জানাজানি হয়ে গেলে অরুণকুমারের ইমেজ চোট খেতে পারে। আশঙ্কাটা অরুণকুমারের নিজেরই কিনা তা অবশ্য তাকে কেউ বলেনি।

একটা অদ্ভুত নামের সান্ত্বনা তাকে দেয়া হয়েছে—জনি। অনেকবারই তার বলতে ইচ্ছে হয়েছে, এ নামটা দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, দেয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু বলতে সে পারেনি, বলা তার মতো লোকদের সাজে না। তাই অরুণকুমারের অধিকাংশ ছবির ভূমিকালিপির শেষের দিকে যেখানে অনেকগুলো নাম·

জড়াজড়ি করে দ্রুত সরে যায় সেখানে একটা নাম থাকে—জনি—যে কে বা কি, ছবিতে কি তার ভূমিকা তা নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ মাথা ঘামিয়েছে বলে নিলয়ের জানা নেই। বরং মাথা না ঘামানোয় সে খুশি। সিনেমায় সে কি কাজ করে কখনো এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলে নিলয় ব্যাপারটাকে নিজেই খুব সহজ করে দেয়—'আমি আর কি করব, রিকুইজিশন সাপ্লাই করি।' অনেক জটিল কঠিন কাজ করার গৌরবের দাবিদার হওয়ার চেয়ে বরং নিজেকে ছোটখাট সাদামাটা একজন ব্যবসায়ী বলায় স্বস্তি মেলে ঢের বেশি। এর মধ্যে অরুণকুমার-নিলয় মজুমদার-জনির অস্তিত্বের ঘোলাটে ব্যাপারগুলো নেই।

কেউ হয়তো বলে—'তোমার চেহারাখানা জব্বর হে, হঠাৎ দেখলে অরুণকুমার বলে ভুল হয়। সিনেমার লাইনে যখন আছ, নেমে পড়লেই পার। ভালো পয়সা।' নিলয় হাসে—'ঐ চেহারা নিয়েই যে মুশকিল দাদা। ভগবান যে ছাঁচখানায় অরুণকুমারকে বানিয়েছিল আমাকেও সেইটাতেই বানিয়ে ফেলে গোলমাল করেছে।'

সংবাদের প্রয়োজনীয় অংশটুকু শোনার পর খবরের কাগজ বা রেডিও কোনোটাতেই মনোযোগ ছিল না নিলয়ের। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ কোনো অনুপ্রবেশকারীর তারস্বরের রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সম্বিৎ ফিরে আসতে সে রেডিও বন্ধ করে দিল। তাকাল বিছানার দিকে। বাবুসোনা মোড়ামুড়ি দিচ্ছে। এবার উঠবে হয়তো। উঠেই শুরু করবে দস্যিপনা। যেদিন সকালে কাজ থাকে না বাবুসোনাকে নিয়েই বেশ কেটে যায় সময়। নিনারও ঘরের কাজে সুবিধা হয়। কিন্তু আজ ছেলের দিকে তাকিয়ে বসেই থাকে নিলয়, অন্যদিনের মতো এগিয়ে গিয়ে কোলে তুলে নেয় না। শক্তসমর্থ চনমনে শরীরটা যেন আজ হঠাৎই বড় অকেজো হয়ে পড়েছে।

নিনা ঘরে এল চায়ের পেয়ালা নিয়ে। টেবিলে নিলয়ের সামনে পেয়ালা রেখে বাবুসোনাকে কোলে তুলে নিল। এক হাতে টেনে-টুনে ঠিকঠাক করে দিল বিছানার চাদর। বালিশগুলো সাজিয়ে রাখল।

চায়ের পেয়ালায় অন্যমনস্ক চুমুক দিচ্ছে নিলয়।

ছেলেকে কোলে নিয়ে পা মুড়ে বিছানায় বসে নিনা বলল—কি ভাবছ?

নিলয় তাকাল, হাসল বা হাসবার চেষ্টা করল।

কাল রাতে স্টুডিও থেকে ফিরে নিনাকে সবই বলেছে নিলয়। নিনা বোঝে, অনেক কিছুই বোঝে, যা হয়তো ওর মতো মেয়েরা বোঝে না বলেই লোকের

ধারণা। কাল রাতেও নিনা যে বোঝে তার প্রমাণ আরো একবার পেয়েছিল নিলয়। ও নিলয়কে সাহস দিতে চেষ্টা করেনি, অবাস্তব কোনো পরামর্শ দেয়নি, অসম্ভব কোনো মেয়েলী পরিকল্পনাও হাজির করেনি। নিনা কখনো স্পষ্ট করে বলেনি, কিন্তু নিলয় অনুভব করে ওর বেঁচে-থাকা আর অস্তিত্বের মধ্যেকার বিরাট ফাঁক আর ফাঁকিটা নিনার মতো করে বুঝতে আর কেউ পারে না। আর সেজন্যেই একান্ত কাছের মানুষ হয়েও সেই ভীষণ পলকা জায়গাটা নিনা কখনো ছুঁতেও চেষ্টা করে না।

ঘটনাটা শুনে নিনা শুধু বলেছিল—'দেখ কি হয়। এখন পারলে ঘুমোও।' এই ছোট্ট না-বানানো কথা ক'টির মধ্যে এমন গভীর বন্ধুত্বের আশ্বাস ছিল যা নিলয়কে ভীষণ কোমল আর উচ্ছল করে তুলেছিল তখন।

না, এই একটি ক্ষেত্রে কোনো ভুল করেনি নিলয়। সিনেমার একটি এক্সট্রা মেয়েকে বিয়ে করা নিয়ে স্বজন মহলে কম তোলপাড় হয়নি সেদিন। বাবা আর বড়ভাই সেই থেকে কোনো সম্পর্কই রাখে না।

তাদের দোষ দেয় না নিলয়। সিনেমার এক্সট্রা মানেই তো সন্দেহজনক চরিত্রের মেয়ে। সামান্য টাকার টুকরো কাজে আসত শহরতলির কলোনি থেকে। সেখানে এখনো একখানা মেটে ঘরে থাকে ওর বাবা-মা বড় দু'ভাই। ভাইরা সামান্য রোজগার করে—সোজা পথে নয়, বাঁকা পথে। বাঁকা পথের রোজগারীদের কর্তব্য-দায়িত্বের বোধও তেমন সরল থাকে না। ওরা ইচ্ছে মতন সংসারে কিছু কিছু দেয়। নিনা মাঝে মাঝে দশ-বিশ টাকার এক্সট্রার কাজ করে সংসারে সাহায্য করার চেষ্টা করত—বোকার মতোই চেষ্টা। এর বাইরে যদি নিনার জীবনে সন্দেহজনক কিছু থাকে তা জানার কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি নিলয়। নিনার ঘনিষ্ঠতাই সে প্রয়োজন ওকে বোধ করতে দেয়নি। লোকে কি ভাবল না-ভাবল তাকে আমল দেয়নি।

তার ধারাটাই ঐ রকম। সকলের আপত্তি সে প্রায় নিঃশব্দেই পাশ কাটিয়ে গেছে। শুধু দাদার আপত্তি নোংরামির কাছাকাছি চলে যাওয়ায় বলেছিল—'তুমি এলেমদার লোক, ভালো লেখাপড়া জান, ভালো চাকরি কর, তোমার বৌও এসেছে ভালো ঘরের। আমি সিনেমার ডামি, আমার এক্সট্রাই ঠিক আছে। সবার এক জিনিস সয় না, তোমার মতো বৌ আমার সইবে না, তারও আমাকে সইবে না।' দাদা এরপর নিলয়কে ভাই বলে স্বীকার না করার কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছিল।

পাশের ঘরে অর্থাৎ রান্নাঘরে বাবুসোনাকে দুধ খাওয়ানো নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কখন এক ফাঁকে ঘর থেকে চলে গেছে নিনা, নিলয় খেয়াল করেনি। নিনার গলায়

শাসন, ধমক, আদর। ছেলে তো নয় খুদে ডাকাত একটি। মুখে শব্দ করে না বিশেষ, যত দাপাদাপি হাতে পায়ে। একেবারে হিমসিম খেয়ে যায় নিনা। মা-ব্যাটার লড়াই উপভোগ করে নিলয়, সুযোগ পেলে নিজেও কিঞ্চিৎ ভাগ নেয়। এখন সে ইচ্ছাটা চিন্তার চাপে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

সমূহ ভাবনা কয়েকটা বড় খরচ। পরশু ফ্ল্যাটের ইনস্টলমেণ্ট দেবার শেষ তারিখ। তার পরে দিলে ইণ্টারেস্ট গুনতে হবে। সরকারী দাক্ষিণ্যের ফ্ল্যাট বলে বাঁচোয়া। তিন মাসে সাড়ে চারশো টাকার মতো পড়ে। কুড়ি বছর দিয়ে যেতে পারলে মালিকানা নিজের। অবশ্য খুবই ছোট ফ্ল্যাট। সাকুল্যে তিনশো স্কোয়ার ফুট জায়গা হবে কিনা সন্দেহ। তবে যা দিনকাল পড়েছে এ ফ্ল্যাটও তিন-চারশো টাকায় ভাড়া দিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে কেউ কেউ।

এ ফ্ল্যাটে ফ্রিজ টি.ভি দামী ফার্নিচারের প্রসাধন মানায় না। সে সাধ্যই বা কোথায় নিলয়ের। বহুকাল পালিশ না পড়া সাধারণ খাট, টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, দু'খানা চেয়ার, একটা শস্তা দামের ঢেউ-খেলানো স্টীলের (?) আলমারি—শোবার ঘরে এদের অবস্থান। বাইরের ঘরে (সাত ফুট বাই আট ফুট দেয়ালঘেরা জায়গাকে ঘর বলতে হাজার আপত্তি থাকলেও আইনত সেটা ঘরই) পুরনো চৌকির ওপর তোশক পেতে এস. টি. সি'র দোকান থেকে কেনা শস্তা রঙিন বেডশীটে চৌকির পায়া পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে বেশ শৌখিন ভদ্র চেহারার বসার জায়গা করে দিয়েছে নিনা। বাইরের লোকজন এলে সেখানে বসে। পর্দা ঝুলিয়ে আব্রু বাঁচানো। কিন্তু তিনশো স্কোয়ার ফুটে শব্দের গতি অবাধ।

একবার হিলটন স্ট্রীটে অরুণকুমারের ফ্ল্যাটে যেতে হয়েছিল নিলয়কে। একবারই। হাতাহাতি লড়াইয়ের ক্লোজ-আপ শটের জন্য তালিম দিতে। সাদা জিনের কড়া ইস্তিরির সাফারি পরা খানদানী চাকর একের পর এক ঘর পার করে নিলয়কে নিয়ে গিয়েছিল অরুণকুমারের শরীরচর্চার ঘরে।

নিলয় যতদূর সম্ভব আদেখলেপনা না দেখানোর চেষ্টা করেও ইনটিরিয়র ডেকরেশনের চূড়ান্ত দেখে এসেছিল। টাকার অঙ্কে এর দাম অনুমান করার সাধ্য তার নেই। আর, যেটুকু দেখেছিল তাতেই মনে হয়েছিল অন্তত তার ফ্ল্যাটের মতো আট-দশখানা ফ্ল্যাটের জায়গা ওখানে হয়ে যেতে পারে।

প্রচুর টাকা যাদের হাতে, তাদের বোধ হয় টাকা খরচ করাটাও সমস্যা। নইলে অত বড় ফ্ল্যাট নিয়ে কি করে অরুণকুমার? লোক মোটে দু'জন। বাবা, মা, প্রথম

পক্ষের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সব পৈতৃক বাড়িতে। এ ফ্ল্যাটে দ্বিতীয় পক্ষ সুলক্ষণাকে নিয়ে অরুণকুমার।

দ্বিতীয় পক্ষটা সত্যিই পক্ষ কিনা, আইনের পক্ষপাত এ ব্যাপারে কোন্‌দিকে তা নিয়ে মাথা ঘামানো নিরর্থক। টাকা থাকলে এমন অনেক অধিকার কিনে নেয়া যায়, টাকা না থাকলে যা ভাবাও পাপ। নিলয় নিনাকে বিয়ে করেও শুধুমাত্র ভালোমন্দের কতগুলো বদ্ধমূল ধারণার কাছে মার খেয়েছে। আর অরুণকুমার বেমালুম পয়সা দিয়ে সেগুলোকে কিনে ছেঁড়া কাগজের মতো হাওয়ায় দিয়েছে উড়িয়ে।

অথচ অরুণকুমারের লড়াকু নায়কের ইমেজ নিলয় ছাড়া মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। কিন্তু এমনই মজার নিয়মে চলে রঙ্গজগৎ—দু'জনের দামের ফারাক আসমান-জমিন। অরুণকুমারকে দিয়ে কাজ করানোর জন্য তার দরজায় প্রযোজক-পরিচালকের ধরনা, আর নিলয় কাজ খুঁজে খুঁজে হাল্লাক। অরুণকুমারের দাম ঠিক করে সে নিজে, আর নিলয় তার দামের ব্যাপারে বড় জোর মোলায়েম প্রার্থনা পর্যন্ত যেতে পারে। যে ছবিতে অরুণকুমারের ডামি হতে হয় তাকে সেখানে দু'পয়সা বেশি মেলে। অন্য ছবিতে পাইকিরি মারপিটের দৃশ্যে অভিনয়ের জন্য লোক প্রচুর—পয়সাও কম।

কাল পেমেণ্ট মেলেনি। দু'হাজার টাকার চুক্তিতে কাজ। পাঁচশো টাকা দেবার কথা ছিল। কিন্তু অরুণকুমার চোট খেয়ে পড়ে যেতেই এমন কাণ্ড শুরু হয়ে গেল যে টাকার কথা তখন কে কাকে বলে।

প্রোডিউসার ডাইরেকটর অরুণকুমারকে গাড়িতে নিয়ে সাঁই সাঁই বেরিয়ে গেল স্টুডিও থেকে। অন্য কর্মকর্তারাও একেকজন ছুটল একেকদিকে। পড়ে রইল শুধু জন কয় ঠুঁটো জগন্নাথ আর ছুটকো আর্টিস্ট। তখন মনে হয়েছিল ও কিছু না, বড়-লোকের আতুসেপনা। এখন খবরের কাগজ পড়ে আর রেডিও শুনে হাড় হিম। অরুণকুমার খাড়া না হতে ছবির কাজ তো বন্ধই, পয়সাও প্রোডিউসারের পকেটে। অথচ এই পাঁচশো টাকার বড় দরকার ছিল নিলয়ের। হাতে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে তিরিশ টাকা আছে কিনা সন্দেহ। কি করা যায়? টাকা জোগাড় করতেই হবে। ফ্ল্যাটের ইনস্টলমেণ্ট না হয় না দিল। পরে সুদ দিয়েই দেবে। কিন্তু সংসারের নিত্যদিনের চাকায় তেল ঢালতেই হবে। সেটা আসে কোথা থেকে?

সাত-পাঁচ চিন্তায় নাজেহাল নিলয় অন্যমনস্কভাবে পাজামা ছেড়ে প্যাণ্ট-শার্ট পরে নিল।

—বেরুচ্ছ? নিনা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল।

নিলয় উত্তর দেবার আগেই টলমল পায়ে ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরল বাবুসোনা। ঝুঁকে ওকে কোলে তুলে নিল নিলয়। বাবুসোনা তার সাংকেতিক ভাষায় জানাল—বেই যাই।

—না বাবা, নিলয় বলল, এখন বেই না। কাজে যাচ্ছি।

—আজ তো শ্যুটিং নেই, কোথায় যাচ্ছ? নিনা বলল।

বাবুসোনাকে আদর করতে করতে নিলয় বলল—ভাবছি একবার জগদীশদার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

জগদীশদা প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট। বয়স্ক, খোলামেলা স্বভাবের মানুষ। বুদ্ধি রাখে। বুদ্ধি দিয়ে উপদেশ দিয়ে নিলয়কে ফিল্মী দুনিয়ার গোলকধাঁধায় চলতে সাহায্য করে। আর সংসারের ঘাঁতঘোঁতগুলো বুঝিয়ে দেয় নিনাকে। ওর চায়েরও একজন বড় সমঝদার জগদীশদা।

—ব্যাপারটা তোমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে মনে হচ্ছে। নিনার ঠোঁটের কোনায় এক চিলতে হাসি।

—কিসে বুঝলে?

—নইলে সাতসকালে জগদীশদার কাছে ছুটছ?

বাবুসোনার গালে নাক ঘষতে ঘষতে নিলয় বলল—ভাবনার কথাই কিন্তু। তাছাড়া কিছু টাকার ব্যবস্থাও করতে হবে।

নিনা হাত বাড়িয়ে নিলয়ের কোল থেকে অনিচ্ছুক বাবুসোনাকে টেনে নিল। বাবুসোনার প্রতিবাদ জানানোর ভাষা বেশির ভাগ বাচ্চার মতো কান্নাকাটি নয়। প্রহারে তার আস্থা বেশি। দু'হাতে সে মায়ের চুল টেনে ধরল।

—ছাড়্, চুল ছাড়্। উঃ লাগছে···

হেসে দরজার দিকে এগোল নিলয়।

২

দুই যমজ ভাই—শেখর আর রাজেশ। একেবারে ছেলেবেলায় রাজেশ হারিয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিপুল বিত্তশালী পিতার হৃদয়ে এই ব্যর্থতা বড়ই বেদনার সৃষ্টি করেছিল। যতদিন বেঁচে ছিলেন কোনো উত্তেজনার কারণ ঘটলেই বাঁ হাতে বুকের বাঁ দিকে যেখানে হৃৎপিণ্ড নামক যন্ত্রটি থাকে সেই জায়গাটা চেপে ধরতেন। এবং এইভাবে বুকের বেদনাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় বুকে হাত চেপেই তিনি উলটে পড়েছিলেন।

এখন শেখর পূর্ণ যুবক। বাবার বিরাট সম্পত্তির যোগ্য উত্তরাধিকারী। সে অক্লেশে চারটে বড় বড় কোম্পানি চালায়। ভালো গান গায়। ঘোড়ায় চড়ে। দারুণ ড্রাইভ করে। প্লেন চালাতেও সমান ওস্তাদ। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করে। এতসব করার পর একটি আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে নিয়মিত প্রেমও করে।

কাজ ও প্রেমের অবিশ্রান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও সে কিন্তু বড় একা। মনে তার বড় কষ্ট। হারানো ভাই, যে ভাইকে তার মনেও পড়ে না, তাকে সে ফিরে পেতে চায়। বাবার নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা সে ভুলতে পারে না। কেবলই মনে হয় রাজেশকে খুঁজে বের করতে পারলেই বাবার স্মৃতির প্রতি যথার্থ মর্যাদা দেখানো হবে।

এদিকে রাজেশ কিন্তু সত্যিই হারিয়ে যায়নি। সুচতুর চক্রান্ত করে তাকে চুরি করেছিল দুর্ধর্ষ মাফিয়া কিং হাজি সুলতান। রাজেশের নাম এখন প্রীতম। সুলতানের সে ডান হাত। সুলতান কিন্তু প্রীতমকে জানায়নি তার আসল পরিচয়। গভীর চক্রান্তের জাল সে বুনে চলে।

একদিন সুলতান প্রীতমকে ডেকে দেখায় শেখরের ছবি। অবাক হয়ে যায় প্রীতম অবিকল তারই ছবি দেখে। সুলতান বলে—'এ হচ্ছে শেখর চৌধুরী। কোটি কোটি টাকার মালিক। এর সঙ্গে তোমার চেহারার আশ্চর্য মিল দেখে কয়েক বছর আগে আমার মাথায় একটা জব্বর প্ল্যান এসেছিল। এতদিন ধরে নিখুঁতভাবে প্ল্যানটা আমি তৈরি করেছি। এবার কাজে লাগবার সময় প্রীতম।' বলে প্রীতমের হাতে মোটা একটা ফাইল দিয়ে আবার বলতে থাকে সুলতান—'এ ফাইলে আছে সবকিছু যা শেখর হতে গেলে তোমার দরকার। এমন কি, ওর হাতের লেখার স্পেসিমেন, সই—সব। ওর ম্যানেজারকেও আমি টাকা দিয়ে হাত করেছি। তার কাছ থেকে তুমি সবরকম সাহায্য পাবে। এখন শুধু তোমার শেখর হবার সাধনা। তুমি তৈরি হয়ে গেলেই আসল শেখরের আর দুনিয়ায় থাকবার দরকার হবে না। হাওয়ার মতোই সে মিলিয়ে যাবে। অবশ্য সে কাজটাও তোমাকেই করতে হবে, কেননা তুমি আমি আর ম্যানেজার ছাড়া এ কাজের কোনো সাক্ষী আমি রাখতে চাই না। তারপর নকল শেখর চালাবে আসল শেখরের রাজত্ব। হাঃ হাঃ।'

এখন পর্যন্ত গল্পের এটুকুই জানা গেছে।

শেখর আর রাজেশ তথা প্রীতম দুই চরিত্রেই অভিনয় করছে অরুণকুমার। রিস্ক-শটে নিলয়কেও দুই চরিত্রেরই ডামি হতে হচ্ছে।

দৃশ্যটা ছিল এই রকম :

রাজেশ সুলতানের নির্দেশে শেখরকে খুন করতে যাচ্ছে।

গভীর রাত। শেখরের প্রাসাদোপম বাড়ির পেছনে বাগান। বাগানের বাইরে কালো অ্যামবাসাডর থেকে নামল রাজেশ (অরুণকুমার)। অ্যামবাসাডর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল রাজেশ (অরুণকুমার)—ভঙ্গি হিংস্র, সতর্ক। উঁচু দেয়ালের ওপর রাজেশ (নিলয়), বাগানে লাফিয়ে নামল সামারসল্ট খেয়ে। বাগানের গাছগাছালি আলো-আঁধারির মধ্যে রাজেশ, নিঃশব্দ পায়ে আড়াল খুঁজে খুঁজে এগিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে মুখের ক্লোজ-আপ (অরুণকুমার)। রেন-পাইপ বেয়ে শেখরের শোবার ঘরের জানলার দিকে উঠে যাচ্ছে রাজেশ (নিলয়)। শেখরের শোবার ঘর। বিছানায় শেখর (অরুণকুমার), জানলার কাছে রাজেশ (অরুণকুমার) —হাতে ছোরা। শেখরের ঘুম ভেঙে গেল। ফাইটিং সিন। লং মিড আর ক্লোজ শটের মিক্স-আপ। প্রয়োজনমতো অরুণকুমার আর নিলয়। কখনো অরুণকুমার শেখর, কখনো অরুণকুমার রাজেশ। কখনো নিলয় শেখর, কখনো নিলয় রাজেশ। টুকরো টুকরো ভাঙা ভাঙা শটগুলো জুড়ে জুড়ে জব্বর একখানা লড়াইয়ের দৃশ্য। দর্শকের চোখে ডাবল রোলে অরুণকুমারের অবিশ্বাস্য অভিনয়।

কনটিনিউয়েশন শট্ :

বারান্দা দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে রাজেশ। তাকে তাড়া করে ছুটে আসছে শেখর। একেক লাফে তিন-চারটে করে সিঁড়ি ভেঙে বিরাট ড্রইংরুমে নেমে গেল রাজেশ (নিলয়)। রেলিঙে-চেপে বাচ্চাদের স্লিপ খাবার মতো সড়াৎ করে নিচে চলে এল শেখর, বিরাট চারকোণা টেবিলের ওপর দুটো ভল্ট খেয়ে একেবারে গিয়ে পড়ল রাজেশের ঘাড়ের ওপর—অবশ্যই মিড ও লং শটে নিলয়। হাতাহাতি লড়াই।

শেখর ও রাজেশের বিপজ্জনক অ্যাকশনগুলো নিলয়কে দিয়ে টেক করা হল ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল এমনভাবে ঠিক করে যাতে দর্শক অরুণকুমারের বদলিকে কোনো-মতেই বদলি বলে চিনতে না পারে।

লাস্ট শটেই গোলমালটা হয়ে গেল। মিড আর লঙের মাঝামাঝি জায়গা থেকে ক্যামেরা শেখর আর রাজেশকে ফ্রেম করেছে। হাতাহাতি ঘুষোঘুষি চলছে। শুধু পোশাকের পার্থক্য দেখে বোঝা যাবে কে শেখর আর কে রাজেশ।

শেষ পর্যন্ত রাজেশ শেখরকে চোট দিয়ে পালিয়ে যাবে। না পালালে গল্প থাকে না, ওখানেই শেষ হয়ে যায়।

শেখর (অরুণকুমার) রাজেশ (নিলয়) দু'জনে মুখোমুখি। পরস্পরের গলা টিপে ধরেছে।

ক্যামেরা মিড-জোন থেকে ক্লোজের দিকে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। পরিচালকের নির্দেশমতো অরুণকুমারের মুখ সোজাসুজি ক্যামেরার দিকে, নিলয়ের মুখ ঘোরানো। ক্যামেরা খুব কাছ থেকে অরুণকুমারের এক্সপ্রেশন ধরে রাখছে। কাট্‌। ও. কে।

বাকি সামান্য একটু কাজ। নিলয় ডান হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ঘুষি চালাবে অরুণকুমারের তলপেটে। এখানেই কায়দা। ঘুষিতে প্রচণ্ড জোরের ভঙ্গি থাকবে, কিন্তু জোর থাকবে না, ইমপ্যাক্ট থাকবে না।

ক্যামেরা আবার পিছিয়ে গেল মিড জোনে। যেমন নির্দেশ ছিল ঘুষি চালাল নিলয়। অরুণকুমারের পোশাকও তার ঘুষি ছুঁল কি ছুঁল না। নিখুঁত এক্সপ্রেশন দিয়ে অরুণকুমার পেট চেপে উপুড় হয়ে পড়ল টেবিলের ওপর। নিলয় আড়চোখে দেখে চোঁচা দৌড়ল। কাট্‌। ও. কে।

কিন্তু তারপরই ব্যাপারটা আর ও. কে রইল না। অরুণকুমার উপুড় হয়েই আছে টেবিলের ওপর, গোঙাচ্ছে। অন্য কেউ হলে রসিকতা বলে মনে করা যেত। কিন্তু অরুণকুমার অভিনয়ে ছাড়া রঙ্গ-রসিকতার ধার ধারে না। অতএব ব্যাপার গুরুতর।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে শোয়ানো হল সোফায়। ত্রস্তব্যস্ত প্রোডিউসার ডাইরেকটর। অন্যরা তটস্থ।

কাতরাতে কাতরাতে অরুণকুমার বলল—যা হোক ব্যবস্থা করুন। অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে।

প্রোডিউসার ছুটে এসে সেটের এক কোনায় দাঁড়ানো নিলয়কে জিজ্ঞেস করল—ঘুষিটা কানকটেড হয়েছিল নাকি? তার চোখে স্পষ্ট সন্দেহ ও রাগ।

—না, না, সভয়ে বলে উঠল নিলয়, ছোঁয়া পর্যন্ত লাগেনি। আমার মনে হয় পড়বার সময় টেবিলের কোনায়···

—সে গবেষণা তোমাকে করতে হবে না। নিলয়কে থামিয়ে দিয়ে প্রোডিউসার দৌড়ল।

ডাইরেকটরকে একপাশে ডেকে নিয়ে প্রোডিউসার নিচু গলায় তাড়াতাড়ি কিছু আলোচনা করে নিল। ওপরের সারির কয়েকজন কর্মীকে ডেকে দরকারী কয়েকটা আদেশ-নির্দেশ দেবার পর গাড়িতে অরুণকুমারকে নিয়ে তারা বেরিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

দারুণ ব্যস্ত আরো কয়েকটা গাড়ি স্টুডিও চত্বর থেকে দরকারী লোকজনদের নিয়ে ছুটে গেল বাইরে।

শুধু সাধারণ কর্মীরা আর নিলয় হতভম্ব হয়ে ফিসফাস জটলায় দাঁড়িয়ে রইল। অরুণকুমারের যদি সত্যিই সিরিয়স কিছু হয়ে থাকে···ভাবতেও বুকে কাঁপন ধরল অনেকের। যারা ইনডাস্ট্রির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত তারাই জানে অরুণকুমার বেহাল হলে গোটা ফিল্ম ইনডাস্ট্রির অবস্থাই হবে ঝড়ের নদীতে হালভাঙা নৌকার মতো। কত লোকের রুজি-রোজগার যে লাটে উঠবে তার ঠিক নেই। সবার মনে চাপা আতঙ্ক, মুখগুলো দুশ্চিন্তায় থমথমে।

শুধু একজন ঠিকে মজুর টাকা না পাওয়ার আপসোসে বলে উঠল—'ধাঃ শালা. সারাদিন কাজ করে পয়সার বেলায় ফক্কা।' অনেকে কটমট করে তার দিকে তাকাল। লোকটার কাছে মজুরির পয়সাটাই বড় হল! অবশ্য তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এটা হলেও পেমেণ্ট না হওয়ায় বাস্তব সমস্যাগুলো যে সকলের মনে কাজ করছিল না তা নয়।

জগদীশদা চলে গেছে। আর বসে থেকে কি হবে? নিলয় একরাশ ভাবনা মাথায় নিয়ে মেক-আপ তুলতে চলে গিয়েছিল।

৩

শহরের দক্ষিণে শেষ স্টপে বাস থেকে নামল নিলয়। এরপর মিনিট পনেরো হাঁটা পথ। রিকশা নিলে দু'টাকা। নিলয় হাঁটতে লাগল।

এগিয়ে-আসা শহরের ধাক্কা খেতে খেতেও গ্রাম একটু-আধটু এখনো বেঁচে আছে এখানে। মাঝে মাঝে সরকারী আবাসনের এজমালি মালিকানার বড় বড় বাড়ির জটলা। ব্যক্তিগত মালিকানায় সুন্দর সুন্দর বাড়িও উঠছে অনেক। কিন্তু মেটে পথ, গ্রামের মতো এলোমেলো ছড়ানো-ছিটানো সবুজ ঘাস, জানা-অজানা নানান ছোট গাছের ঝোপঝাড়, মাথা উঁচিয়ে এখানে-সেখানে দু'একটা বড় গাছ, পুকুর, ডোবা, কচুরিপানা ইতস্তত রয়ে গেছে। নিলয়ের শহুরে ক্লান্ত চোখ আরাম পায়।

তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর আগে এখানে প্রথম আস্তানা নিয়েছিল জগদীশদা। তার মুখ থেকেই শোনা এ জায়গা তখন ছিল পুরো গ্রাম। বন-বাদাড়ে ভর্তি। সন্ধ্যে হলেই শেয়ালের কেত্তন শুরু হয়ে যেত। সাপখোপ ছিল বিস্তর। সন্ধ্যের

শাঁখ তখন চার দেয়ালের চাপে নীরব হয়ে যেত না, খোলা উঠোনে পিদিম-জ্বালানো তুলসীতলা থেকে আকাশে ছড়িয়ে যেত অনেকদূর। মাঝে-মধ্যে ছোট আকারের বাঘও নাকি বেরুত। বাঘের গরু নিয়ে যাওয়ার কাহিনী চালু আছে। তবে মানুষে তাদের রুচি ছিল বলে শোনা যায়নি। চোর-ডাকাতের উৎপাত ছিল ভয়ানক। সন্ধ্যে হলেই দোরে খিল পড়ে যেত।

তবু স্টুডিও পাড়ার কাছাকাছি বলে এখানেই বাসা নিয়েছিল জগদীশদা।

সিনেমা নামের মায়াবিনী এমন কুহকে তাকে জড়িয়েছিল যে তা থেকে আজও তার মুক্তি মেলেনি। মুক্তি সে চায় না বলেই নিলয়ের ধারণা, মাঝে-সাঝে যদিও ঘেন্নায় এ লাইন ছেড়ে দেবার চিন্তা করে।

নিলয় জানে সেটা জগদীশদার মনের কথা নয়। আজ আর মোহ নেই, কিন্তু ভালোবাসা আছে—স্বপ্ন তৈরি করার কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখার ভালোবাসা। প্রথমে বাসনা ছিল গন্ধর্বলোকের বাসিন্দা হবার। যখন দেখা গেল সেখানে প্রবেশাধিকার পাবার যোগ্যতা বা সুযোগ কোনোটাই তার নেই তখনো সে কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়নি, সরিয়ে নেয়নি নিজেকে। প্রাসাদের বাসিন্দা যদি না-ও হওয়া যায় প্রাসাদ তৈরির কারিগর হওয়া ঠেকায় কে—চেষ্টা যখন আছে, শক্তি আছে, সবার ওপরে ভালোবাসাও আছে বুকভরা।

ছবি তৈরির হেন কাজ নেই যা সে জানে না। শুধু জানে না গল্প বানাতে, স্ক্রিপ্ট লিখতে, আর নেহাত নির্লজ্জ হতে পারেনি বলে পরিচালক হবার দুঃসাহস দেখাতে। কেউ তাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তুলতে চাইলে সে বলে—'নারে ভাই, পেটে টুঁ টুঁ বিদ্যে নিয়ে যারা ওসব করতে সাহস করে করুক। আমি ওর মধ্যে নেই। নিজের বিদ্যের বহর জানি। অঙ্ক লিখতে পোঙ্গ ফাটে· পুত্রের নাম বঙ্গেশ্বর। অ্যাসিসটান্টের ওপরে নাম লেখাতে চাই না। চলে তো যাচ্ছে।'—'এ আপনার বাড়াবাড়ি', কেউ হয়তো আপত্তি করে, 'আপনি একটু চাপ দিলেই অনেক ওপরে উঠতে পারেন। কত শালা ফেক্‌লু—।'—'তা হয়তো পারি। কিন্তু উঠে সেখানে থাকতে পারব না। পড়ায় বড় কষ্ট। তার চাইতে যতুটুকু সয়, যতটুকু রাখতে পারব সে-ই ভালো।'

ছবি তৈরির আদ্যন্ত জগদীশদার নখদর্পণে। কোথায় কোন্‌টা পাওয়া যায়, কোন্ লোককে দিয়ে কোন্ কাজ ভালোভাবে হবে, চালচলন স্বভাব বুঝে কেমন করে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়া যায়, কোন্ স্টুডিওর ভাঁড়ারে কি আছে,

কোথায় কোন্ নতুন টেকনিসিয়ান উঠছে—তামাম স্লুকসন্ধান মাথায় নিয়ে বসে আছে জগদীশদা, সেগুলোকে কেমন করে কাজে লাগাতে হয় সে বিদ্যেও তার জানা। তাই ছবির অতি আকালের দিনেও জগদীশদার কাজের অভাব হয় না। প্রোডিউসার ডাইরেকটর তাকে খুঁজে বেড়ায়।

অল্পে-তুষ্ট কাজ-পাগল মানুষটা ডুবে আছে তার ভালোবাসার কাজে।

ফিল্মী দুনিয়ার বাইরে আলোর ছটা, ভেতরে অন্ধকার, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। এমন ঠকানো বোধ হয় আর কোনো ব্যবসায় নেই। সিনেমার কাগজে ছবি-ছাবা গালগল্প দেখে মনে হয়—আহা, রূপকথার জগৎ যদি কোথাও থাকে তবে তা এইখানে—এইখানেই।

সুপার-স্টার স্টারদের বৃত্তান্ত পড়তে পড়তে লোকে ভাবে এরই নাম বেঁচে থাকা। কিন্তু জানে না, বেঁচে শুধু ওরা ক'জনাই আছে, আর যারা ওদের বাঁচিয়ে-রেখেছে মুখে ঠিকমতো রঙটি লাগানো, ঠিক জায়গায় আলোটি ফেলা থেকে আরো হাজারো কাজে—তাদের প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত। এমন তাজ্জব ব্যবস্থা!

অরুণকুমার একেকটা ছবিতে নেয় দশ লাখ—তার মধ্যে লেখাপড়ায় দু থেকে তিন, বাকিটা কালোয়। তারপরেই হয়তো দেখা যাবে অরুণকুমারের চাইতে অনেক বড় অভিনেতা শম্ভুবাবু, যাকে বলে সত্যিকারের ক্যারেকটার আর্টিস্ট, আগাগোড়া ছবিতে কাজ করলেন দশ হাজারে। ডাইরেকটর ক্যামেরাম্যান এডিটর—এরাও মন্দ পায় না।

কিন্তু যারা সবকিছু তৈরি করে দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘামে ধুলোয় একাকার হয়ে (তবে না দেড় মিনিটের কালোয়াতি দেখিয়ে দিগ্বিজয় করে অরুণকুমারেরা, ডাইরেকটর ক্যামেরাম্যান দাঁত কেলিয়ে পুরস্কার নেয়) তাদের মধ্যে যারা সত্যিকারের এলেমদার তাদেরও অনেকের রোজগার কর্পোরেশনের ঝাড়ুদারের চাইতে কম। বেশি চাইলে কর্তারা বলে—'এর চেয়ে বেশি দিতে পারছি না ভাই। তুমি বরং অন্য কাজ খুঁজে নাও।'

বলার হক তাদের আছে, কারণ সাদা-কালোয় মিলিয়ে টাকা তাদের অগুনতি, আর এটা দুনিয়ার বহু পুরনো সত্য যে বেশি টাকা করতে হলে কখনো কম টাকার মানুষদের বেশি টাকা দিতে নেই। জগদীশদাও এর বাইরে নয়। অন্যদের চাইতে তার অবস্থা ভালো। তবে সেখানেও কর্তাদের হিসেব ঠিকই আছে। জগদীশদা কাজ করে তিনজন লোকের, তার সিনেমার জগৎটাকে গুলে খাওয়া বিদ্যেও অনেক

কাজে আসে কর্তাদের, তাকে দেড়জন বা দু'জন লোকের পয়সা দিয়ে রাখলেও লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

জগদীশদাকে বসে থাকতে হয় না, সারা বছরই তার কম-বেশি কাজ থাকে। তাই সিনেমা জগতের সাধারণ কর্মীদের পক্ষে যা স্বপ্ন, সেইগুলো মোটামুটি বাস্তব করতে পেরেছে সে। ধারদেনায় ডুবতে হয়নি। সংসারটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। সে এখন জব্বলপুরে চাকরি করে। বিধবা বুড়ো মায়ের সদ্‌গতি পর্যন্ত তার সেবাযত্ন-চিকিৎসায় ত্রুটি করেনি। অবশ্য বাড়িঘর বিষয়সম্পত্তি ব্যাংক-ব্যালান্সের মতো অবাস্তব জিনিস সে করতে পারেনি। তবে জীর্ণদশা যে বাড়িটায় জগদীশদা তিরিশ বছরের ওপর ভাড়াটে তার ভাড়াও বাকি পড়ে নেই।

এমন একজন সচ্ছল মানুষ সম্পর্কে সহকর্মীদের ঈর্ষা থাকাই স্বাভাবিক! কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা অন্যরকম। জগদীশদা ছোটবড় সব সহকর্মীরই জগদীশদা। সকলের মস্ত সহায় আপদে-বিপদে। সাধ্য তার যত সামান্যই হোক, ভালোবাসা সাহস বুদ্ধি দিয়েও যে সাহায্য সে বন্ধুদের করে তার দামও কম নয়।

নেতা সে নয়। কিন্তু হালফিল নেতাদের যে হাল দেখা যাচ্ছে তাতে জগদীশদার মতো মানুষরা নেতা হলে বা হতে পারলে অনেক ঝামেলার সুরাহা হয়ে যেত।

মোদ্দা জিনিসটা ভালোবাসা। রাজনীতি মানুষ করে মানুষের জন্য, অন্তত সে রকমই বলে রাজনীতি-করা মানুষেরা। কিন্তু সত্যিই কি ভালোবাসার ছিটেফোঁটা কোথাও বেঁচে আছে তাদের মনে? যদি থাকত তবে কি এ হাল হত দেশের? দেশের মানুষের? ক্ষমতা আছে, ভালোবাসা নেই। তাই কিছু হচ্ছে না। ভালোবাসার অভাবে মানুষ ধুঁকছে।

মানুষের মনে জন্মাচ্ছে ঘৃণা। নিলয় অনুভব করতে পারে তার নিজের মনে যেমন, তেমনি তার চারপাশে, যেদিকে তাকাও সেদিকেই, প্রতি মুহূর্তে জন্ম হচ্ছে ঘৃণার। তার চেহারা অস্পষ্ট, কখনো ভুল, নোংরা। কিন্তু এই ঘৃণাই হয়তো একদিন জমতে জমতে বিশাল হয়ে উঠবে, ঠিক পথ ঠিক লক্ষ্য খুঁজে নেবে, ফেটে পড়বে, ছড়িয়ে পড়বে দাউ দাউ আগুনের মতো। তারপর ছাইয়ের রাশিতে নামবে অঝোরে বৃষ্টি, একটি দু'টি করে জন্ম নেবে ভালোবাসার অজস্র সবুজ চারাগাছ। ছবিটা নিলয়ের মনে স্পষ্ট নয়, তবু এমনটাই যেন ঘটবে বলে তার মনে হয়। পৃথিবীতে

বেশির ভাগ মানুষই যে কোনো না কোনো ভাবে ডামি হয়ে বেঁচে আছে। এ কি চিরকাল চলতে পারে ?

এ রাস্তায় নিলয়ের আসা যাওয়া বহুদিনের। প্রথম এসেছিল সাত বছর আগে। সেদিন বুকের দুরুদুরু কাঁপন আজও মনে পড়ে।

স্কুলের ধার ঘেঁষে প্রি-ইউ পাস করে সে তখন একটা কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। লেখাপড়ায় আর এগনোর চেষ্টা করার আশা নেই। দাদা ভস্মে ঘি ঢালতে নারাজ। সংসার চলে তারই রোজগারে। তার ওপর কথা বলার সাধ্য কারো নেই।

রিটায়ার্ড বাবা তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে রিক্তহস্ত। সংসারে সাহায্য করতে না পারার অক্ষমতা তিনি সর্ববিষয়ে নীরব থেকে স্বীকার করে নেন। বাবাকে অনুসরণ করা ছাড়া মা'র গতি নেই। নিলয়ের লেখাপড়ায় দাঁড়ি টেনে দেবার ব্যাপারে তাঁদের কোনো মতামত জানা গেল না। যদিও দাদার চাকরি বাবারই দৌলতে। একরকম হাতে ধরেই তাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য দাদা লেখাপড়ায় মন্দ ছিল না—গ্র্যাজুয়েট। দাদা নিলয়ের চাইতে প্রায় দশ বছরের বড়। তখনো চাকরির বাজার এত খারাপ হয়ে যায়নি। এখন হলে কি হত বলা শক্ত। হয়তো দাদাকেও তার মতোই ফেক্‌লু হয়ে থাকতে হত। কিন্তু যেভাবেই হোক একবার পায়ের নিচে মাটি পেয়ে গেলে সচরাচর মানুষ সব ভুলে দাপাতেই ভালোবাসে। দাদাও নিলয়কে অহরহ তার অপদার্থতা স্মরণ করিয়ে দিত। উত্তর দেবার শব্দগুলো মনে মনে শানাত নিলয়, ব্যবহার করত না।

বাবার যেমন যোগ্য সহধর্মিণী মা, দাদারও তেমনি বৌদি। উত্তরের যৌথ প্রত্যুত্তরে তিক্ততা কতদূর গড়াবে আন্দাজ করা শক্ত ছিল না। তার চেয়ে দু'বেলা দু'মুঠোর ব্যবস্থা করতে পারলে মানে মানে সরে পড়াই ভালো।

কিন্তু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ডখানায় শুধু পুরনো তারিখগুলো কেটে নবীকরণের তারিখগুলোই লেখা হতে থাকে, ইণ্টারভিউর ডাক আসে না। খবরের কাগজ দেখে করা দরখাস্তগুলো শেষ পর্যন্ত মনে হয় বাজে অভ্যাসের মতো, যা ছেড়ে দিতে পারলেই ভালো। ব্যবসা ? তাতে টাকা লাগে। তার ওপর গুরু ছাড়া ও লাইনে পা বাড়িয়েছ কি ডুবেছ। না টাকা, না গুরু। অতএব ব্যবসা দিয়ে বসার আশা না করাই ভালো। টিউশনি ? তা-ই বা তার মতো বিদ্যেধরকে কে দেবে ?

এক পালকের পাখিরা এক জায়গাতেই জোটে। বেকারের গতি বেকার।

কাজ না থাকা লম্বা সময় একা একা কাটানো অসম্ভব। কাজের লোকেরা নিশ্চয়ই

অকাজের লোকদের সঙ্গে দিতে কাজ কামাই করে বসে থাকবে না। বেকার তাই খুঁজে নেয় বেকারকে।

পাড়ার বেকারদের আড্ডায় গিয়ে জমত নিলয়। কিন্তু মনে-প্রাণে পাকা বেকার সে হতে পারেনি যেমন হয়ে গিয়েছিল ওর কোনো কোনো বন্ধু। পরগাছার জীবনে যে কোনো গ্লানি আছে তা ওদের দেখে মনে হত না। কাজকর্ম খোঁজায় ওদের আর আগ্রহ ছিল না। ভাবখানা ছিল এই রকম—সকলের সবকিছু হয় না, সকলের চাকরিও হয় না। কাজকর্ম যারা করে তাদের যেমন বেঁচে থাকার একটা ধরন আছে, যারা করে না তাদেরও একটা ধরন আছে, এতে লজ্জার বা দুঃখের কি? ওরা নানান কায়দায় ছুটকো সুখের সওদা করে বেড়াত। নিলয় কিন্তু ওদের সঙ্গে থেকেও ওদের মানসিকতায় ভাগ বসাতে পারেনি। ভেতরে অসম্ভব জ্বালা আর চাপা অস্থিরতা নিয়ে চোখ-কান খোলা রেখে ও শুধু হাতড়ে বেড়াত· যে কোনো একটা রাস্তা···যে কোনো···

তার চেহারার সঙ্গে অরুণকুমারের চেহারার দারুণ মিল নিয়ে অনেকসময় আলোচনা হত —অনেকরকম ব্যাখ্যান। পথে-ঘাটে তার দিকে অচেনা লোকের ফিরে ফিরে তাকানোও নিলয়ের কাছে পুরনো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পুরনো জিনিসটাই হঠাৎ একদিন নতুন মানে নিয়ে হাজির হল।

বন্ধুদেরই কে একজন বলেছিল—'তোর নাইনটি পারসেণ্ট অরুণকুমার-মার্কা চেহারাখানা মাইরি কোনো কাজেই লাগালি না। দেখ্ না একবার ফিল্ম-লাইনে···'

—'দূর, চেহারা দিয়ে কি হবে, ও রকম অ্যাকটিং বাপের জন্মে করতে পারব!'

আড্ডার কথা আড্ডার চালেই তখন উড়িয়ে দিয়েছিল নিলয়। কিন্তু পরে একা হতে মনে হয়েছিল—কি জানি, হতেও পারে আমার চেহারাটাকে কারো না কারো দরকার।

যদিও দরকারের চেহারাটা সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। অনেক আজগুবী সম্ভাবনা মাথায় আসত, আবার সেগুলি যে আজগুবী তা বুঝতেও সময় লাগত না। অরুণকুমারের সঙ্গে চেহারার মিলের সূত্র ধরে নিজেকে তার যমজ ভাইয়ের চরিত্রে কল্পনা করত নিলয়। পরক্ষণেই মনে হত, ধ্যুৎ, প্রোডিউসার অরুণকুমারকে দিয়েই ডাবল রোল করাবে, তাকে নিতে যাবে কেন। অরুণকুমার ডাবল রোল করা মানে প্রোডিউসারের টাকা তিন ডবল হয়ে ফিরে আসা। ফিল্মী পত্রিকা পড়ে এসব জানা ছিল নিলয়ের।

বিস্তেবুদ্ধি, মুরুব্বীর জোর, ঘুষ দেবার মতো টাকা—যা যা থাকলে তার মতো ছেলেরও হিল্লে হয়ে যায় সেসব একেবারেই না থাকায় নিজের চেহারাটাকেই মনে মনে আঁকড়ে ধরল নিলয়।

ভাবনাটা আস্তে আস্তে গভীর শিকড় চালিয়ে দিল মগজে। চেহারাই তার একমাত্র মূলধন। এই মূলধন কাজে লাগিয়েই তাকে ভবিষ্যত তৈরি করতে হবে।

আড্ডা কামাই করে শুরু হল স্টুডিওতে স্টুডিওতে ঘোরা। একে তাকে ধরে শ্যুটিং দেখা।

অরুণকুমারের সঙ্গে চেহারার অদ্ভুত মিল ছিল সহজ ছাড়পত্র। স্টুডিওর অনেক লোকজনের সঙ্গে মুখচেনা হয়ে গেল। ওরা তাকে একটা নামও দিয়েছিল—দু'নম্বর অরুণকুমার—সংক্ষেপে দু'নম্বর। শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াল যে শ্যুটিং দেখতে নিলয়কে অনুমতিও নিতে হত না।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। শ্যুটিং দেখার রোমাঞ্চ আস্তে আস্তে কেটে গেল। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কিন্তু কাকে দিয়ে যে কাজ হবে তা সে বুঝতে পারে না। তার চেয়েও বড় ভাবনা, কোন্ কাজ সে চাইবে? যে চেহারাটাকে সে মূলধন করবে ভেবেছিল, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সেটা তাকে খানিক আলগা খাতির পাইয়ে দিচ্ছে, তার বেশি নয়। জনা কয়েক শ্যুটিং দেখার বাতিকগ্রস্ত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বাউণ্ডুলে খ্যাপাটে ধরনের মানুষ সব। শ্যুটিং আর আর্টিস্ট দেখার নেশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টুডিওতে কাটিয়ে দিত। স্টুডিওর লোকেরা এদের সঙ্গে কিচলেমো করত। নিলয়কে ওরা সে জায়গায় নামিয়ে আনেনি। হয়তো অরুণকুমারের উনিশ-বিশ চেহারাখানা আর সেই সঙ্গে কথাবার্তার পালিশ ঐ লোকগুলোর মতো ভাঁড় বনে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছিল তাকে।

কিন্তু বেশিদিন বাঁচা যাবে কি? তাকেও শিগগিরই ওরা অকম্মা বাউণ্ডুলে ঠাওরাবে। শুরু করতে হাসি-মশকরা, পেছনে লাগা। তার আগেই সরে পড়তে হবে। পালাই পালাই করছিল নিলয়।

এ সময়ে ঘটে গেল একটা অদ্ভুত ঘটনা। তার জীবনে মোড় ঘোরার বৃত্তান্তের শুরু সেদিন।

অন্নদা স্টুডিওর এক নম্বর ফ্লোরে দারুণ সেট পড়েছে একখানা। রাজবাড়ির সেট। আর্টিস্টরা তখনো সেটে আসেনি।

নিলয় বসে বসে দেখছিল সেট সাজানো, আলোর বাহার, কাঠ-কাপড়-রঙের

দেয়াল, প্লাস্টিকের ঝাড়লণ্ঠন, কুচি-দেয়া কাপড়ের ডিজাইন করা সিলিং। ভাবছিল কি আশ্চর্য ক্ষমতা ক্যামেরায়। এইসব জিনিস, যা সামনাসামনি মেকি বলে চিনতে মুহূর্ত সময় লাগে না, ক্যামেরার চোখ দিয়ে যখন দেখানো হয় দর্শককে তখন সাচ্চার মতোই দেখে সে। আসলে মায়া, বিভ্রম—মায়া তৈরির কারিগর এরা।

হয়তো সেই সময় নিলয়ের আক্ষেপ হচ্ছিল—সে এই মায়ার জগতের একজন হতে পারছে না বলে। ভালোবাসা, ক্রোধ, কামনা-বাসনা, সত্যাসত্য এবং শেষাবধি ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়—মানুষের যাবতীয় আবেগকে যারা দোলায় খেলায়, তারা যে কি নিরাবেগ হিসাবের কৌশলে কাজগুলো করে যায় তার খবর তখন জানত না নিলয়। কর্মীদের দুঃখ-দুর্দশা অভাবের টুকরো টুকরো শব্দ কানে আসত। কিন্তু আবেগ নিয়ে খেলা করার বড়দরের কারিগররা যে বঞ্চনারও কত বড় কারিগর তা জানবার সুযোগ তখনো তার হয়নি।

মুখচেনা একটি লোক এসে বলল—এই যে দু'নম্বর, জগদীশদা ডাকছে তোমাকে তিন নম্বরে।

জগদীশদা ততদিনে নিলয়ের চেনা। স্টুডিও পাড়ায় দু'চার দিন ঘোরাঘুরি করলেই তাকে চিনতে বাধ্য হবে যে কেউ। সে শুধু একটা মুখ নয়—মানুষ। সবাই তাকে খুঁজছে, ডাকছে, প্রোডিউসার থেকে সাধারণ কর্মী সবাই। জগদীশদার মতো কাজের মানুষের তার মতো অকম্মাকে কি দরকার পড়ল? ভাবল নিলয়।

—জগদীশদা আমাকে ডাকছে? কেন?

—তা আমি জানি না। বলল তোমাকে পেলে ধরে নিয়ে যেতে একেবারে।

—তিন নম্বরে আজ অরুণকুমার মিত্রা রায়ের শুটিং। বাইরের লোক ঢুকতে পারবে না।

—সে ভাবনা তোমার নয়—জগদীশদার।

অতএব লোকটির পিছু পিছু তিন নম্বর ফ্লোরে গিয়ে হাজির হল নিলয়।

জগদীশদা যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

—এই যে ছোকরা, কি যেন ডাকে তোমাকে সবাই, দু'নম্বর, না? বেশ, এসো আমার সঙ্গে।

নিরুত্তরে জগদীশদার সঙ্গে এগোল নিলয়।

ফ্লোর জুড়ে সেট পড়েছে। জগদীশদা নিলয়কে সোজা নিয়ে গেল একটা আঁকা দেয়ালের সামনে। কাঠের ফ্রেমে আঁটা মোটা কাপড়ে আঁকা। ছ'সাত ফুট উঁচু হবে।

ওপরে এক ফুট মতো চওড়া কাঠের টানা পাটাতন করা আছে। ওখান দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে মনে হবে দেয়ালের ওপরে হাঁটছে।

—দেখেছ? জগদীশদা জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ।

—কি দেখেছ?

—দেয়ালটা। আপনি তো সোজা এখানেই নিয়ে এলেন। স্মার্ট হবার চেষ্টা করছিল নিলয়, কিন্তু তার বুকের ভেতরে তখন দারুণ কৌতূহল আর উত্তেজনার তোলপাড়।

—চেহারা দেখে মনে হয় বেশ ফিট। দেয়ালটার ওপর হাঁটতে পারবে?

—এ আর কি!

—ওখান থেকে লাফিয়ে পড়তে পারবে নিচে?

—যদি বলেন লাফিয়ে দেখাতে পারি।

—দেখাতে হবে না। চল।

ফেরার সময় নিলয় দেখল ফ্লোরে কোনো আর্টিস্ট নেই। সাজানো সেট, আলো তৈরি, কর্মীরাও ছোট ছোট দু'তিন জনের জটলায় কিসব বলাবলি করছে চাপা গলায়। গোলমালের গন্ধ পেল নিলয়।

ফ্লোর থেকে উঠোনে নেমে জগদীশদা বলল—শুনেছি তুমি প্রায়ই স্টুডিওতে ঘুরে ঘুরে শুটিং দেখ। কেন?

—ভালো লাগে, মানে···

—কাজকর্ম নেই বুঝি?

জগদীশদার গলায় এমন সহজ অন্তরঙ্গতা যে হঠাৎ নিলয়ও মেলে ধরল নিজেকে—অনেক চেষ্টা করেছি জগদীশদা, হল না, তাই···

—তাই বুঝি ভাবলি চেহারাটা যখন অরুণকুমারের মতো তখন স্টুডিওতে ঘুরে বেড়ালেই তুই আরেকটা অরুণকুমার হয়ে যাবি। তুমি থেকে 'তুই'-এর অন্তরঙ্গতায় চলে এল জগদীশদা।

—না, তা ঠিক নয়।

—তা-ই রে বাবা, তা-ই। আরে পাগল, অরুণকুমার দুটো হয় না। তার দরকারও নেই। ছেলেমানুষ! শোন্, তোকে কাজের কথাটা বলি এবার। জানিস তো আজ অরুণকুমারের শুটিং ছিল এই ফ্লোরে?

—শুনেছি।

—দেয়ালের ওপর হাঁটবে ঠিক ছিল অরুণকুমারই, সেখান থেকে লাফিয়েও পড়বে সে-ই। সিনটা পড়ে ওর খুব ভালো লেগেছিল। বলেছিল, ট্রিক-শটের ঝামেলা করবার দরকার নেই। নিজেই করবে। এখন সেটে এসে মাথা গরম: রিস্ক নেয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়…ইত্যাদি…

—তা, উনি নিজেই বলেছিলেন যখন…

—তাতে কি হয়েছে? তখন ঝোঁকের মাথায় বলেছিল, এখন ভড়কে গেছে। কিন্তু অরুণকুমারকে মুখের ওপর বলার সাহস কারো নেই। শুটিং আজকে বরবাদ বলেই সবাই ধরে নিয়েছে। প্রোডিউসারের লস্ হয়ে যাবে বেশ কয়েক হাজার। হঠাৎ আমার মনে পড়ল তোকে। কে একজন বলল তুই স্টুডিওতেই আছিস অন্য ফ্লোরে। খুঁজতে লোক পাঠালাম। এখন দেখি কি হয়…

বলতে বলতে ওরা চত্বর পার হয় টানা বারান্দায় উঠে এসেছে। এক সারি ঘর। তাকে দিয়ে এ সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে সেটা জগদীশদার কাছ থেকে জেনে নেবার আগেই সে নিলয়কে দাঁড়াতে বলে একটা ঘরে ঢুকে গেল।

মিনিট দুয়েক পরেই বেরিয়ে এসে ডাকল—আয়।

জগদীশদার পিছু পিছু ঘরে ঢুকে নিলয় দেখল অফিসঘরের মতো ঘরটিতে চারটি চেয়ার দখল করে চারজন লোক বসে আছে। তাদের একজন অরুণকুমার। অন্যদের সে চেনে না।

বেশ নাটুকে ভঙ্গিতে জগদীশদা নিলয়কে ওদের সামনে দাঁড় করিয়ে বলল—দেখুন, এরই কথা বলছিলাম তখন। কি অরুণবাবু, নিজেকেই দেখছেন বলে মনে হচ্ছে না?

অরুণকুমার যদিও দেখছিল নিলয়কে এবং যথেষ্ট আগ্রহ ছিল সে দেখায়, তবু সে জগদীশদার উচ্ছ্বাসকে একেবারেই আমল না দিয়ে পাশে-বসা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওলা লোকটিকে (পরে জেনেছিল নিলয় ইনি বিখ্যাত পরিচালক ব্রজেন রায়) বলল ইউজ করতে পারেন। তবে ক্লোজ শট নেবেন না। ডিফার করলে আমি অ্যালাউ করব না।

নিলয়ের কাছে এগুলি সাংকেতিক শব্দ বলে মনে হচ্ছিল। সে ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠছিল।

—তাহলে মেক-আপে বসিয়ে দি। বলে জগদীশদা নিলয়কে হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে এল।

সেদিনের ঘটনা ভাবলে আজও নিলয়ের শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। সন্ধ্যেটা কেটেছিল অদ্ভুত আবেশের মধ্যে। তাকে মেক-আপ দেয়া হয়েছিল অরুণকুমারের। মেক-আপ শেষ হতে নিজেকে আয়নায় দেখে সে চমকে গিয়েছিল। তারপর পরিচালকের নির্দেশে দেয়ালের ওপর হাঁটা, দেয়াল থেকে লাফ দিয়ে পড়া। এবং কাজের পারিশ্রমিক পঞ্চাশ টাকাও তার হাতে গুঁজে দিয়েছিল জগদীশদা। সেদিনই প্রথম অরুণকুমারের শুটিং দেখার অভিজ্ঞতাও হয়েছিল তার। আশ্চর্য ক্ষমতা কিন্তু লোকটার। কি করতে হবে শুধু একবার বুঝিয়ে দেয়ার ওয়াস্তা। তারপর কত সহজে অন্য একজন মানুষ হয়ে যেতে পারে সে!

শুটিং হয়ে যাবার পর জগদীশদা নিলয়কে বলেছিল—আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। একদিন সময় করে আমার বাসায় চলে আয়। দেরি করিস না।

বলা বাহুল্য দেরি নিলয় করেনি।

জগদীশদা তাকে ঘরে বসিয়ে চা-টা খাইয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাড়ির খবর জেনেছিল।

—স্টুডিওতে ঘুরছিস কাজের ধান্দায়, ভালো। কিন্তু কি কাজ করবি বল্? অভিনেতা তুই হতে পারবি না।

—কেন?

—অভিনয় করার ক্ষমতা তোর আছে কিনা জানি না। থাকলেও চান্স পাওয়া শক্ত। তুই তো পাবিই না। ভালো চেহারা, অল্প বয়েস, তার ওপর যদি অভিনয় করার ক্ষমতা থাকে তাহলে চেষ্টা করা যায়। নতুন হিরো দরকারও।

নিলয় বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে জগদীশদা বলল—জানি, তুই কি বলবি। তোর চেহারাখানা হিরোর মতো, বয়েস অল্প, অভিনয়ও হয়তো করতে পারিস। কিন্তু আসল মুশকিলটা করে দিয়েছে ওপরওলা। অরুণকুমারের সঙ্গে তোর চেহারার মিলটাই সবচেয়ে বড় অসুবিধা।

অবাক চোখে তাকাল নিলয়। যেটাকে সে তার সবচেয়ে বড় সুবিধা বলে মনে করেছে সেটাই জগদীশদার মতে সবচাইতে বড় অসুবিধা!

জগদীশদা হেসে বলল—আরে বোকা, ইনডাস্ট্রি ভালো হিরো পেলে নেবে। কিন্তু অরুণকুমারের মতো দেখতে কোনো অভিনেতার জায়গা হবে না। অরুণকুমারই আপত্তি করবে সকলের আগে। আর, জানিস তো, অরুণকুমারের চাওয়া না-চাওয়ার ওপর অন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছা খাটে না। অরুণকুমার যে ছবিতে আছে সে ছবি মার খাবে না। তাকে পাবার জন্যে প্রোডিউসাররা মুখিয়ে আছে। সে কখনো

চাইবে না তার মতো দেখতে আরেকজন হিরো বাজারে আসুক। কারণ সে যদি সত্যিই অভিনয়ও করতে পারে তাহলে তার পুল কমে যেতে বাধ্য। তাই প্রথমেই সে বেঁকে বসবে। কোনো প্রোডিউসারও অরুণকুমারকে চটিয়ে তোকে চান্স দেবার রিস্ক নেবে না। কারণ তুই যদি ইমপ্রেস করতে না পারিস তখন তার একূল-ওকূল দু'কূলই যাবে।

শুনে নিলয়ের আক্কেল গুড়ুম। যে চেহারার জন্য তার মনে দেমাক ছিল তার আসল দাম যে সামান্যই তা বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছে জগদীশদা। মুখ কালো করে বসে ছিল সে।

—তুই যে একেবারে চুপসে গেলি। শোন্, শোন্, তোকে এমনি এমনি ডেকে এনে গ্যাঁজাচ্ছি না। বলেছিলাম না আমার একটা আইডিয়া আছে? আজকাল ছবিতে শুধু প্রেমের প্যানপ্যানানি থাকলে চলে না—সেক্স চাই, ভায়োলেন্স চাই। মারপিট না থাকলে সে ছবি নিরিমিষ—চলতে চায় না বাজারে। প্রেমের সিন, সেক্সের সিন—অরুণকুমারের জবাব নেই। কিন্তু লাফঝাঁপ ঘোড়দৌড় মারপিটের সিন হলেই অবস্থা কাহিল। ডামি দিয়ে শট্ সাজাতে ডাইরেক্টরের বাপের নাম খগেন হয়ে যায়। চেহারা-মেলানো ডামি পাওয়া শক্ত, মেক-আপ দিয়ে আর কদ্দুর হয়। তাই ডামি দিয়ে করানো শটে অ্যাঙ্গেল ঠিক করতেই ডাইরেক্টর আর ক্যামেরাম্যান নাজেহাল হয়ে যায়। তার ওপর ক্যামেরা দূরে রাখতে হয় বলে অনেক শট্ তেমন জমেও না। বুঝছিস তো আমার মতলবখানা? তুই যদি ঘোড়ায় চড়া, মোটরবাইক চালানো, ঘুষোঘুষির কায়দা, ক্যারাটে এইসব শিখে নিতে পারিস তাহলে অরুণকুমারের ডামির কাজ একচেটিয়া পাবি তুই। তৈরি যদি হতে পারিস, বাজারে তোকে চালু করে দেয়ার দায়িত্ব আমার।

—অতসব আমি শিখব কি করে?

—শেখা না কচু। আসল শেখা ঘোড়ায় চড়া আর মোটরবাইক চালানো। বক্সিং ক্যারাটে কি সত্যি সত্যি শিখতে হয় নাকি? শুধু কেতা চাল ঠাট, ব্যস্। চেষ্টা থাকলে তিন মাসে শিখে নিতে পারবি। খরচ পড়বে। তা, সে ব্যবস্থাও আমি কম-সমে করে দেব।

আর দ্বিধা করেনি নিলয়। মাকে চুপি চুপি বলেছিল। মা ছেলের অক্ষমতার দুঃখ বুঝতেন। গোপনে একখানা সোনার বালা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন —'এটা দিয়ে যা করবি কর্। কিন্তু ভুলেও কাউকে বলিস না বাবা…।

তারপর ট্রেনিং শেষ হতে জগদীশদার হাত ধরে রুপালী পর্দার জগতে তার যাত্রা শুরু। সে যাত্রায় তার নিজস্ব অস্তিত্ব ছিল না, একজন উজ্জ্বল অস্তিত্বের মনুষকে উজ্জ্বলতর করাই ছিল তার কাজ। বিনিময়ে মোটামুটি ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার রসদ মিলত। এমন কি, একটি মেয়েকে ভালোবেসে, তাকে বিয়ে করে ঘরসংসার করাও সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ সেই উজ্জ্বল অস্তিত্বের মানুষটি···

জগদীশদার দরজায় নিজেকে আবিষ্কার করে স্মৃতি ও চিন্তায় ছেদ পড়ল নিলয়ের।

কড়া নাড়তে জগদীশদা নিজেই দরজা খুলে দিল।—আয়, আয়, বোস্।

নিলয় বসতে জগদীশদা বলল—দাঁড়া, তোর বৌদিকে চায়ের হুকুম দিয়ে আসি! বলে ভেতরে চলে গেল।

ফিরে এসে চৌকিতে বসল আরাম করে কোলের ওপর পাশ-বালিশ টেনে নিয়ে।

—আপনার বেরুনোর সময় এসে বিরক্ত করছি না তো? নিলয়ের গলায় সংকোচ তার নিজের কানেও বেসুরো ঠেকল। জগদীশদার সঙ্গে তার সম্পর্ক এ ধরনের সাজানো ভদ্রতার নয়।

—হুঁ, বুঝলাম। জগদীশদা হেসে বলল।

—কি বুঝলেন?

—বুঝলাম তুই ঘাবড়ে গেছিস।

—ঘাবড়ে যাবার কি হল? সহজ হবার মিথ্যে চেষ্টা করে নিলয় বলল।

—কালকের ঘটনা নিয়ে তোর চিন্তা নেই বলছিস? নিলয়ের দিকে তাকিয়ে জগদীশদা মিটি মিটি হাসতে লাগল।

নিলয় অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

—যাকগে শোন্, খানিক পরে জগদীশদা বলল, তোর আমার পক্ষে তো বটেই, এখানকার গোটা সিনেমা লাইনের পক্ষেই ঘটনাটা খুব সিরিয়াস। পনেরো-ষোলটা ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। মোট কুড়ি-একুশটা ছবির শ্যুটিং হচ্ছে, বেশির ভাগেরই হিরো অরুণকুমার। ব্যাপারখানা বুঝে দেখ্ একবার। তুইও সেই ভয়েই ছুটে এসেছিস—স্বীকার করিস চাই না করিস।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না···। অসহায়ভাবে বলল নিলয়।

—ওহ্,হো, হঠাৎ যেন জগদীশদা ব্যাপারটা ধরতে পারল, তুই বোধ হয় কালকের পরে আর জানিস না। জানবিই বা কি করে। খবরটা খুব চেপে-চুপে রাখা হয়েছে। আমি কাল রাতে বাড়ি ফিরেছি দুটোয়। প্রোডিউসারের গাড়িতে। অরুণকুমারকে কাল রাতেই ইমার্জেন্সি অপারেশন করতে হয়েছে নার্সিং হোমে।

—সে কি! বিস্ময়ের সঙ্গে আতঙ্ক চাপা শব্দে বেরিয়ে এল নিলয়ের মুখ থেকে।

—সকালে বেরিয়ে টেলিফোন করেছিলাম নার্সিং হোমে। অবস্থা ভালো না। তিনদিন না যেতে ওরা ভালোমন্দ বলতে পারছে না।

—কি হয়েছিল ওরা বলেছে?

—ডাক্তারী ব্যাপার আমরা কি বুঝব। পেটে চোট লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু পেটের ভেতরের অবস্থা আগে থেকেই খারাপ ছিল—ডাক্তারদের আলোচনা শুনে এটুকুই বুঝলাম।

—ক্যানসার-ট্যানসার?

—তুই বড্ড বেশি ভাবছিস নিলয়।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল নিলয়—হ্যাঁ জগদীশদা, সত্যিই ভয় করছে আমার। সিনেমা থাকলে আপনারা থাকবেন। কিন্তু অরুণকুমার না থাকলে আমি থাকব না। অরুণকুমার মরে গেলে সে হয়তো অনেকদিন মরেও বেঁচে থাকবে, কিন্তু আমাকে··

—বোকার মতো করিস না নিলয়, জগদীশদা ধমক দিল, ডামি হওয়া ছাড়াও দুনিয়াতে অনেক কাজ আছে।

—আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলছেন জগদীশদা, আপনি নিজেও জানেন কাজ কত কম। জানেন বলেই আপনি আমাকে ডামি বানিয়েছিলেন। আমার করার মতো অন্য কাজ থাকলে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ডামি হতে বলতেন না।

—তোর মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে। ওঃ দাঁড়া··। বলে জগদীশদা ভেতরের ঘরে চলে গেল।

থালায় দু'পেয়ালা চা আর দু'বাটি মুড়ি-মাখা নিয়ে ঘরে ঢুকল মণি বৌদি। চৌকির ওপর নিলয়ের সামনে মুড়ি চা রেখে বলল—নাও, চা খাও।

মনের অবস্থা তারিয়ে তারিয়ে মণি বৌদির হাতের মুড়ি-মাখা খাওয়ার মতো নয়। কিন্তু আপত্তি করেও লাভ নেই। যেমন দেবা তেমনি দেবী। কাছের মানুষ না ভাবলে সামান্য মুড়ি-মাখা আর চা কেউ অতিথিকে ধরে দিতে পারে না। যেখানে দেয়া লৌকিকতা, আপত্তি করাও লৌকিকতা—এটা সে জায়গা নয়।

—বসুন, এক মুঠো মুড়ি তুলে নিয়ে নিলয় বলল, আপনার রান্নার তাড়া আছে নাকি ?

—আমাদের আবার তাড়া কি, চৌকির এক কোনায় বসে মণি বৌদি বলল, দু'জনের তো রান্না। তার ওপর ওর যেমন কাজের বাঁধা সময় নেই আমারও তেমনি রান্নার নিয়ম-করা সময় নেই। বেশির ভাগ দিন রাতে ছাড়া বাড়িতে খায় কই। একার জন্যে রাঁধতেও ইচ্ছে করে না।

—তার মানে এক বেলা প্রায়ই উপোস ?

—উপোস দিতে যাব কোন্ দুঃখে। বেঁচে থাক আমার চা।

চায়ে মণি বৌদির অচলা ভক্তির খবর জগদীশদার মহলে সকলেরই জানা। জগদীশদাও কম যায় না।

—তা বলে শুধু চা খেয়ে দিন কাটানো…লিভারের বারোটা বাজবে।

—শুধু চা নয়, চায়ে যদি তোমার টান থাকে, তাহলে জলটাও খাবে বেশি করে, আর পান। একেবারে বাজে কথা, চায়ে লিভারের কোনো ক্ষতি হয় না। আমাকে দেখে বুঝছ না। পঞ্চাশ হল, কষ্টও কম করিনি জীবনে, লিভার খারাপ মনে হচ্ছে আমার ? কই গো, তোমার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে…

—আসছি। বলতে বলতে পাশের ঘর থেকে এ ঘরে এল জগদীশদা—হাতে এক টুকরো কাগজ আর খান কয়েক নোট।

জগদীশদা চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল—মণি, আজ বাড়িতেই খাব। ডিমের ডালনা কর দিকি মারাত্মক করে, আর চালতার অম্বল। তিনদিন টানা ছুটি। অরুণকুমারকে নিয়ে কাজ ছিল। অরুণকুমার চিৎপাত, শ্যুটিং ক্যানসেল, আমারও ছুটি।

মণি বৌদি উঠতে উঠতে বলল—তুমিও দু'টি খেয়ে যাও না ভাই।

—না বৌদি, আজ থাক, নিনা ভাববে।

—কেন, নিনা জানে না তুমি এখানে আসবে ?

—জানে, কিন্তু গতকালের ব্যাপারের পর··

—আচ্ছা, থাক তাহলে, মণি বৌদি বলল, তুমি কিন্তু ভাই বড় বেশি ভাবছ…

—আপনি ভাবেন না বৌদি ?

—না ভাই, আমি ভাবি না।

—না ভেবে পারেন কি করে ?

—আমি বিশ্বাস রাখি, তাই ভাবনাচিন্তা আমার তেমন হয় না।

—আপনার বিশ্বাসের পাত্রটি কি ভগবান ?

—না, উনি। হেসে মণি বৌদি তাকালেন জগদীশদার দিকে।

—তার মানে দু'জনের ভাবনা একজনের ওপর চাপিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু জগদীশদাকে দেখেও মনে হয় না এত ভাবনার ভার ওঁর ওপর চেপে আছে।

মুখ টিপে হেসে মণি বৌদি বলল—সে ভাই তুমি ওঁর সঙ্গে বোঝ। আমি দেখি রান্নার কি করা যায়।

পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রেখে নিলয় বলল—আচ্ছা জগদীশদা, ভাবনা তাড়ানোর উপায় কি ?

—হুঁ, কঠিন প্রশ্ন। আমার নিজের অভিজ্ঞতাই বলতে পারি। বই পড়ে এসব জানা যায় কিনা জানি না, বইপড়া বিদ্যেও আমার খুব কম। ভাবনা মানুষের থাকবেই। কিন্তু ভাবনার সঙ্গে আস্থা থাকলে ভাবনার অসুখে ভুগতে হয় না।

—আস্থা ? কার ওপর ? ভগবান ছাড়া আর কার ওপর এত আস্থা রাখা যায় ?

—ভগবানের সন্ধান আমার জানা নেই। আমার আস্থা নিজের ওপর, আর মানুষের ওপর। জনসাধারণের ওপর রাজনৈতিক নেতাদের যে আস্থা বা রাজনৈতিক নেতাদের ওপর সাধারণ মানুষের যে আস্থা আমি কিন্তু সে আস্থার কথা বলছি না। ওটা নেহাতই ফয়দা তোলার ভাষা। অমুককে ভোট দিলে আমার আশু ফয়দা, দাও ওকে ভোট। আমি ভোট চাইতে এসেছি, অতএব ভোটারদের প্রতি আমার যে কত আস্থা তা বলতেই হবে। ওসব নয়…

বলতে বলতে হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে গেল জগদীশদা।

—তাহলে কি ? নিলয় প্রশ্ন করল।

—ঠিক বোঝাতে পারব না। অনেক মানুষের আমি একজন, অনেক মানুষের মধ্যে তাদের ভালোবাসার ভাগ দিয়ে নিয়ে আমি বেঁচে আছি…এ রকম একটা চিন্তা …বলে বোঝানো শক্ত…। যাকগে, পাঁচশো টাকা এখানে আছে। টাকা নিয়ে ভাউচারে কালকের ডেট দিয়ে সই করে দে।

অবাক হয়ে তাকাল নিলয়।

—কি হল ? দে, সই করে দে। তাড়া দিল জগদীশদা।

—দিচ্ছি। নিলয় টাকা পকেটে রেখে ভাউচারটা তুলে নিল।

—কাল প্রোডিউসারের চামচাটা আসেনি। আমি আছি সর্বঘটে কাঁটালি কলা।

আমাকে দু'হাজার টাকা দিয়ে বলেছিল দরকারী পেমেণ্টগুলো করে দিতে। তা, অরুণকুমার যা কাণ্ড বাধাল, পেমেণ্ট দেয়া মাথায় উঠে গেল। আমি বেরুনোর সময় বুদ্ধি করে খান কয়েক ভাউচার ফর্ম নিয়ে এসেছিলাম। যে ক'জনকে পারি কালকের তারিখে সই করিয়ে টাকা দিয়ে দেব। এরপর ছবির হাল কি হবে কে জানে। টাকাপয়সা পেতে কালঘাম ছুটে যাবে লোকের। হ্যাঁ, তোকে জিজ্ঞেস করলে বলবি টাকা কালই পেয়েছিস স্টুডিওতে। নইলে আমাকে বলবে পরে কেন দিতে গেলাম। শালাদের শুধু না দেবার ফিকির। অরুণকুমার সুস্থ না হতে কাউকে পেমেণ্ট পেতে হবে না।

—নিন, সই-করা, ভাউচার জগদীশদার হাতে দিয়ে নিলয় বলল, কি বাঁচান যে বাঁচালেন জগদীশদা। আমি ভাবতেও পারিনি···

—ঠিক আছে। শোন্, তুই হুঁশিয়ার থাকিস, কারো কাছে অরুণকুমার সম্বন্ধে মুখ খুলবি না।

—তা নিশ্চয়ই থাকব। কিন্তু গোলমাল ঠেকছে যে···বিশেষ করে যেন আমারই হুঁশিয়ার থাকা দরকার।

—হ্যাঁ, বিশেষ করে তোকেই বলছি।

—আমি আবার কি করলাম ?

—কিছুই করিসনি। কিন্তু ফিল্মী দুনিয়ার মতো কেচ্ছার জায়গা আর কোথাও নেই। শুধু ফালতু কেচ্ছা বানাবার ফিকির। কেউ কেউ শুধু কেচ্ছার কারবার করেই পেট চালাচ্ছে।

—আমার তাতে কি ? আপনি আঁচ পেয়েছেন কোনো ?

—না, তা পাইনি, চিন্তিতভাবে জগদীশদা বলল, কিন্তু বলা যায় না ভাই। তুই সিনে ছিলি অরুণকুমারের সঙ্গে। কত রকম গল্প ছড়াবে দেখবি বাজারে। তুইও বাদ যাবি বলে মনে হয় না।

—ভালোই, এতদিন কেউ আমাকে চিনত না। এখন তবু বিখ্যাত হওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

—বিখ্যাত হওয়ার জ্বালা অনেক। ওটা সকলের পোষায় না।

—জগদীশদা, আজ উঠি তাহলে। আচ্ছা, আমি কি একবার নার্সিং হোমে গিয়ে অরুণকুমারকে দেখে আসব ?

—না, কক্ষনো না। আমি না বলতে ওমুখো হবি না। আদেশের সুর জগদীশদার গলায়।

নিলয় কৌতূহল চেপে রাখল। এত আপত্তি কেন জগদীশদার? কারণ নিশ্চয়ই আছে, আর সেটা নিলয়ের ভালোর জন্যই। তাই প্রশ্ন না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

—তাহলে চলি, বৌদিকে বলে দেবেন, না, না, এখন আর ডাকবেন না ওঁকে।

জগদীশদা ঘুরে দাঁড়াল।

—নিনাকে বলিস যাব একদিন চা খেতে।

—আপনি বলেন, যান থোড়ি···

—দেখিস, ঠিক যাবো শিগগিরই একদিন। বাবুসোনা কেমন আছে?

—ভালো।

—আচ্ছা, আসিস আবার। এখন আমাদের অঢেল সময়।

—আপনার নয়, আমার। চলি—

৪

সাংবাদিক পরিভাষায় খবরের আরেক নাম গল্প—নিউজ—নিউজ-স্টোরি। খবর কি করে গল্প হয় বা গল্প কি করে খবর হয় তা নিয়ে বিস্তর গবেষণার অবকাশ আছে। পাঠকের মনস্তত্ত্ব নিয়েও আলোচনা হবে পারে ঢের। মোদ্দা ব্যাপারটা এই, মানুষ গল্প চায়, গল্প দিতে হবে তাকে—তার মনের খোরাক। তাই খবরের শুদ্ধতা ছোটখাট মামুলী খবরেই থাকে। খবর বড় রকমের হলে বা বড় মানুষকে নিয়ে হলে তাতে গল্পের মশলা না দিলে কাগজের বাজার জমে না। খবরের কাগজের খবরে খবর বেশি, গল্পের মিশেল কম। বিনোদন পত্র-পত্রিকায় একই খবরে খবরের তুলনায় গল্পের গরম মশলা অনেক বেশি। একেই হয়তো হলুদ সাংবাদিকতা বলে। তা হলুদ গোলাপী যে নামই দেয়া হোক না কেন, আসল বস্তু পয়সা, পয়সা এতেই আসে।

অরুণকুমার নিঃসন্দেহে বড় মানুষ—সুপার-স্টার—আসমুদ্র-হিমাচলের স্বীকৃতিধন্য। নায়িকার সঙ্গে তার নাচে গানে লক্ষ নায়িকার হৃদয় নাচে গায়, লক্ষ নায়কের হৃদয় অভিসারে উদ্‌বেল। তার প্রাণখোলা হাসিতে বিষাদ হয় দেশান্তরী। অন্যায়ের

বিরুদ্ধে তার অনিবার্য পরাক্রম আইব্বাস্-মার্কা। তুমুল উচ্ছ্বাস আর হাততালিতে অভিনন্দিত। মুহূর্তের মাপেও এসব দুর্লভ বস্তু যে দিতে পারে মানুষকে তার বড়ঃ মানুষত্ব জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে প্রমাণিত। অতএব প্রতিদিনই সংবাদপত্রের বিনোদন-পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন ছাড়াও নানা পত্র-পত্রিকার প্রচ্ছদে, চিত্রে, সচিত্র সংবাদ-গল্পে তার অজস্র উপস্থিতি। স্বাভাবিক। এহেন ব্যক্তি যখন কোনো অস্বাভাবিক বা বিশেষ ঘটনার কেন্দ্রে তখন সমস্ত সংবাদমাধ্যমগুলির অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠার মধ্যেও আশ্চর্য হওয়ার অবকাশ নেই।

প্রতিদিন প্রতিটি প্রভাতী সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় অরুণকুমারের স্বাস্থ্য-বুলেটিন যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হতে লাগল। জনপ্রিয়তা হারানোর ঝুঁকি নিতে কেউ রাজী নয়। অরুণকুমার এখন মানুষের সংবাদ-আকাঙ্ক্ষার শীর্ষে, অতএব যতদূর সম্ভব সে আকাঙ্ক্ষা মেটাতে হবে।

অরুণকুমারের চিকিৎসকদের দৈনিক বুলেটিন ছাড়াও চিকিৎসা সম্পর্কে অন্যান্য নামী-দামী চিকিৎসকদের অভিমত ছাপা হতে লাগল। তাঁরা অবশ্য 'টাচি ইস্যু'তে খুব সতর্ক হয়েই মতামত দিলেন। একজন স্বভাব-রাগী চিকিৎসক শুধু পরিষ্কার বলে দিলেন—অরুণকুমারের চিকিৎসা নিয়ে তাঁর চিকিৎসকদের রেখে-ঢেকে কথা বলা তিনি পছন্দ করছেন না, তাঁর দাবি অবিলম্বে জনস্বার্থে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে সেই কমিটির হাতে অরুণকুমারের চিকিৎসার ভার দেয়া হোক। তাঁকে কমিটিতে নেয়া হলে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে রাজী আছেন বলেও জানিয়ে দিলেন।

একটি সংবাদপত্র স্কুপ-নিউজ ছাড়ল নিউইয়র্ক থেকে দু'জন বিশ্বখ্যাত চিকিৎসককে আনানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এ বাবদে সমস্ত ব্যয় বহন করতে এগিয়ে এসেছে মহাগুরু দুস্থত্রাণ সংস্থা। অরুণকুমার এই সংস্থার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। প্রয়োজনীয় ফরেন-এক্সচেঞ্জের জন্য অনুমোদনও চাওয়া মাত্রই পাওয়া গেছে বলেও জানা গেল।

বেতার ও দূরদর্শনে নিয়মিত অরুণকুমারের শারীরিক অবস্থার খবর পরিবেশিত হতে লাগল—অবশ্য যথেষ্ট পরিমিতি বজায় রেখে। কারণ বেতার-দূরদর্শনকে পত্র-পত্রিকার মতো পাঠক ধরার প্রতিযোগিতায় নামতে হয় না।

বিনোদন পত্র-পত্রিকাগুলির প্রচ্ছদে পাতায় পাতায় শুধু অরুণকুমার।

ফিল্মী দুনিয়ার রসালো খবরগুলো সংক্ষিপ্ত গুরুত্বহীন হয়ে আনাচে-কানাচে ঠাঁই পেল। 'প্রকাশ কি স্মিকে ছেড়ে বিজয়াকেই বিয়ে করবে', 'আমার সৌন্দর্য বজায়

রাখতে পুরুষমানুষের প্রয়োজন—সুলেখার দুঃসাহসিক স্বীকারোক্তি', 'বিন্দিকে নিয়ে রাজ আর সুরেশে একহাত হয়ে গেল', 'গোপনে কর্মেন্দ্র-প্রেমার অভিসার' জাতীয় চিত্তাকর্ষক খবরের আর বিশেষ গুরুত্ব রইল না। ক'দিন আগেও এইসব পত্র-পত্রিকার অনুরাগী রসিক পাঠকেরা খবরগুলির জন্য হা-পিত্যেশ হয়ে বসে থাকত।

এখন এক এবং অদ্বিতীয় আকর্ষণ অরুণকুমার। প্রচ্ছদে অরুণকুমার, সংবাদে অরুণকুমার, সংবাদ-গল্পে অরুণকুমার। পাঠকের চাহিদা মেটাতে প্রতিটি বিনোদন পত্রিকার নব্বই শতাংশ জায়গা জুড়ে শুধু অরুণকুমার। কিন্তু এতখানি জায়গা শুধু অরুণকুমারের শারীরিক অবস্থা, নানান জল্পনা-কল্পনা, বিশেষজ্ঞদের অভিমত ইত্যাদি দিয়ে ভর্তি করা অসম্ভব। করলেও তাতে আসবে একঘেয়েমি, অথচ অরুণকুমার ছাড়া খবরের অন্য শিরোনাম এ মুহূর্তে অচল। তাই ধুরন্ধর সম্পাদকদের মাথা থেকে বেরুল অজস্র ফিচারের পরিকল্পনা। 'পরিচালকের চোখে অরুণকুমার', 'অরুণকুমারের নায়িকারা', 'টেকনিসিয়ানদের আপনজন অরুণকুমার', 'রুপালী পর্দার বাইরে অরুণকুমার', একজন সম্পাদক 'জনগণের অরুণকুমার' নামে একটি ফিচার চালু করে দেখাতে চাইলেন অরুণকুমার রুপালী পর্দায় জনচিত্ত জয় করেই থেমে থাকেনি, সাধারণ মানুষের সঙ্গেও আছে তার নাড়ির টান। বিনোদন পত্র-পত্রিকার বাজারে দারুণ বাণিজ্যের জোয়ার।

অরুণকুমারের অপূর্ব ভঙ্গির নানা ছবির অ্যালবাম বেরিয়ে গেল। ক্যাসেটে বেরুল তার নির্বাচিত সংলাপের সংকলন। অরুণকুমারের সাময়িক অকর্মণ্যতা এনে দিল অনেকের বিরাট কর্মব্যস্ততার ঢেউ।

বিনোদন-বার্তার সম্পাদক প্রকাশ চৌধুরীর মেজাজ বেজায় গরম। ঘণ্টা খানেক আগেই মালিক সুদেব সরকার টেলিফোনে তাকে একহাত নিয়েছে। অকারণে নয়, উত্তেজিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে সত্যিই।

বিনোদন-বার্তার বিক্রি এতকাল ছিল সবার ওপরে। 'ও স্টার, মাই স্টার' বিস্তর কায়দাকানুন করেও বিনোদন-বার্তার চেয়ে পঁচিশ হাজার নিচেই থেকেছে। সে-ই কিনা এই মওকায় টপকে গেল দশ হাজারে। বিনোদন-বার্তারও বিক্রি বেড়েছে আট হাজার। 'ও স্টার, মাই স্টার' বাড়িয়েছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার। ভাবা যায়!

এরপরে মালিক খিস্তি করবে না তো কি পুজো করবে! 'ও স্টার, মাই স্টারে'র

অফিসে প্রকাশের চর আছে। সে মাঝে মাঝে মন্ত ও একটি আনুষঙ্গিকের বদলে প্রকাশকে ভেতরের খবর দিয়ে যায়। প্রকাশ মালিকের কাছে সূত্রটি গোপনই রেখেছিল। তার 'ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টি'র ভেতরের রহস্যটি ফাঁস করার মতো বোকা সে নয়। সেই চর যখন তাকে 'ও স্টার, মাই স্টারে'র বিক্রির লাফ মারার খবর এনে দিল তখন প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও সে বেমালুম ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিল। এ কি লোকের কাছে বলে বেড়ানোর বিষয় ?

কিন্তু সুদেব সরকার যে কত বড় ঘোড়েল তার প্রমাণ সে কিছুক্ষণ আগেই দিয়েছে টেলিফোনে। দেখা যাচ্ছে প্রকাশের চাইতে তার গোপন সূত্রও কম জোরদার নয়।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে অবিশ্রান্ত সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে তুরুপ সেন আর জ্যাকি খাম্বাটার জন্য অপেক্ষা করছিল প্রকাশ। এদের দু'জনের ওপরই দায়িত্ব ছিল অরুণকুমারকে কভার করার।

বিনোদন-বার্তার এক নম্বর সাংবাদিক তুরুপ সেন। বাঘা সাংবাদিক। ম্যাজিসিয়ানের মতো শূন্যে হাত ঘোরালেই খবর। তার কলমে আছে জাদু। দু'চারটে শব্দ এখানে-ওখানে কেটে-ছেঁটে জুড়ে দিয়ে যা-চাই-তাই বানাতে তার জুড়ি মেলা ভার। আর খাম্বাটাকে সবাই আদর করে ডাকে বোম্বেটে খাম্বাটা। ছোটখাট চুপচাপ মানুষ। মিটিমিটি হাসে আর যত্ন করে ছাঁটা কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চ-কাটে হাত বুলোয়। কিন্তু তার গলায় সর্বক্ষণ ঝোলানো ক্যামেরাটি বড় মারাত্মক। ওটা দিয়ে খাম্বাটা যে কি অসাধ্য সাধন করতে পারে তা ভাবা যায় না। সাদামাটা ছবিতেও সে নিয়ে আসতে পারে স্টাণ্ট। মানুষের দুর্বলতার মুহূর্তগুলো যেন ভগবানের মতোই ব্যাটার জানা। ঠিক মুহূর্তে ঠিক অ্যাঙ্গেল থেকে শাটার টিপে ধরে রাখে। ক্যামেরা-দস্যু !

বিনোদন-বার্তার এহেন দুই খুঁটির ওপরও মনে মনে গজরাচ্ছিল প্রকাশ চৌধুরী। শালা কাগুজে বাঘ সব। চ্যালেঞ্জিং জব পড়লে এলেম বোঝা যায়। শেষ হয়ে আসা সিগারেট ঠোঁটে চেপে রেখে আরেকটা ধরানোর জন্য প্যাকেট খুলল প্রকাশ। প্যাকেট খালি।—ধেত্তেরি।

সিগারেট আনানোর জন্য কলিংবেল টিপতে যাবে এমন সময় ঢুকল তুরুপ আর খাম্বাটা।

বোতাম টেপা হল না প্রকাশের, হাত সরিয়ে নিয়ে কটমট করে তাকাল দু'জনের দিকে।

তুরুপের আনমনা ভঙ্গি বা খাম্বাটার মুখটেপা হাসির ওপর এতে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে মনে হল না।

দু জনে বসল চেয়ারে। তুরুপ আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল। খাম্বাটা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে নিজে ধরাবার আগে প্রকাশকে অফার করল।

—থাক। প্রকাশের স্বর রীতিমতো রুক্ষ।

—খচে আছ মনে হচ্ছে। প্রকাশের দিকে বাড়ানো প্যাকেট থেকে তুরুপ একটা সিগারেট তুলে নিল।

—না, খচে থাকবে না, প্রেমের সাগরে ভাসবে। আমার কপালে জুটেছে যত শালা পয়মাল। ধ্যাধ্ধেরে খবর, ডালভাত-মার্কা ছবি। লোকে কেনে?

—কেয়া, সেল পড়ে গেল? খাম্বাটা সেমি-সার্কেল গোঁফ আর ফ্রেঞ্চ-কাটের ফাঁক দিয়ে টুক করে বলল।

খেঁকিয়ে উঠল প্রকাশ—না, পড়ে যাবে না, উঠবে। কি মাল ছাড়ছ তোমরা জান না?

নাকমুখ দিয়ে বগবগ করে ধোঁয়া ছেড়ে তুরুপ বলল—ভাল্লাগে না মাইরি। সোজাসুজি পয়েণ্টে চলে এসো দাদা, ঘুরিয়ে নাক দেখাতে হয় সে শালা কাগজের পাতায়। নিজেদের মধ্যে আলোচনা হবে সিধে, সাফসুফ।

প্রকাশের সঙ্গে তুরুপের অনেকদিনের বন্ধুত্ব। তাছাড়া তুরুপ নিজের এলেম সম্পর্কে বিলক্ষণ সচেতন। তুরুপ-খাম্বাটা জুটিকে লুফে নেবার জন্যে বহু কাগজ হাত বাড়িয়ে আছে। প্রকাশও জানে নিউজ-স্টোরি তৈরি করতে এই দু'জনের মতো পাখোয়াজ লাইনে আর নেই। অমনি অমনি সুদেব সরকার মাসে মাসে আড়াই হাজার করে ঢালছে না দু'জনের পেছনে। উপরি বায়নাক্কাও কম না। ওরাই বিনোদন-বার্তার আসল মূলধন।

মিনিট খানেক গুম হয়ে বসে থেকে প্রকাশ বলল—দে, সিগারেট দে।

খাম্বাটা প্যাকেট এগিয়ে ধরল।

—এবার বল দিকি কি ব্যাপার। তুরুপ বলল।

—ব্যাপার আবার কি। 'ও স্টার, মাই স্টার' সেল পঞ্চাশ হাজার বাড়িয়ে ফেলেছে। আমরা ওদের পেছনে চলে গেছি।

—তাতে কি ঘোড়ার কচু হয়েছে, তুরুপ আমলই দিল না, দেখ প্রকাশদা—তিনটের একটা হবে। অরুণকুমার ফুটে যেতে পারে, অল্পদিন ভুগে সুস্থ হয়ে উঠতে

পারে,-বেশ কিছুদিন চিৎপাত হয়ে থাকাও সম্ভব। যে হাওয়ায় স্টার সেল বাড়িয়েছে সেটা ক'দিন থাকবে বল তো? অরুণকুমার ফুটে যাওয়া বা সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত। বেশিদিন পড়ে থাকলেও হাওয়া হাওয়া হয়ে যাবে। তখন শালারা কি করবে? কিন্তু এখনো আমরা আছি, তখনো থাকব।

—সুদেব সরকারকে কে বোঝায় বল্। কি খিস্তি করল আমাকে টেলিফোনে!

—বুঝতে না চায় বসে বসে নিজের যা-ইচ্ছে ছিঁড়তে বল।

—তুই তো ওকে জানিস তুরুপ, 'ও স্টার, মাই স্টার' নতুন কিছু করলেই ওর মাথা গরম হয়ে যায়।

—আমরা বেস্ট কভারেজ দিয়েছি—কি স্টোরি, কি ছবি। স্টার শুধু অরুণকুমার-সুলক্ষণার সম্পর্ক নিয়ে স্ক্যাণ্ডাল ছেপে কয়দা তুলেছে—টেম্পোরারি কয়দা। ওটা কি একটা স্টোরি হয়েছে? আসল জিনিস সেক্স-অ্যাঙ্গেলটাই জমাটি করে আনতে পারেনি। তার ওপর ধান ভানতে শিবের গীত—যেসব জিনিস এ ধরনের স্টোরিতে ছুঁতে নেই—মর‍্যাল বা লিগ্যাল সাইড,—তা নিয়েও শালারা ভ্যানতারা করেছে। সেক্স ছড়াও, রিডার খুশি পড়ে, আর্টিস্ট খুশি তার সেক্সবম্ বা হি-ম্যান ইমেজ বাড়ছে দেখে। হিউম্যান অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত ওরা খুশিমনে নেবে। কিন্তু মর‍্যাল লিগ্যাল ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করলে ওরা বরদাস্ত করবে না। তুমি কি ভাবছ এই ব্যাপারের পর স্টার কখনো অরুণকুমার-সুলক্ষণার কো-অপারেশন পাবে?

নাক দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শুনছিল প্রকাশ। মেজাজ খানিকটা ঠাণ্ডা হয়েছে এতক্ষণে।

—আরে বাব', আমি না হয় বুঝলাম। তুই কি ভেবেছিস আমি এসব বুঝিনা, না ওকে বলিনি?

—তব্? থাম্বাটা প্রশ্ন রাখল।

—ও যা বলছে সেটাও একেবারে ফেলে দেবার মতো নয়। সুলক্ষণা 'অঢেল রঙ্গ'র সম্পাদককে বলেছে অরুণকুমার সুস্থ হয়ে উঠলে ওরা 'ও স্টার, মাই স্টারে'র বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবে, অন্তত দশ লাখ টাকার ড্যামেজ স্যুট। 'অঢেল রঙ্গ' সেটা আবার নিউজ করে দিয়েছে। ঘোঁট কদ্দূর গড়াচ্ছে বুঝছিস?

—তবে তো হয়েই গেল, স্টারের বারোটা এমনিই বেজে যাবে। তুরুপ তুড়ি দিয়ে সিগারেটের ছাই ছড়িয়ে দিল।

—বড় সোজা, না? প্রকাশ ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট করে তাকাল, দেখ্, তুরুপ,

তুই আমাকে আণ্ডার-এস্টিমেট করিস, আমি সুদেব সরকারকে আণ্ডার-এস্টিমেট করি। তাতে সরল সত্যটা পালটে যাচ্ছে না। আমাদের মধ্যে তফাত আছেই। তুই ভালো নিউজম্যান, কিন্তু এডিটর হওয়ার ক্ষমতা তোর নেই। আবার সুদেব সরকার নিউজম্যানও নয়, এডিটরও নয়, কিন্তু ব্যবসা আমাদের চোদ্দ পুরুষকে কান ধরে শেখাতে পারে। আচ্ছা, তুই ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবি অরুণকুমার-সুলক্ষণার ক্ষমতা নেই স্টারের বিরুদ্ধে মামলা করবার। একই ফ্ল্যাটে ওরা থাকে, বাট দে আর নট ম্যারেড, কোনো হিঁদু এক বৌ থাকতে আরেকটা বিয়ে করতে পারে না. অতএব···

—অতএব তোমার মাথা। ওরা কোর্টে দাঁড়িয়ে হলফ করে বলবে এক বাড়িতে থাকলেই যে ব্যভিচারের সম্পর্ক হবে তার কোনো মানে নেই। দে লিভ লাইক ফ্রেণ্ডস্। এবার ?

—এবার ? অসীম তৃপ্তির হাসি মুখে ছড়িয়ে দিল প্রকাশ, এবার তোর মাথা। এ পর্যন্ত অন্তত কয়েকশো বার পত্রিকার সঙ্গে ইণ্টারভিউতে সুলক্ষণা অরুণকুমারকে উল্লেখ করেছে আমার স্বামী বলে। কই, ছাপানো ইণ্টারভিউর কোনো প্রতিবাদ তো ওরা করেনি। কি দাঁড়াল তাহলে, চমৎকার একখানা কেচ্ছা তৈরি হল। স্টার ফয়দা তুলে চলবে বেশ কিছুদিন, 'অঢেল রসের মতো ছুটকোগুলোও আশপাশ থেকে মধু খাবে। আমরা শুধু পড়ে পড়ে মার খাব। আমাদের প্রেস্টিজ আছে. স্টারের তৈরি ইস্যু থেকে আমরা ফয়দা ওঠাতে পারি না।

তুরুপের মুখ থেকে আনমনা নিজের-মধ্যে-ডুবে-থাকা ভাবটা সরে গেল, মুখ লাল করে সে বলল—হোকগে যা খুশি। প্রফেশনাল এটিকেট আমি বিসর্জন দিতে পারব না। প্রফেশনাল এথিক্স তুমি মান কি মান না ?

—বাতেলা ছাড়, তুরুপ, এটিকেট-এথিক্সের ওকম্ম আমরা বহুকাল করে দিয়েছি। এনটারটেনমেণ্ট জার্নালের কথা ছেড়েই দে, খবরের কাগজে কি হচ্ছে আজকাল ? একটা নিউজ অনেস্টলি প্রেসড হয় ? যেভাবে ছাপলে, ডিসটর্ট করলে কাগজের আখের তৈরি হবে, সেইভাবেই ছাপে। আমরা তো—। তার প্রিয় একটা অশ্রাব্য বিশেষণ নিজেদের সম্পর্কে প্রয়োগ করে প্রকাশ থামল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ তিনজনই। অস্বস্তিকর অবস্থা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া।

প্রকাশ তুরুপের মন পড়তে জানে। তুরুপের সামনে সে ঠিক চ্যালেঞ্জটি ছুঁড়ে দিয়েছে। ও বুঝতে পারে তুরুপের নাছোড়বান্দা মনটা এখন রাস্তা খুঁজছে। এক

নম্বরের জায়গা থেকে হেরে গিয়ে সরে যেতে সে নারাজ। ওর সাংবাদিক মগজে আইডিয়ার তোলপাড় চলছে। প্রকাশ ওকে সময় দেবার জন্য চুপ করেই রইল।

—ঠিক আছে। খানিক পরে আলতো করে বলল তুরুপ।

—এনি আইডিয়া? প্রকাশের মুখ চকচক করে উঠল।

—আলবৎ আইডিয়া, তুরুপ সেনের পা দুটো নাচতে লাগল, তুরুপের তাস শেষ পর্যন্ত তুরুপ সেনের হাতেই থাকে। তুমি একটি নম্বরী মাল প্রকাশদা, ঠিক জান কি করে সুরপথে আমার ভ্যানিটিকে ঘা দিতে হয়।

—কি যে বলিস তুরুপ।

—ন্যাকামো রাখ।

—মতলবটা বলবি?

—তুমি অর্ডার করলে বলতে আমি বাধ্য।

—ছি, ছি!

—শ্যুটিংয়ের সময় অরুণকুমারের চোট লাগার ঘটনাটা খতিয়ে দেখতে গিয়ে আইডিয়াটা প্রথমেই আমার মাথায় এসেছিল। একটা হতভাগা লোকের ক্ষতি হয়ে যাবে ভেবে আমি ওদিকটা এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন সুদেব সরকার আর তুমি মিলে যা আরম্ভ করেছ তাতে ওটা দিয়েই আমাকে বাজার কাটাতে হবে। কার কি ক্ষতি হল না হল…ঠিক আছে…আজ এই পর্যন্ত। আগে কয়েকটা এনকোয়ারি করে নিয়ে তারপর একটা ইণ্টারভিউ নেব। তারপর পাবে তোমার মাল। ডিটেলস্ জানা কি এক্ষুনি দরকার?

—মোটেই না, মোটেই না। তোকে আমি সেণ্ট পারসেণ্ট বিশ্বাস করি। আমাকে স্যরপ্রাইজ দেয়ার প্লেজার থেকে তোকে বঞ্চিত করার মতো নিরেট আমি নই।

—ও. কে। কিছু খরচাপাতি লাগতে পারে। তুরুপ বলল।

—সে তুই যা বলবি। প্রকাশ গদ্‌গদ।

—ঠিক আছে। চল্ খাম্বাটা। তুরুপ উঠে দাঁড়াল।

৫

নিলয় বেরুনোর জন্য তৈরি হচ্ছিল। নিনাকে বলে রেখেছিল স্টুডিওতে যাবে। খেয়ে-দেয়ে জামা-প্যাণ্ট পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল। অরুণকুমারের মতো করেই ছাঁটা চুল। গোঁফটাও একই রকম। এভাবে

চুল-গোঁফ রাখা নিলয়ের পছন্দ নয়। মেক-আপের সুবিধার জন্য রাখতে হয়েছে। পরিচালকদের নির্দেশ। নির্দেশ মেনে কর্তাব্যক্তিদের খুশি রেখে তাকে চলতে হয়। সে অরুণকুমারের মতো বড় আর্টিস্ট নয়—আর্টিস্টই নয়। চিরুনিটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল নিলয়।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে পার্স বের করল। তিনখানা দু'টাকার নোট, এক টাকার মতো খুচরো। পথে-ঘাটে এত কম পয়সা নিয়ে বেরুনো ঠিক নয় আজকাল, কখন কোথায় আটকে পড়তে হবে বলা যায় না। নিনাকে ডেকে কয়েকটা টাকা চেয়ে নিলে হয়। নিনার ভাঁড়ারের অবস্থা ভেবে চাইতে পারল না। জগদীশদার কাছ থেকে সেই পাঁচশো টাকা নেবার পর পনেরো দিন কেটে গেছে, একটা পয়সাও রোজগার হয়নি তারপর। অরুণকুমার পড়ে না থাকলে এর মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছ'টা শুটিং ডেট নিলয়ের থাকত। মানুষ নানাভাবে মানুষের অধীন। কিন্তু এমন আশ্চর্য অধীনতা আর কারো আছে কি?

পনেরো দিন বসে থাকতে থাকতে আর খবরের কাগজে অরুণকুমারের খবর পড়তে পড়তে নিলয় ক্লান্ত। আজ যে সে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে স্টুডিও পাড়ায় যাচ্ছে, তা নয়। কাজ পাবার আশায় তো নয়ই। অরুণকুমার ফ্লোরে না আসতে তার আবার কাজ কি? সাধারণ ফাইটিং সিনে তাকে কেউ নিতে চায় না। অরুণকুমারের ডামিকে সামনে না আনার একটা অলিখিত চুক্তি পরিচালকদের মধ্যে আছে। কেউ তাকে নিলেও অরুণকুমারের সঙ্গে তার মিলটাকে অ-মিল করার জন্য মেক-আপে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। ফাইটিং সিনের একজন এক্সট্রার জন্য এত পরিশ্রম আর ঝামেলা পোয়ানোর কোনো যুক্তি নেই।

পার্সটা পকেটে রেখে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিলয় অস্ফুট শব্দ করল—হুঁ।

—স্টুডিওতে যাচ্ছ কেন? শুটিং আছে নাকি? নিনা জিজ্ঞেস করল।

—নাঃ, মহাপ্রভু সুস্থ না হতে ··ও, আজ দশ তারিখ খেয়াল আছে?

—কি বল তো?

—বাঃ, মাসের প্রথম হপ্তায় তুমি বাবা-মা'র কাছে যাও না?

নিনা নিরুত্তরে আঁচল দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়না পরিষ্কার করতে লাগল।

—কি? নিনার উত্তর না পেয়ে নিলয় বলল। কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে নিনাকে বুকের কাছে টেনে আনল নিলয়।

—এই, কি হচ্ছে! বিষণ্নতা ছাপিয়ে নিনার চোখে ঈষৎ হাসি।

—হবে আবার কি। কথার উত্তর দিচ্ছিলে না কেন? নিনাকে টেনে নিয়ে খাটের কিনারে বসল নিলয়।

—কই, বল।

—কি বলব বল।

—বাবা-মা'র কাছে যাওনি কেন?

নিলয়ের বুকে আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে নিনা বলল—তুমি জান ওদের অবস্থা। তোমার দেয়া একশো টাকার দাম ওদের কাছে অনেক। খালি হাতে যাই কি করে বল?

—কে বলেছে তোমাকে খালি হাতে যেতে?

—পাঁচশো টাকার শ'দেড়েক হাতে আছে। ব্যাংকে আছে বেশি হলে চারশোর মতো। এ মাসে তুমি কি আর পেমেণ্ট পাবে?

—না-ই যদি পাই আমরা কি মরে যাব? তুমি কি ভাবছ অরুণকুমার যদি আর না ফেরে তাহলে আমাদেরও এখানেই শেষ? তা-ই যদি হয়, তোমার বুড়ো বাবা-মাকে একশো টাকা না দিলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তুমি হয়তো ভেবেছ টাকা দিলে আমি রাগ করব।

—ছি, ছি—

—তবে আর বাজে চিন্তা নয়। টাকাটা আজই দিয়ে এসো।

এই মুহূর্তে নিনার মুখের আশ্চর্য নীরব ভাষা এমন করে বুকের ভেতরে ঢেউ তুলল নিলয়ের যে সে দু'হাতে নিনাকে একেবারে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে নিল।

পায়ে বাবুসোনার কচি হাতের চড়-চাপড়ে হুঁশ ফিরল নিলয়ের। মাকে আদর করার অধিকার একমাত্র তারই, সেখানে বাবার অনধিকার প্রবেশ সহ্য করতে বাবুসোনা নারাজ।

—ওরে দুষ্টু, নিনাকে সরিয়ে বাবুসোনাকে কোলে তুলে নিল নিলয়, মা শুধু তোর একলার, নারে ব্যাটা!

বাবুসোনাকে খানিক আদর করে, নিনাকে আবার বাবা-মা'র কাছে যাবার জন্য বলে নিলয় বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

ঘরের কাজ করতে করতে কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল নিনা।···

দুঃখকষ্ট অভাবে নিনা অভ্যস্ত জন্ম থেকেই। নিনা নয় সুরমা—সুরো। নিনায় রূপান্তর পরে।

দেশভাগের পর বাবা-মাকে এক বস্ত্রে এপার বাংলায় চলে আসতে হয়েছিল। সঙ্গে ছোট ছোট দুই ছেলে। সুরোর জন্ম এখানে।

বাবা সোজা সরল নিরীহ মানুষ। অনেকের সঙ্গে দলে পড়ে একটাই সাহসের কাজ তিনি করতে পেরেছিলেন। খাসজমি জবরদখলের অভিযানে তিনিও এক টুকরো জমি বেড়া দিয়ে ঘিরে সেখানে মুলিবাঁশের বেড়ার দু'খানা ঘর তুলেছিলেন। নইলে আজ ওরা কে কোথায় ভেসে যেত কে জানে। কিন্তু কলোনির আরো অনেকের মতো বাবার কৃতিত্বও ঐ পর্যন্তই। দেশে ছিলেন ম্যাট্রিক-পাস ইস্কুল মাস্টার। নিচু ক্লাসের ছাত্রদের পড়াতেন। এখানে তার দাম কি ? মনে শিক্ষিত মানুষের অহংকার, অথচ শিক্ষাটা এমন নয় যে তা দিয়ে এখানে ইস্কুল মাস্টারি দূরস্থান, মুরুব্বী ছাড়া ছোটখাট একটা চাকরিও পাওয়া যেতে পারে।

যাদের মুরুব্বী ছিল তারা কেউ কেউ কাজকর্ম জুটিয়ে নিল। যাদের জুটল না বাঁচার তাগিদে কালো-সাদা দু'রকম পথেই পা বাড়াল তারা। ইজ্জতের ঠুনকো ধারণাগুলো পেটের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এরই মধ্যে বহু নকল উদ্বাস্তুও আখের তৈরির আশায় এসে বাসা বাঁধল কলোনিতে। বাবা এই নতুন পরিবেশে, বিরাট ভাঙচুরের মধ্যে মানুষের নতুন করে গড়ে-তোলার সৎ-অসৎ অদ্ভুত প্রয়াস, পুরনো ধ্যান-ধারণার শিকড় উপড়ে মুখ থুবড়ে পড়া কি রকম যেন ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন, আজও দেখেন। কিন্তু পাঁচটা মানুষের পেটে দানাপানি দেবার দায়িত্বও তাঁরই, তাই শুধু তাকিয়ে থাকলেই চলবে না, তাঁকেও বেরুতে হত সৎ উঞ্ছবৃত্তিতে, এখনো হয়।

অদ্ভুত ভালোমানুষ বাবার চোখের অসহায় মার-খাওয়া দৃষ্টি অনুভব করবার মতো বয়েস হওয়ার সময় থেকেই সুরো বাবার জন্য দুঃখবোধ থেকে তাঁর সমস্যাটা বুঝতে চেষ্টা করত। সময়ে বুঝেছিল। বুঝেছিল মাটি থেকে ওপড়ানো গাছের যন্ত্রণা। বাবার সংস্কারগুলোকে সুরো মানতে পারত না, কিন্তু হারিয়ে-যাওয়া মূল্যবোধগুলোর জন্য তাঁর নিঃশব্দ হাহাকার সুরো বুঝতে শিখেছিল, কারণ স্বাভাবিকভাবেই এগুলো তার মধ্যেও ছিল। শুধু বাবার মতো গোঁড়ামিগুলো ছিল না। সাধু হতে গেলে গেরুয়া পরতে হবে এমন চিন্তায় সুরোর মনের সায় ছিল না। সৎ-অসৎ মানুষের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। অন্যের বিচারে সত্য বড়ই কম। একেবারে নিরপেক্ষ শুদ্ধ মন নিয়ে ক'জন পারে মানুষের বিচার করতে ? ইস্কুল-কলেজে না পড়েও সুরো এভাবে ভাবতে পারত অল্প বয়সেই। লেখাপড়া তার সামান্য, বাড়িতে, বাবার কাছে।

দাদাদেরও লেখাপড়া হল না, হওয়া সম্ভব ছিল না। সাবালক হতেই এমন সব সঙ্গী জুটেছিল ওদের যারা বাঁকা পথে জীবনটাকে সরল করার চেষ্টা করত। বাবা অসহায় নীরব দর্শক। মায়ের কান্না, ঠাকুরের কাছে মাথা কোটা দুঃখের সাময়িক শান্তি, তাতে অভাব ঘোচে না, সন্তানের বিপথে যাওয়া ঠেকানো যায় না।

বড় দুই ভাইয়ের মতিগতি, সংসারের চূড়ান্ত দুর্দশা স্বরোকে ভাবাত। সংসারের হাল ফেরানোর জন্য ওর সর্বক্ষণ চিন্তা, কিন্তু সব চিন্তাই নিজের অযোগ্যতার পাহাড়ের সামনে থমকে দাঁড়াত একসময়। অক্ষমতার অস্থিরতা লুকিয়ে রাখার জন্য ও নিজেকে অকারণে ব্যস্ত রাখত সর্বদা। সে যে কি জ্বালা!

এ সময় হঠাৎ একদিন পাশের বাড়ির বাসি খবরের কাগজে চোখে পড়ল একটা বিজ্ঞাপন—সিনেমায় অভিনয়ের জন্য নতুন মুখ চাই। কাগজের পাতাটা চেয়ে নিয়ে এল। মনে দ্বন্দ্ব প্রচুর, ভয়ের অবধি নেই। সম্পূর্ণ অচেনা জগতে একেবারে একা হানা দেয়ার কি যোগ্যতা আছে তার? একটাই মাত্র যোগ্যতার ভরসা শেষ পর্যন্ত মনকে দিতে পেরেছিল। লোকে তার চেহারার প্রশংসা করে, মায়ের বন্ধুরা বলে গড়ন ভালো, মুখে লক্ষ্মীশ্রী আছে। ফিগারের অশালীন প্রশস্তিও পাথে-ঘাটে যেতে-আসতে শুনতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত চেহারার ভরসাতেই মরিয়া স্বরো গিয়ে হাজির হয়েছিল বিজ্ঞাপনদাতার অফিসে।

বাড়িতে অবশ্য প্রথমে গোপন রেখেছিল। আপত্তি আসবেই সে জানত। সুযোগ পেলে আপত্তি-নিন্দার পরোয়া সে করবে না তাও ঠিক করে রেখেছিল। সমাজ-সংসার তাদের বিস্তর দিয়েছে, অতএব সমাজ-সংসারের কাছে কৈফিয়ত দেবার দায়ও তাদের নেই। স্বরোর দায় শুধু নিজের কাছে, সেখানে সে ঠিক ছিল।

ভিড়ে ভিড়। নানান বয়সের নানান ধাঁচের মানুষ—ছেলে মেয়ে বুড়ো। মানুষের সংখ্যাই স্বরোকে হতাশ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তার ওপর চলন-বলন-কায়দায় এমন অনেক চটপটে ছেলেমেয়ে ছিল ওখানে যে ওদের তুলনায় নিজেকে নিতান্তই আটপৌরে মনে হওয়ায় ফিরে আসার তাগিদটাই জোর হয়ে উঠছিল মনে। তবু শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিল।

কি জানি কেন, যে ভদ্রলোক ইণ্টারভিউ নিচ্ছিলেন তিনি ওকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, আবার আসতে বলেছিলেন। স্বরো জেনেছিল ভদ্রলোকের নাম—মহেন্দ্র সেন—বিখ্যাত পরিচালক। নতুন মুখ নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন। সেই ছবিতে স্বরো অপ্রত্যাশিত কাজও পেয়েছিল—গ্রামের মেয়ের দু'লাইনের পার্ট।

দারুণ উৎসাহ আশা। কিন্তু নিভে যেতেও সময় লাগেনি। ক্যামেরার চোখ ওকে তেমন সুন্দর দেখেনি। উচ্চারণে পুব বাংলার সামান্য টান—জন্ম-সূত্রে পাওয়া। অভিনয়ের অ-জ্ঞানও নেই। তবু হয়তো খানিকটা এগনো যেত। কিন্তু ভেতরের প্রবল বাধাই ওকে এগোতে দেয়নি।

আধুনিকা সাজল বাইরের চেহারায়, সজ্জায়। একজনের উপদেশে সেকেলে সুরমা রায় নামটাকেও পালটে নিনা রায় করে নিল। তার বেশি আর পারেনি। চোখের সামনেই দেখত যারা পারছে তাদের ছোটখাট কাজ ভালোই জুটে যাচ্ছে, তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবার দায়িত্বও সানন্দে নিচ্ছে দরকারী লোকেরা। কিন্তু সুরো পেশার খাতিরেও, ফিল্মী দুনিয়ার লোকেরা মেয়েদের সম্পর্কে যাকে বলে গোঁড়া'ম, সেই শুচিতার বোধটাকে মন থেকে স'রিয়ে ফেলতে পারেনি।

শক্ত বেড়ায় ও ঘিরে রাখত নিজেকে। বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে একটু-আধটু বাচালতা পর্যন্ত ও মেনে নিত, তার বেশি নয়। এতে কি বাজার তৈরি হয়? বিশেষ করে যে মেয়ে নিতান্তই সাধারণী?

দু'কথার হলেও চরিত্র বলতে সেই প্রথম ছবিতেই। তারপর সবই ভিড়-বাড়ানো ভূমিকা। তবু তো মাঝে-মধ্যে পাঁচ-দশ টাকা পাওয়া যায়। সুরো লেগে রইল। রাখ-রাখ-ঢাক-ঢাকের ব্যাপার নয়, বোকার মতো সে চেষ্টা করেওনি সুরো। সারা শহর হাজার বার ঘুরে এলেও যে মুখ দশজন মানুষের মনেও দাগ ফেলে না সেই মুখই সিনেমার পর্দায় আধ মিনিটের তরে হাজির হলেও হাজার মানুষের চেনা হয়ে যায়। কি জাদু সিনেমার! তিন-চারটে ছবিতে মুখ দেখানোর পরই সুরো ঐ অঞ্চলে রীতি-মতো পরিচিত হয়ে গেল।

যথারীতি পরিচিতির সঙ্গে উপরি পাওনা কুখ্যাতি। সিনেমার এক্সট্রা মেয়ে কি ভালো হয়? সুরো বাবা-মা'র কাছে তার কাজের কথা গোপন করেনি। মেয়ের কাজের অন্ধকার দিকটা ভেবে দেখবার অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল না। ছিল সাধারণভাবে মেয়েদের কাজ করায় বাবা-মা'র আপত্তি, যেটা মেয়ের এনে দেয়া দু'দশ টাকার বিরাট সাহায্যের সামনে মোটেই জোরালো হতে পারেনি। কিন্তু কেচ্ছা যখন লোকের মুখে-কানে ঘুরতে ঘুরতে তাঁদের কানেও এসে পৌঁছল তখন তাঁদের আপত্তি রীতিমতো সরব হল।

—তুই আমাগ মানসম্মান বংশমর্যাদায় কালি দিতে আছস।

—ক্যান্, কি করছি আমি?

—তুই জানস না কি করতে আছস ?

—খাইটা পয়সা আনি, চুরি ত করি না।

—পোলাপান সাজনের চেষ্টা করিস না সুরো। তোরে কেউ চোর কয় নাই।

—তয় ?

—মাইয়ারে লোকে নষ্টচরিত্র কইলে হেইডা বাপ-মা'র বুকে লাগে।

—মা !

—হ, লোকে হেই কথাই কয়।

—আমার আর জাননের বাকি নাই। এইখানে হগলেই সাধু, হগল মাইয়াপোলাই সতী। আমার সার্ক কথা শুইনা রাখ। না আছে বিদ্যা, না জানি কোনো কাম। সৎভাবে খাইটা দুইটা পয়সা আনি। লোকে কি কয় আমি জানি, পথে-ঘাটে টিটকারিও দেয়। কিন্তু কাম আমি ছাড়ুম না। কওনের বাকি আর কি আছে। আমারে বিয়া কইরা রাজরানী বানাইতে কেউ আহে নাই। আমারে ঘাটাইও না, তোমাগ থেইকা সংসারটারে আমি ভালো চিনছি।

মাতাল এবং এরই মধ্যে নানা দুষ্কর্মে পাকাপোক্ত দুই দাদার আপত্তির ভাষা ছিল আরো তীব্র, কুৎসিত। কারণও অবশ্য ছিল। সুরোর কষ্টের রোজগার থেকে একটা পয়সাও ওরা চেয়ে পেত না। সুরোর স্পষ্ট জবাব ছিল—'তোগরে মদ খাওয়ানের লাইগা আমি খাটি না।' আপত্তি ছিল মা-বাবা দুই দাদা সকলেরই। কিন্তু সেই আপত্তি কটু-কাটব্যের বেশি নয়। অভাবের সংসারে পয়সা এমনই বস্তু।

সুরো জেদ বজায় রেখেছিল। সর্বস্ব খুইয়ে আসা মানুষদের জীবনে অচেনা হাজারো নতুন সমস্যা, কেচ্ছা নিয়ে মাতামাতি করার বেকার মন বা অঢেল সময় তাদের ছিল না, সকলেরই ধান্দা আছে জীবন ও জীবিকার এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো সাদা সরল নয়। কেচ্ছার হিলহিলে জিভগুলো অল্পদিনেই তাই নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।

তবু সুরোর মনটাকে আস্তে আস্তে ছেয়ে ফেলছিল গাঢ় মেঘের মতো হতাশা। এভাবে কতদিন চলবে ? চলে লাভই বা কি ? দারিদ্র থাক আপত্তি নেই, জন্ম থেকেই দারিদ্রের অভ্যাস। কিন্তু মর্যাদাহীন কাজের জন্যই যত যন্ত্রণা সুরোর। কাজের বিনিময়ে পয়সা, না ভিক্ষা ? এক্সট্রা মেয়ে বেশি সংখ্যায় দরকার হলে জোগাড় করে দালালরা। দোরে দোরে ঘুরে এ কাজ সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ পাড়ায় দালালদের যোগাযোগ থাকে। একটা চক্কর দিয়ে এলেই হল। মেয়েরা দল বেঁধে এসে হাজির

হত। কথাবার্তা, চলন-বলনই বলে দিত তাদের পেশা। এদের সাধারণত দরকার হত বিয়েবাড়িতে মেয়েদের ভিড় দেখাতে বা ঐ রকম কোনো দৃশ্যে। স্বরো ছিল এদের এক ধাপ ওপরে। বড় হোটেলে ক্যাবারে নাচের আসরে হাই সোসাইটির মহিলার হাতে মদের গ্লাস বা একাকী একটি ছিমছাম মেয়ের হেঁটে যাওয়া—এইসব দৃশ্যে স্বরো সুযোগ পেত।

কিন্তু যখন কাজ থাকত না জুটিয়ে-আনা মেয়েদের ভিড়েও নাম লিখিয়ে দু'পাঁচ টাকা যা পেত নিয়ে নিত। নাচতে নেমে আবার লজ্জা কি? মাঝে-মধ্যে কিন্তু হঠাৎ দু'একটা কথা বা ব্যবহার খচ্ করে বুকে বিঁধত। একদিন একটি মেয়ে তাকে বলেছিল—'তোমার কোন্ পাড়ায় ঘর ভাই? সোনাগাছি? আমাদের হারকাটায় তো তোমায় দেখিনি।' জায়গা দুটোর নাম স্বরো শুনেছিল আগেই, উত্তর না দিয়ে সরে এসেছিল। আরেকদিন একটি মেয়ে ওকে একপাশে ডেকে বলেছিল—'শোনো ভাই, তোমাকে না আমার ভারি ভালো লাগছে। আমাদের বাড়িতে না ভাই, সব তোমার আমার মতো ফার্স্টো কেলাস। বাড়িউলি লক্ষ্মীমাসির নজর উঁচু। তা ভাই যা বলছিলাম, আমাদের বাড়িতে একখানা ঘর খালি হয়েছে। মাসিই তাড়িয়ে দিয়েছে রীতাকে, ও বড় শুকিয়ে যাচ্ছিল। তোমার ছিরিছাঁদ ভালো, তুমি চাইলে মাসি ঘর দেবে। আমাদের বাড়িতে ভাই ভগমানের ইচ্ছেয় কারো ঘরেই রোজ তিন-চারখানার কমে খদ্দের হয় না। তুমি এখন আছ কোন্ বাড়িউলির বাড়িতে?' 'আচ্ছা, ভেবে তোমায় বলব' বলে স্বরো সরে এসেছিল এবং আড়ালে গিয়ে বুকের চাপ হালকা করেছিল কেঁদে।

নর্দমা থেকে খুঁটে খেতে গেলে গায়ে ময়লা লাগবেই। মন যে মানে না তবু। বর্তমানই নেই, ভবিষ্যতের ভাবনা কিন্তু ছিল তা সত্ত্বেও। ক'বছর পরে বয়েস থাকবে না, শরীর ভাঙবে। সে অভিনেত্রী নয়, এক্সট্রা। তখন কি দাম থাকবে তার? অথৈ নিরাশায় তলিয়ে যাচ্ছিল স্বরো।

এ সময় নিলয়ের সঙ্গে দৈবাৎ আলাপ না হলে কি হত ভাবতেও আজ ভয় হয়।

জগদীশদার বাড়িতে প্রথম পরিচয়। জগদীশদা-মণিবৌদি ওকে স্নেহ করত। সাহস দিত। যেখানেই সুযোগ পেত জগদীশদা স্বরোকে কাজে লাগিয়ে দিত। আগলে আগলে রাখত ওকে নিজের বোনের মতো। স্বরোও মনের ভার হালকা করতে ছুটে ছুটে যেত ওর বাড়িতে।

সেখানেই নিলয়ের সঙ্গে একদিন দেখা। দেখে চমকে উঠেছিল স্বরো—হুবহু

অরুণকুমার। জগদীশদা পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল—'তোমরা একই লাইনের লোক।' কার যে কি কাজ সেটা পরিষ্কার করে বলেনি, বোধ হয় এই ভেবেই যে সে তো ওরা জানবেই। আরো একটা কথা বলেছিল সেদিন জগদীশদা যা আজও মনে আছে স্বরোর—'নিলয়, এ মেয়েটা তোরই মতো ভালো। তোরা দু'জনেই বেখাপ্পা জায়গায় এসে পড়েছিস।'

তারপর পরিচয় একদিন মন-জানাজানিতে পৌছল। স্বরো আবিষ্কার করেছিল নিলয়কে। ওর মনের মধ্যে যেন নিজেরই মনের ছায়া দেখতে পেত। একদিকে সুখের রোমাঞ্চে মন ভরে থাকত, আরেকদিকে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত সর্বক্ষণ। নিজেকে নিয়ে তখন ভাবত না স্বরো, শুধু মনে হত এই ভালোবাসা নিলয়ের সর্বনাশ ডেকে আনবে না তো।

তাই যেদিন ঘর বাঁধার প্রস্তাব নিয়ে এল নিলয় সেদিন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল স্বরো।

—কি, কথা বলছ না কেন? আমাকে বিয়ে করতে আপত্তি আছে তোমার?

—ছি, ছি···

—তবে? একাই বকে যাচ্ছি, তুমি জবাব দিচ্ছ না।

—ভাবছি আমাকে বিয়ে করে তোমার জীবনটাও নষ্ট হবে।

—থাক নিনা, ও ভাবনাটা না ভাবলেও চলবে। আমরা জীবনে পেয়েছি কি যে হারাবার ভয়ে মরে থাকব? বরং এটুকুই তো পাওয়া, এ আমি ছাড়তে পারব না।

—আমাকে বিয়ে করলে লোকের ঘেন্নাই পাবে শুধু।

—কার ভালোবাসা পেয়েছি? কতটুকু পেয়েছি?

—তোমার ভবিষ্যত?

—ভবিষ্যত? ওটা আমাদের দু'জনের কারোই নেই। তোমার চাইতে পয়সা আমি বেশি রোজগার করি। কিন্তু এক্সট্রার ভবিষ্যত আর ভ্যামির ভবিষ্যতে তফাত নেই কোনো।

—কেন বলছ এসব? অরুণকুমার যতদিন আছে···

—হ্যাঁ, তোমারও চেহারা যতদিন আছে···বুঝছ না কেন আমাদের এমন কোনো সত্যিকারের জোর নেই যার ভরসায় মানুষ ভবিষ্যত তৈরি করবার কথা ভাবতে পারে। তাই ভবিষ্যতের ভাবনা আমি করি না। আজকের দিনটাই আমার কাছে বড়।

কাল যে সমস্যা আসবে তার চিন্তা কাল করব। তুমি তর্ক বাড়িও না নিনা, আমাদের বিয়ে হচ্ছে, এর কোনো নড়চড় হবে না।

—আমার বাবা-মা?

—তাঁরা আপত্তি করবেন?

—আপত্তি হবে কিনা জানি না, হলেও মানব না। কিন্তু…

—বুঝেছি। তুমি কত টাকা ওদের দিতে পার তা আমি জানি। ওদের মাসে মাসে একশো টাকা আমি দেব। আর, বিয়ের পর সিনেমার কাজ তোমাকে ছাড়তে হবে।

—আমিও ছাড়তেই চাই।

—লক্ষ্মী মেয়ে।

জগদীশদাকে বলতেই সে লাফিয়ে উঠল—'এতদিনে একটা কাজের মতো কাজ করছিস তোরা। দেখিয়ে দে মানুষকে…।' সমস্ত ব্যবস্থা জগদীশদাই করে দিল। রেজিস্ট্রার ডেকে তার বাড়িতেই বিয়ে হল। দু'তরফের কেউ এল না বিয়েতে। বেছে বেছে জনা দশেক কাছের মানুষকে শুধু নেমন্তন্ন করেছিল জগদীশদা। তদবির করে সরকারী ফ্ল্যাটের ব্যবস্থাও তারই দৌলতে। ঘর সাজিয়ে সংসার পেতে দিয়েছিল, হাতে ধরে সংসার করতে শিখিয়েছিল দু'জনকে। বাইরের অন্ধকার কুশ্রীতা পেছনে ফেলে প্রাণের আলোয় ঝলমলে ঘরে এসে দাঁড়াল স্বরো। শুধু স্মৃতি হিসেবে রয়ে গেল নিনা নামটা। পুরনো নামে ফিরে যাবার বাসনা নিলয়কে বলতে গিয়েও বলতে পারেনি নিনা, এ নামেই যে তাকে প্রথম ডেকেছিল নিলয়।…

খেলতে খেলতে মেঝেতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বাবুসোনা। খেয়াল হতে নিনা ওকে কোলে নিয়ে খাটে শুইয়ে দিল। অঘোরে ঘুমোচ্ছে ছেলে।

একমাথা কালো নরম চুল। এলোমেলো হয়ে এসে পড়েছে কপালের ওপর। নিনা আলতো আঙুলে চুলগুলো সরিয়ে দিল। তাকিয়ে রইল বাবুসোনার মুখের দিকে। নিলয় মনে হয় ছেলেবেলায় ঠিক এমনটিই ছিল দেখতে। অবিকল নিলয়ের মুখ। শিশু নিলয়। নিনার সুখের পূর্ণতা। প্রতিক্ষণে নিলয়কে কাছে পাবার বাসনাই বোধ হয় বাবুসোনা হয়ে এসেছে নিনার কোলে।

নিলয়, নিলয়! রূপকথার রাজপুত্রের মতোই সে নিনাকে অন্ধকারের প্রেতপুরী থেকে উদ্ধার করে স্বপ্নের বাস্তব জগতে নিয়ে এসেছে। পৃথিবীতে যে এত আনন্দ আছে, ছোট্ট ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে যে নীল আকাশের মুক্তির আনন্দ এনে দেয়া

যায়, সে সংবাদ নিলয় যদি তার জীবনে না আসত তাহলে কি কোনোদিনই জানা হত নিনার! কোনো খেদ নেই তার, নেই কোনো দুঃখ। জীবনের শুরু থেকে অনেকগুলো বছর সময়ের কাছে যে নির্মম বঞ্চনা পেয়েছে নিনা মাত্র চার বছরের অকৃপণ দানে সে ঋণের কিছু আর বাকি নেই, বরং জমা-খরচের খাতায় এখন যেন জমার দিকটাই ভারি। নিলয় জানে না নিজের ওপর আজ কি দারুণ আস্থা নিনার। সে জানে পৃথিবীতে মানুষ আছে, বিশ্বাসের ভূমি আছে, অন্ধকারের শেষ আছে, আলো আছে। নিত্যদিনের সমস্যাগুলোকে সে আর ভয় পায় না।

শুধু একটা মাত্র ভয় তার নিলয়কে নিয়ে। যে বিশ্বাস সে নিনাকে দিতে পেরেছে তা কিন্তু দিতে পারেনি নিজেকে। দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে নিলয় কি নিজেকে একা ভাবে? অভাব আছে, থাকবেও। গত কয়েকটা বছর বাদ দিলে নিনার জীবনের সবটাই চূড়ান্ত অভাবের ইতিহাস। তার তুলনায় নিলয় বরং সচ্ছলতার মুখ দেখেছে —যদিও যৎসামান্য। নিশ্চয়তাই বা কবে ছিল তাদের জীবনে? তবে কেন নিলয় এত অস্থির? বোধ হয় নিজের কাজটাকেই নিলয় মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। নিলয়ের মানসিক সংকট আঁচ করতে পারে নিনা। সন্তানের জন্ম দিয়েও তার পিতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হলে মানুষ যেমন হয়। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা চলে না, বোঝানো চলে না, ব্যথা তীব্র হলে নরম হাতের স্পর্শও আরাম না দিয়ে কষ্টই বাড়িয়ে দেয়। শুধু মনে মনে দুঃখ ভাগ করে নেয়া।

বাবুসোনার কপালে আস্তে ঠোঁট ছোঁয়াল নিনা।

কলিং বেলের টুংটাং।

দরজা খুলে অবাক নিনা। নিলয়ের মামাতো বোন পুন্যি, সঙ্গে নিলয়ের মা। পুন্যির হাতে ছোট স্যুটকেস।

--আরে পুন্যি, তুমি! মা, এ কি চেহারা হয়েছে আপনার! আসুন, ভেতরে আসুন।

নিলয়ের দিককার কোনো আত্মীয়স্বজনই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না। কারণ নিনার অজানা নয়। ব্যতিক্রম নিলয়ের মামাতো বোন পুণ্যলতা—পুন্যি। একমাত্র ও-ই মাঝে-মধ্যে আসে। ওর কাছ থেকেই নিলয় বাবা-মা'র খবর পায়।

পুন্যিই একবার কাউকে না জানিয়ে মাকে নিয়ে এসেছিল এখানে। নিলয়ের সংসার একবারটি নিজের চোখে দেখার গোপন ইচ্ছা মা পুন্যিকেই জানিয়েছিলেন। সে ইচ্ছা পুন্যি পূরণও করেছিল। ও যেমন হাসিখুশি তেমনি বেপরোয়া। কে কি

ভাবল না-ভাবল তার পরোয়া করে না। তবু আত্মীয়স্বজনরা ওর তোয়াজ করে। পুন্তি খোলাখুলি নিনাকে বলেছে—'জান বৌদি, আমিও ছোটজাতের ছেলেকে বিয়ে করেছি, বিয়ের আগে বরের আমার গুণের ঘাটতি ছিল না। দাদাভাই তোমাকে বিয়ে করে অচ্ছুৎ হয়ে গেল, আমি কিন্তু হলাম না। কেন জান? যেভাবেই হোক আমার বরের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। টাকা না থাকলে ভালো মন্দ হয়ে যায়, টাকা থাকলে মন্দকেও মন্দ বলতে নেই।' পুন্তি সম্পর্ক রাখে, ওকে ভালো লাগে নিনার। কিন্তু এ সময়ে পুন্তির সঙ্গে শাশুড়িকে দেখে ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছিল।

স্যুটকেসটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে পুন্তি বলল—পিসিমা, তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসে বসো। এই বৌদি···

নিনার হাত ধরে শোবার ঘরে নিয়ে গেল পুন্তি।

—ডাকাতটা কই? ও মা, ঘুমোচ্ছে! জাগাব বৌদি?

—সে তোমার ইচ্ছে। কাঁচা ঘুম ভাঙালে ভীষণ গোলমাল শুরু করবে। তোমাকেই সামলাতে হবে কিন্তু। নিনা হেসে বলল।

—তবে থাক।

—কি ব্যাপার? চাপা গলায় শুধোল নিনা।

—বড়দাকে তুমি দেখনি, ও যে কেমন মানুষ আমরা হাড়ে হাড়ে চিনি। তোমাদের বিয়ের পর থেকেই পিসিমা-পিসেমশায়কে চাপ দিচ্ছিল একজনকে অন্তত তোমাদের কাছে এসে থাকতে। ওর ধারণা দাদাভাই মোটা রোজগার করে। শুধু খিচখিচ করত। বৌদি দাদার এক কাঠি ওপরে।

—তুমি তো বলনি আমাদের।

—বলে তোমাদের কষ্ট বাড়াতে চাইনি। তোমাদের অবস্থা আন্দাজ করতে পারি। দাদাভাই হাতিঘোড়া রোজগার করে না নিশ্চয়ই। দু'তিন মাস ধরে পিসিমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। চিকিৎসা করাচ্ছে হোমিওপ্যাথি, তাও পাড়ার এক আনাড়ী ডাক্তারের কাছে। আজ বলতেই বড়দা আমার সঙ্গে চোটপাট শুরু করে দিল। আমিও একচোট শুনিয়ে দিয়ে পিসিমাকে নিয়ে চলে এলাম। ওখানে থাকলে পিসিমা বাঁচবে না। দাদাভাইকে বলো ভালো ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। দরকার হলে লজ্জা করো না যেন, আমাকে বলো, আমি টাকা দেব···

বাথরুমের দরজা খোলার শব্দে পুন্তি চুপ করে গেল।

মা এ ঘরে আসছিলেন। পুন্নি বলল—পিসিমা, তুমি ও ঘরে বসো। আমরা আসছি।

মা বুঝলেন ওদের আলোচনায় তাঁর থাকা উচিত নয়। একবার অসহায় চোখে তাকিয়ে বাইরের ঘরে ফিরে গেলেন।

নিনা ভাবছিল ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এ দায়িত্ব তাদের নিতেই হবে। মাকে নিলয় ফেলতে পারবে না। শুধু মা বলেই নয়, নিলয়ের দুর্দিনে একমাত্র মা-ই তাকে গোপন সহানুভূতির আশ্রয় দিয়েছিলেন, গয়নার সামান্য সঞ্চয় থেকে একটি ভারি বালা ওকে দিয়েছিলেন ট্রেনিংয়ের খরচ চালাবার জন্য। স্বামী বড়ছেলে আর বড়ছেলের বৌকে লুকিয়ে ছোটছেলের সংসার দেখে গিয়েছিলেন। স্বামীর ঘর করতে গিয়ে মেয়েরা যদি শ্বশুর-শাশুড়ির স্বীকৃতি না পায় তাহলে সে বড় বিষম জ্বালা। সে জ্বালা শাশুড়ি কিছুটা দূর করে দিয়েছিলেন একদিন নিনার ঘরে এসে। সংস্কারের ওপরে পুত্রস্নেহকে জায়গা দিতে পেরেছিলেন। .নিনাকে আশীর্বাদ করেছিলেন সোনা-বাঁধানো নোয়া দিয়ে। এ প্রাপ্তি কম নয় নিনার কাছে।

—কি ভাবছ এত? পুন্যি জিজ্ঞেস করল।

ম্লান হেসে নিনা বলল—তোমার কাছে ভাই লুকনোর কিছু নেই। তোমার দাদা-ভাইয়ের কাজকর্ম নেই। হাত প্রায় খালি। তবু মাকে আমরা দেখব, ওঁর অযত্ন হবে না। ভাত মনে হচ্ছে ফুটে গেছে, তুমি বসো, আমি আসছি···

পুন্যি গিয়ে পিসিমার পাশে বসে বলল—তুমি অমন কাঠ হয়ে আছ কেন পিসিমা? এ তোমার ছেলের বাড়ি···

—যেখানে ছিলাম সেও ছেলের বাড়িই পুন্যি।

—হ্যাঁ, তোমাদের ভালো ছেলের বাড়ি। দেখে-শুনে জাত মিলিয়ে ভালো বৌ এনেছ। এ তোমাদের খারাপ ছেলের বাড়ি। এ বৌয়ের নামেও কত নিন্দেমন্দ। কিন্তু দেখো মন্দ ছেলে আর ছেলের বৌ-ই তোমায় মাথায় করে রাখবে।

পুন্যির পিঠে হাত রেখে মা হাসলেন।

—হাসছ যে বড়? পুন্যি গলায় নকল ঝাঁজ এনে বলল।

—তোর জ্বালা আমি বুঝি পুন্যি। কিন্তু আমার ওপর রাগ করা মিথ্যে। তোর বিয়েতে বল্, নিলয়ের বিয়েতে বল্, আমার মনে খটকা থাকলেও আপত্তি করিনি। ভেবেছি, আমরা পুরনো মানুষ, নতুন কিছু দেখলে মেনে নিতে পারি না বলেই যে সেটা ভুল তা কি জোর দিয়ে বলা উচিত। চুপ করে থেকেছি। পরে বুঝলাম তোরা

ভুল করিসনি। কিন্তু যারা দেখেও শিখবে না, শিখলে যেন তাদের হার হয়ে যাবে, তাদের কে বোঝাবে বল্‌?

—মন থেকে বলছ না ঠেকে বলছ? পুনি্য হেসে বলল।

—শুধু ঠেকে বলছি না, ঠেকে শিখে বলছি। মা'র শুকনো মুখে নরম হাসি।

—ওঃ, বুড়ি তর্কে ওস্তাদ।

নিনা এসে শাশুড়িকে প্রণাম করল। অসময়ে আচমকা শাশুড়িকে দেখে প্রথমে প্রণাম করার কথা ওর মনেই আসেনি।

মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে আশীর্বাদ করলেন মা।

—মা, নিনা বলল, আমি একটু বেরুব। বাবার কাছে যাব। এক্ষুনি না বেরুলে দেরি হয়ে যাবে ফিরতে। আপনার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে গেলাম, খেয়ে নেবেন।

—তুমি খাবে না বৌমা?

—আমি ওখানে খেয়ে নেব।

—নিলয় ফিরবে কখন?

—ও খেয়ে বেরিয়েছে। ফিরতে দেরি হতে পারে। আপনি বিশ্রাম করুন। …মা, নিনা কোমল গলায় বলল, আপনি আমাদের কাছেই থাকবেন…কোনো চিন্তা করবেন না…

মায়ের চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল চিকচিক করে উঠল। নিনা সেটা লক্ষ্য করল।

৬

স্টুডিও পাড়া। বাংলা সিনেমার রমরমার দিনে পাঁচ-ছ'টা স্টুডিও গড়ে উঠেছিল এখানে। উঁচু উঁচু গুদামঘরের মতো বাড়ি। টিনের চাল। বয়সের ছাপ এখন তাদের সর্বাঙ্গে।

নতুন স্টুডিও আর তৈরি হচ্ছে না। প্রতিদিন সব স্টুডিওর ফ্লোরে কাজই থাকে না, নতুন স্টুডিও তৈরি করতে আসবে কে।

ব্যবসার হাল ভালো না। হিন্দি ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হালে পানি পাচ্ছে না বাংলা ছবি। বাংলা ছবির মান বাড়ছে, বাণিজ্য কমছে। হিন্দি ছবির প্রযোজকদের টাকা অজস্র, বাণিজ্যের উপকরণ তারা ঠেসে দিচ্ছে ছবিতে। বাঙালী

প্রযোজক-পরিচালকের পকেটে নেই অত টাকা, মগজে নেই অত বাণিজ্য। ফলে হিন্দি ছবির মৌতাতে তৈরি লাখে-লাখ নতুন দর্শকের চাহিদামতো ছবি তারা তৈরি করতে পারছে না।

তবু টিকে থাকার লড়াই চলছে, চলবে। সে লড়াইতে অরুণকুমার মস্ত সহায়। সে থাকলে ছবি অন্তত পড়ে পড়ে মার খাওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায়। নিজের একটা আশ্চর্য ইমেজ সে তৈরি করে নিতে পেরেছে। হিন্দি ছবির একরোখা বাঙালী ভক্তও অরুণকুমারের ছবি হলে দেখতে যায়। অবিশ্বাস্য টাকা নিয়ে না নামলে হিন্দি ছবির মতো বেআক্কেলে তাণ্ডবের ছবি বানানো সম্ভব নয়। বাংলা ছবির ছোট্ট বাজার থেকে সে টাকা তুলে আনাও অসম্ভব। বাঙালী মনের করুণ নরম বাষ্পাধিকার জায়গাগুলোতে পালক বোলানোর মতো গল্প সব শেষ হয়ে গেছে, অথবা সুকুমার বৃত্তির আকালের দিনে শুধু নরমে আর কাজ হয় না, নরমে-গরমে স্বাদটা বেশ চড়া হওয়া চাই। কাজেই এই মুহূর্তে ইণ্ডাস্ট্রির একমাত্র ভরসা অরুণকুমার।

সে নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান। একটা ইণ্ডাস্ট্রি যার কাঁধে ভর দিয়ে বেঁচে আছে, কয়েক হাজার মানুষের দু'বেলা না হোক একবেলার অন্তত অন্নসংস্থান হচ্ছে, সে মানুষটা নিঃসন্দেহে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। তার বেঁচে থাকা দরকার। হয়তো একদিন দুঃসময় কেটে যাবে, ইণ্ডাস্ট্রি রাস্তা খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু যতদিন দু'পায়ে দৌড়নোর মতো আশ্চর্য ব্যাপারটা না ঘটছে ততদিন এক পায়ে খুঁড়িয়ে চলার জন্যও অরুণকুমার নামক ক্রাচটিকে দরকার। একেবারে দু'পা ভেঙে মাটি নিলে আর কি উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ পাওয়া যাবে?

অনুরাধা স্টুডিওর ইট বের করা দেয়াল বরাবর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিলয় এইসব ভাবছিল এবং একটা যুক্তিহীন অপরাধবোধ তাকে বিষণ্ণ করে ফেলছিল।

অরুণকুমার সুস্থ থাকলে আজ অনুরাধা স্টুডিওতেই নিলয়কে তার সঙ্গে কাজ করতে হত। সে কাজে আনন্দ না থাক টাকা ছিল। এবং টাকার তার সমূহ প্রয়োজন।

গেটে দারোয়ান নমস্কার জানাল—নমস্তে বাবুজী।

অন্যমনস্কভাবে 'নমস্তে' বলে এগিয়ে গেল নিলয়। অন্যদিন সে দারোয়ানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দু'চার মিনিট গল্প করে। মানুষটার বয়সের গাছ-পাথর নেই। অনুরাধা স্টুডিওর সঙ্গে আ-শৈশব সম্পর্ক। বয়সের হিসেব ঠিক থাকে না, কিন্তু স্মৃতির ভাঁড়ারে মণি-মাণিক্যের সঞ্চয়ে হিসেবের ভুল নেই। পুরনো দিনের কত গল্পই না সে

অনর্গল বলে যেতে পারে। নিলয় ওর সঙ্গে গল্প করে আনন্দ পায়। কিন্তু আজ অফুরন্ত অবসর থাকা সত্ত্বেও দাঁড়াল না।

এক নম্বর ফ্লোরে সেট সাজানো চলছে। এখানেই আজ অরুণকুমারের সঙ্গে নিলয়ের শুটিং হবার ডেট ছিল। অরুণকুমার না থাকায় অন্য ছবির কাজ হচ্ছে।

কর্তারা বা আর্টিস্টরা কেউ এখনো আসেনি। কয়েকজন মজুর আর ইলেকট্রিক মিস্তিরি কাজ করছে। তদারকি করছে আর্ট ডাইরেকটরের একজন সহকারী—অনুতোষ দত্ত। নিলয়ের চেনা অনেকদিনের—বন্ধুর মতোই।

খুব হাঁকডাক করছিল অনুতোষ—ধেত্তেরি, এটা কি করলি রে? জানলাটা তোকে ওখানে লাগাতে বলেছিলাম? খোল্, খোল্, খোল্ শিগগির। এক ঘণ্টা পরে শুটিং, এখনো···এই হজমি, তুই শালা ইলেকট্রিসিয়ান? মোমবাতি বিক্রি করগে যা। ওখানে ওয়াললাম্প লাগালে শেড পড়বে না? ডান দিকের দেয়ালে লাগা। আরে, দু'নম্বর!

নিলয়কে দেখে এগিয়ে এল অনুতোষ।

—কি খবর? তোমার পাত্তাই মেলে না··।

—কাজ-টাজ নেই···তাই ··মানে···। থেমে থেমে বলল নিলয়।

—ঠিক। কায়া না থাকলে ছায়া আসবে কোত্থেকে। বলে উঁচুদরের কথা বলার আত্মপ্রসাদে হাসল অনুতোষ।

বোকাটে হাসিতে নীরব উত্তর দিল নিলয়।

—অরুণকুমারের নিউজ কি? অনুতোষ বলল।

—খবরের কাগজেই যা দেখছি। তুমি জান?

—সে কি! কায়ার খবর ছায়া জানে না? অবশ্যি বিছানায় চিৎপাত হয়ে থাকলে ছায়া পড়ে না। অনুতোষ উঁচুদরের সংলাপ বলার হাসিটার পুনরভিনয় করল।

অভিনয়ের জগতে কাজ করতে করতে ও বোধ হয় নিজেকেও অভিনেতা ভাবতে শুরু করেছে। এখানকার অনেক কৃত্রিমতার মধ্যে এও একটা। নিলয় লক্ষ্য করেছে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পর্দায় যেমন সহজ স্বাভাবিক—মানুষের মতো—পর্দার বাইরে তা নয়। বাস্তব জীবনে যেন ওরা ওভার বা আণ্ডার-অ্যাকটিং করে থাকে। নকল সাজানো মানুষের মতো মনে হয় ওদের। এটা হয়তো নিলয়ের দেখার ভুল, বোঝার ভুল। কিংবা অভিনয় জীবিকা হলেও অভিনেতা হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়

বলেই গোপন ঈর্ষার চোখ ওদের বাঁকাচোরা কার্টুনের মতো দেখে। নিলয় ভীষণ বিব্রত বোধ করল হঠাৎ।

মন থেকে চিন্তাটা সরিয়ে ফেলার জন্য ও অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইল—কোন্ ছবির শুটিং হচ্ছে ?

—নতুন প্রোডিউসার, নতুন ডাইরেকটর। সুরের বিলাপ। সুলক্ষণা-বিক্রমজিৎ। ওদের কয়েকটা ইনটিমেট শট্ টেক করা হবে আজ।

—কেটে পড়তে হয় তাহলে।

—আরে, দেরি আছে।···এই, এই মোনা, আরেকটু সরা, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এইবার বেঁধে ফেল্। শালা বুদ্ধু, তোর মাথায় কি কোনোদিন বুদ্ধি হবে না রে মোনা···

অসুতোষের ব্যস্ততার সুযোগে 'আজ তবে চলি' বলে ফ্লোর থেকে বেরিয়ে এল নিলয়।

সুলক্ষণা অভিনয়ে যত না, ঠাটবাটে তার দশগুণ। অরুণকুমারের বিছানায় ভাগ বসানোর অহংকারে চাল বোল কায়দাগুলো ষোল আনা রপ্ত করেছে। শুটিংয়ের সময় দরকারী লোকজন ছাড়া অরুণকুমার কাউকে থাকতে দেয় না। কর্তারাও সন্ত্রস্ত থাকে। মেজাজ একবার বিগড়োলেই হল। মুড নষ্ট হয়ে গেছে, অতএব শুটিং হবে না। তাতে প্রোডিউসারের দু পাঁচ হাজার গেল তো গেল। সুলক্ষণাও আজকাল এসব উৎপাত চালায়। অথচ অরুণকুমারের হিলটন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠার আগে ও কিন্তু এ রকম ছিল না।

সে যা-ই হোক, সেট থেকে নিলয়ের সরে আসার কারণ এটা নয়। সুলক্ষণার সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে যাওয়াও সে চাইছিল না। মানুষকে আঘাত করা সুলক্ষণার বিলাস বা রাগী নায়িকার ইমেজ বাড়ানোর কায়দা। অবশ্য মাটি শক্ত হলে ম্যানিকিওর-করা নেলপালিশ-রাঙানো নখগুলো ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি কখনোই নেয় না। কিন্তু নিলয় শক্ত মাটি নয়।

স্টুডিও-চত্বরের একপাশে দেয়াল ঘেঁষে ছোট টিনের চালা। নিচে কয়েকখানা বেঞ্চি টেবিল। রামদা'র চায়ের দোকান। বড়-মাঝারি আর্টিস্ট আর কর্তাদের চায়ের ব্যবস্থা ভেতরে। ভালো ব্যবস্থা—খরচ প্রোডাকশনের। ছুটকো আর্টিস্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট আর মজুরদের বরাদ্দ টিফিনের বাইরে চা-টা খেতে হলে রামদা'র দোকান। গ্লোসে শস্তা চা, বয়াম থেকে দিশি বিস্কুট। রামদা'র বিক্রি ভালো শুটিংয়ের আগে-পরে ফাঁকে ফাঁকে বেশ খদ্দের হয়, অবশ্য শুটিং থাকলে তবেই। নিলয় রামদা'র খদ্দের।

ও গিয়ে বসতেই রামদা উনুনের পাশ থেকে বলে উঠল—কি ওস্তাদ, দেখি না কেন ?

—এই···এই আর কি ··। কি উত্তর দেবে নিলয় ভেবে পেল না।

দোকানে বসা দু'জন মানুষের মুখের ওপর দিয়ে নিলয়ের চোখ ঘুরে এল তিনজন তার চেনা। যজ্ঞেশ্বর—ক্যামেরাম্যান সতোনবাবুর দু'নম্বর অ্যাসিস্ট্যান্ট। অনিলের কাজ জোগাড়ের—সকলের ব্যাগার খাটা। ভোলাদা করে এক্সট্রা সাপ্লাই। ওরা পাশাপাশি বসেছিল। ওদের মুখের আড়ষ্ট হাসি নিলয়কেও আড়ষ্ট করে রাখল।

রামদা জিজ্ঞেস করল—চা দেব ওস্তাদ ?

নিলয়কে ওস্তাদ ডাকে রামদা। প্রথম প্রথম রামদা'র এই সম্ভাষণে নিলয়ের আপত্তি ছিল। কিন্তু রামদা'র যুক্তি প্রবল।—'তুমিই বাবা ঠিক ঠিক ওস্তাদ। ভুরু নাচিয়ে, ঠোট বেঁকিয়ে, ন্যাকা-ন্যাকা ডাইলগ চেষ্টা করলে অনেকেই বলতে পারে। কিন্তু তোমার মতো ···ওরে বাবা !—'

রামদা'র স্বীকৃতির ভাষা যেমনই হোক আন্তরিকতা বুঝতে নিলয়ের অসুবিধা হয়নি। আর আপত্তিও করেনি। বরং রামদা'র মুখে ওস্তাদ ডাকটা শুনতে এখন ভালোই লাগে।

—কি যজ্ঞেশ্বর, চা চলবে নাকি ? নিলয় জড়তা কাটিয়ে বলতে চেষ্টা করল।

—আমরা খেয়েছি।

—তাতে কি হয়েছে, আরেক রাউণ্ড হোক না। ভোলাদা বলল।

—চারটে চা, চারখানা নোনতা বিস্কুট। নিলয় বলল।

—নিলয়দা, এখানে এসে বসুন না। অনিল বলল।

নিলয় উঠে গিয়ে ওদের মুখোমুখি বসল বেঞ্চে। এদের সঙ্গে নিলয়ের সম্পর্ক সহজ অন্তরঙ্গ। গোড়ার দিকে নিজের অবস্থান সম্পর্কে নিলয়ের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। সে অরুণকুমারের ডামি, চাড্ডিখানি ব্যাপার—এইরকম ভাব বোধ হয় ছিল মনে। আস্তে আস্তে বুঝেছিল আসলে আর নকলে ফারাক হাজার মাইল। সাধারণ আর্টিস্টরাও তাকে পাত্তা দিত না। তখন নিলয় তার কাছের মানুষদের খুঁজে পেয়েছিল এদেরই মধ্যে। এরা নেপথ্যের নায়ক, সেও নেপথ্যেরই একজন। এদের কাজ যত ছোটই হোক তবু স্বাতন্ত্র্যের অহংকার আছে। নিলয়ের তাও নেই। নিজের গোপন উপলব্ধি ওদের কাছে কখনো প্রকাশ করেনি। ওরা কিন্তু নিলয়কে মনে করে ওদের কয়েক ধাপ ওপরের লোক। তাই নিলয়ের অন্তরঙ্গতাকে খাতির করে যথেষ্ট।

কিন্তু আজ যেন নিলয়কে ওরা তেমন ঘনিষ্ঠ করে নিতে পারছিল না। বিশেষত যজ্ঞেশ্বর বড় বেশি গম্ভীর।

চা-বিস্কুট দিয়ে গেল রামদা।

নীরবতা অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে।

—খবর আপনার কাছে। যজ্ঞেশ্বরের স্বর যেন সামান্য তেতো।

—আমার কাছে?

—অরুণকুমারের খবর আর কি। অখিল যজ্ঞেশ্বরের কথার মর্মার্থ বুঝিয়ে দিল।

নিলয় ম্লান হাসল—অত ওপরের খবর কি আমার কাছে থাকে ভাই?

—যত্তো ফালতু ঝামেলা। চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে ঠকাস্ করে গেলাস নামিয়ে রাখল ভোলাদা।

যজ্ঞেশ্বর থমথমে মুখ করে বলল—তোমার কাছে ফালতু হতে পারে···

নিলয়ের মনে হল সে আসার আগে এ প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা চলছিল। সে দোকানে ঢোকার পর ওরা আলোচনায় দাঁড়ি টেনে দিয়েছে। তার মানে এ আলোচনার মধ্যে তাকে রাখা চলে না। অতএব তারও প্রশ্ন করা উচিত নয়। নিলয়ের অস্বস্তি বাড়ছিল।

—ফালতু ছাড়া কি? আমার গুরু কি বলত জানিস, নেড়ি কুত্তা হয়ে যখন জন্মেছিস স্বভাবটা নেড়ি কুত্তার মতো করে নে, জ্বালা থাকবে না। ভালো পেলে ভালো খাবি, না পেলে নোংরা ঘেঁটে খাবি। তোরা হচ্ছিস না ঘরকা না ঘাটকা। মনে ইচ্ছে ভদ্রলোকের মতো কাজকর্ম করে খাওয়া, কিন্তু কাজের ঘোড়ার ডিম ঠিক আছে? অরুণকুমার যেন ভগবানের পরমাই নিয়ে জন্মেছে, মরবে না, শরীর টসকাবে না কোনোদিন। একটা লোকের ভরসায় যদি এত লোকের বাঁচা-মরা, তবে শালা মরাই ভালো। অরুণকুমার বসে পড়ল তো হাজার লোকের মাথায় হাত। কোনো মানে হয়? এর নাম ব্যবসা? তোরা আবার গালভরা নাম দিয়েছিস সিনেমা ইণ্ডাস্ট্রি। আমি শালা মাগী সাপ্লাই করি। সিনেমায় পেলে সিনেমায় করব, না হলে অন্য খদ্দের ধরব। আরো লাইন আছে, সেসব তোদের শুনে কাজ নেই। আর তোরা? ভদ্রভাবে বাঁচতে চাস? ভদ্রভাবে ক'জন বেঁচে আছিস রে?

প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে দিয়ে ভোলাদা তেরটে কাঠ-কাঠ মুখে পোড়-খাওয়া হাসি মাখিয়ে তাকিয়ে রইল যজ্ঞেশ্বরের দিকে।

যজ্ঞেশ্বরের মুখ কালো, সে একটু সময় নিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলল—তুমি যেমন থাক সেরকমই বলছ।

—আলবৎ, ভোলাদা বলল, আমি আমার মতনই বলব। তোদের মতন বসে বসে হা-হুতাশ করব না, কার জন্যে কি হল তা নিয়ে বাজে কপচাতেও যাব না। আমার খাওয়ার ভাবনা নেই, তোদের আছে। কিন্তু কোনোদিন কি ভেবে দেখেছিস তোদের খাওয়ার ভাবনাটা বাজে খোয়াব?

অনিল মিনমিন করে বলল—বারে, আমরা কি করব? ভাত জুটবে কোথেকে?

—আমি তার কি জানি। গোটা দেশের যা আদত, এ লাইনেরও সেই আদত। ওপরের লোকেরা মজা লুটে নিচ্ছে, নিচের লোকদের বেলায় লবডঙ্কা। এটা আমার খুব ভালো রকম বোঝা হয়ে গেছে বলেই আমি কিছুরই তোয়াক্কা করি না। এখনো বলছি যদি বাঁচতে চাস নেড়ি কুত্তা বনে যাবার ট্রেনিং নে।

যজ্ঞেশ্বর অল্পস্বল্প লেখাপড়া করেছে, শোনা যায় বি. এস. সি পর্যন্ত নাকি পড়েছিল, সময় পেলেই বইপত্র পড়ে।

সে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে বলল—তোমাদের মতো লোক আছে বলেই এ দেশের কিছু হবে না। তোমার আসল বক্তব্য হচ্ছে ভাগ্যকে মেনে নাও। যা হচ্ছে তা তেমনই থাক, পালটাবার চেষ্টা করো না।

—পালটাবার চেষ্টা তোরা করছিস? কে করছে? পালটানো চেহারাটা কেমন হবে কেউ জানে? তুই জানিস? আমি জানি না, তাই বেঁচে না থেকে যখন উপায় নেই জীবনটাকে বিলকুল সোজা করে নিয়েছি। ভোলাদা রসিয়ে রসিয়ে বলল।

নীরবে শুনছিল নিলয়। বুঝল জীবিকার ওপর মোক্ষম ঘা এসে পড়ায় ওরা চিন্তিত হতাশ এবং ক্রুদ্ধ। ওদের তর্কবিতর্কে পথের হদিস না থাকার জ্বালা, অক্ষমতার দাহ। মানুষ অনেকসময় তার যন্ত্রণার সঠিক কারণ খুঁজে না পেয়ে কাল্পনিক শত্রুর ওপরই আক্রোশ মেটায়। নিলয় কি যজ্ঞেশ্বর-অনিলের সেই কাল্পনিক শত্রু? যজ্ঞেশ্বরের হাবভাবে যেন এ রকম একটা আঁচ ছিল।

—সত্যিই আমাদের নতুন করে ভাবনাচিন্তা করা দরকার, নিলয় আস্তে আস্তে বলতে লাগল, বাংলা ছবির বাজার যা হচ্ছে…। আগে যেসব হলে শুধু বাংলা ছবি দেখানো হত এখন সেখানেও চলছে হিন্দি ছবি। ছবি তৈরি হচ্ছে আগের চেয়ে অনেক কম। যা-ও হচ্ছে বেশির ভাগই রিলিজ পাচ্ছে না, রিলিজ পেলেও বিক্রি পাচ্ছে না। প্রোডিউসাররা ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। এর কোনো বিহিত হবে না?

—কি বিহিত হবে? কে বিহিত করবে? সরকার? ভোলাদা বলল।

—সরকার সাধ্যমতো চেষ্টা করছে, যজ্ঞেশ্বর বলল, অনেক ভালো ছবি সরকারের টাকায়ই তৈরি হয়েছে। আর কি করবে সরকার? সরকার কোটি কোটি টাকার বাজেট নিয়ে বোম্বাই ছবি তৈরি করতে নামতে পারে না। অল্প টাকায় ভালো ছবি তৈরির দিকেই সরকারের নজর। সেটাই উচিত।

—সরকার যা করছে তার বেশি সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়, নিলয় যজ্ঞেশ্বরকে সমর্থন জানাল, কিন্তু সিনেমা শিল্পের এই দশা চললে আমরা দাঁড়াব কোথায়?

—আমরা শুয়েই আছি। ভোলাদা মন্তব্য করল।

—তোমাদের 'অ্যাসোসিয়েশন এ নিয়ে ভাবছে না? নিলয় যজ্ঞেশ্বরকে জিজ্ঞেস করল।

—অ্যাসোসিয়েশন আমাদের দাবিদাওয়া নিয়ে লড়তে পারে। এর বেশি কি ক্ষমতা আছে তার? আসল জিনিস হচ্ছে অল্প বাজেটের এমন ছবি তৈরি করতে হবে যা বাজারে ধরবে। হিন্দি ছবির লাইনে ছবি করার মানে হয় না। অত টাকা নিয়ে যে নামবে সে বোম্বে গিয়ে হিন্দি ছবিই বানাবে। আমি বোম্বাই-মার্কা ছবি এখানে বানানোর বিরুদ্ধে। আবার আর্ট-ফিল্মের নামে এমন ছবি করেও লাভ নেই যা এক হপ্তাও চলে না। আমার মনে হয় বুঝে করতে পারলে বাঙালীর মন-মেজাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি-করা অল্প টাকার ছবিও ভালো পয়সা দেবে। কিন্তু কেউ এ নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবছে বলে মনে হয় না। একদল হিন্দি ছবির নকল করতে গিয়ে মার খাচ্ছে, আরেক দল এমন আর্ট-ফিল্ম তৈরি করছে যা বাজারে অচল। তাই ভরসা অরুণকুমার, ঐ একটা লোকের নাম ভাঙিয়ে যা হয়···আমাদের অন্নদাতা এখন প্রযোজকরা নয়, অরুণকুমার ··

যজ্ঞেশ্বরের বক্তব্যে নিলয়ের ভাবনার অবিকল প্রতিধ্বনি। মানুষের চাহিদার দুটো দিক আছে। একটা দিক ধরে নিয়ে হিন্দি ছবি দেশ জুড়ে চুড়ান্ত ব্যবসা চালাচ্ছে। অন্যদিকটা ঠিকভাবে ধরতে পারলে বাংলা ছবির পক্ষেও যে ভালো ব্যবসা করা সম্ভব তার প্রমাণ মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে। তবে কেন সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হচ্ছে না? অথবা কাজে লাগানোর মতো যোগ্য লোকের অভাব?

যজ্ঞেশ্বর আবার বলল—অরুণকুমার নার্সিংহোমে যাবার পর থেকে বারো আনা কাজ বন্ধ। প্রোডিউসাররা যে যে ছবিতে অরুণকুমার আছে সেগুলোর কাজ বন্ধ

করে দিয়েছে। এমন কি যেসব সিনে অরুণকুমার নেই সেসব সিনও তুলছে না। রিস্ক নিতে কেউ রাজী নয়। এই তো অবস্থা। এদিকে আমাদের হাঁড়ি চড়ছে না।

—এমন কৌতকা চালালেন নিলয়দা, বোকার মতো হঠাৎ বলে ফেলল অনিল, অরুণকুমার কাত, আমরাও কাত।

খেঁকিয়ে উঠল ভোলাদা—বুদ্ধুর মতো কথা বলিস না। নিলয়বাবু যেন ইচ্ছে করে অরুণকুমারকে চোট দিয়েছে।

—বিশ্বাস করুন ভোলাদা, আমার ঘুষি ওর পেটে লাগেওনি। মনে হয় টেবিলের কোণায়-টোনায়···। নিলয়ের গলায় ক্লান্তি।

—লাগলেই বা। ভোলাদা বলল।

—যাকগে, ছাড়ান দিন, ও নিয়ে গবেষণা করে কি হবে। যা হবার হয়ে গেছে. যজ্ঞেশ্বর অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের ওপর যবনিকা টানতে চাইল।

কিন্তু ওর গলার অনুচ্চারিত অবিশ্বাস ও অভিযোগ নিলয়ের কান এড়াল না।

খুব আস্তে আস্তে, যেন কৈফিয়ত দেবার সুরে সে বলল—তোমরা তবু সিকি হলেও কাজ পাচ্ছ। আমার অবস্থাটা ভেবেছ? আমার এক পয়সারও কাজ নেই।

—আপনার কি, আপনি বোম্বে চলে যাবেন, ওখানে ফাইটিং ছবিতে অ্যাকটিং করবেন। অনিল বলল।

—হ্যাঁ, জলের মতো সোজা, ভোলাদা বলল, তুইও ফিলিমের অনেক কাজ জানিস, চলে যা না বোম্বে। দেখি কেমন কাজ জোগাড় করতে পারিস।

—আমরা টেকনিসিয়ান আমাদের কে পুঁছবে। অনিল সাফাই গাইল।

—আর আমি? আমি কি? হঠাৎ চাপা তীব্র স্বরে নিলয় বলল।

নিলয়ের আকস্মিক ভাবান্তরে সবাই থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে নিলয় উঠে দাঁড়াল— চলি তাহলে। কত হল রামদা?

—তিন টাকা ওস্তাদ। উনুনের পাশ থেকে চটপট উত্তর এল রামদার।

পয়সা দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল নিলয়।

অদ্ভুত। যেন ফেল-করা বাচ্চা ছেলেদের বানানো অজুহাতের মতো। নিলয়ের লেখাপড়া বেশি নয়। কিন্তু পৃথিবীর অন্যদেশে এমন হয় বলে তার জানা নেই।

একটা লোকের দয়ায় কয়েক হাজার লোক ছোট-বড়-মাঝারি উঞ্ছবৃত্তি করে বেঁচে আছে। এর নাম শিল্প? কোথাও দশটা ছবি তৈরি হলে তার আটটার নায়ক যদি হয় একই লোক তবে সেটা আর যা-ই হোক ইণ্ডাস্ট্রি নয়। ছবির নায়ক কারখানার ম্যানেজার নয় যে জায়গা খালি হলে হাজারখানা নতুন দরখাস্ত পড়বে। একজন নায়ককে দিয়ে ছবি শুরু করে আরেকজনকে দিয়ে শেষ করানো যায় না। তাহলে বেশির ভাগ ছবিতে একই লোককে হিরো করার লটারি খেলা কেন? লোকটা রক্তমাংসের মানুষ, অসুস্থ হতে পারে, মরে যেতে পারে, তখন যে সবশুদ্ধ ডোববার পালা।

ইণ্ডাস্ট্রি যারা চালায় তারা ভাবে না। নাকি ভাবতে যারা পারে সে মানুষগুলো এ কাজে নেই? কর্তাদের ভড়ং অশেষ, এমন ভাব দেখায় যেন মানুষ আর দুনিয়ার আদ্যন্ত ওদের নখের ডগায়। কথায় কথায় ফেলিনি, গদার, নিউ-ওয়েভ, কমার্শিয়ালিজম, মন্তাজ, থার্ড সিনেমা, বুদ্ধ দর্শকের জন্য করতে বাধ্য হচ্ছি, আরেঠারে দারুণ চালাক-চালাক শব্দ, ইনটেলেকচুয়াল ভঙ্গিতে কাঁচা খিস্তি। পুরোটা মিলিয়ে অশ্বডিম্ব। তোমাদের ক'জনের না হয় শালা বাপ-ঠাকুর্দার রেখে যাওয়া টাকার চুলকুনি, কিংবা বড়লোককে টুপি পরিয়ে টাকা এনেছ। বেশ, তোমরা আনছ বলে তবু গরিব-গুবরোর আধপেটা-সিকিপেটার সংস্থান হচ্ছে। কিন্তু সমস্ত জিনিসটা কি ঢেলে সাজানো যেত না? দর্শককে বুঝতে হবে, আর্ট বুঝতে হবে, ব্যবসাও বুঝতে হবে। এজন্যে যা করা দরকার তোমরা করছ না কেন? কেউ অন্যের গল্প লিখে দিতে পারে না, কেউ অন্যের পরিচালনা করে দিতে পারে না, একজনের অভিনয়ও হুবহু অন্যকে দিয়ে হয় না। কিন্তু সমস্যার গোড়াটা সকলে মিলে পরিষ্কার বুঝে নিলে এত ভয় থাকত না। লাইন দিয়ে অরুণকুমারের পায়ে গড়াগড়ি দেবার দরকার হত না। ব্যাপারটা সত্যিকারের ইণ্ডাস্ট্রির চেহারা পেত।…কিন্তু সেক্ষেত্রেও নিলয়ের অবস্থানের হেরফের হত কি?

গেটের কাছাকাছি গিয়ে সে আবার ফিরে এল। হঠাৎ একটা মতলব এসেছে মাথায়।

এডিটর অধীর ব্যাণ্ডো ল্যাবোরেটরিতে ছিল। অধীর ব্যাণ্ডো দ্যা গ্রেট। প্রচণ্ড মোটা, প্রচণ্ড খাটিয়ে, প্রচণ্ড মাতাল এবং অল্পবিস্তর স্ত্রীলোকে আসক্ত। মদ পেটে

থাকলে তার মেজাজ দিলদরিয়া এবং ও বস্তু সর্বদাই তার পেটে থাকে বলে মোটামুটি সর্বদাই তাকে খোশমেজাজে দেখা যায়।

ল্যাবোরেটরির দারোয়ানকে নিলয় বলল—ব্যাঙোদাকে বল আমি দেখা করতে চাই।

দারোয়ান ভেতর থেকে ঘুরে এসে বলল—যান, ব্যাঙো সাহেব এডিটিং রুমে আছেন।

মস্ত টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাঙো কাজ করছিল। টেবিলের ওপর ছড়ানো একগাদা ফিল্মের টুকরো, কাঁচি, রিল, আরো নানান সরঞ্জাম। খানিকটা ফিল্ম হাতে নিয়ে ব্যাঙো আলোর সামনে ধরে দেখছিল একমনে। মোটা বেল্ট দিয়ে কুঁচকির কাছে আটকানো ট্রাউজারের ওপরে বিশাল ভুঁড়ি নিশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দের সঙ্গে ইঞ্চি তিনেক ওঠানামা করছিল। চিবুকে তিনটে ভাঁজ। ফর্সা মুখে ফোলা গালের মাংস ঝুলে পড়েছে। কানের ওপরে ঘাড় বরাবর আধ ইঞ্চি পাট রঙের চুলের বর্ডার ছাড়া মাথায় একটিও চুল নেই। চকচকে টাকের ওপরে চিকচিক করছে ঘামের ফোঁটা। ব্যাঙো দ্যা গ্রেট গভীর মনোযোগের সঙ্গে ফিল্মের টুকরো দেখছিল।

নিলয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সসম্ভ্রম দূরত্বে।

দেখা শেষ হতে ব্যাঙো ফিল্মের টুকরোটা পাশে দাঁড়ানো অ্যাসিস্ট্যান্টের হাতে দিয়ে বলল—পাঁচ নম্বর শটের শেষে জুড়ে দাও। ওখানে মিক্স-আপ এফেক্ট আছে মনে থাকে যেন। আরে নিলয়, এসো, এসো। বসো।

ব্যাঙো বসল তার হাতলওলা রিভলভিং চেয়ারে। পাশেই একটা সাধারণ চেয়ারে বসল নিলয়। ভুরভুর করছে মদের গন্ধ। যাক, নিলয় আশ্বস্ত হল। ব্যাঙোর পেটে বস্তু ভালোমতোই আছে, অতএব মেজাজও নিশ্চয়ই ভালো। এখন তার কাছে যা ইচ্ছে বলা যায় নির্ভয়ে। খানদানের দেমাক, পয়সার গরম (পৈতৃক সূত্রে এবং স্বোপার্জিত) ইত্যাদি যা তাকে মানায় সেগুলো এমনিতেই তার কম, নেশা তাকে আরো উদার করে তোলে।

—কেমন আছ গো? চেয়ারে অল্প অল্প দোল খেতে খেতে ব্যাঙো বলল।

—আর থাকা…

—কেন গো? ও, সেই কাণ্ড! আরে, দূর দূর। নাও, সিগারেট খাও।

—দাদা, আপনার আর কি। আপনি কাজ করেন শখে, আমরা করি প্রাণের দায়ে। বসে খেলেও আপনার টাকা বাড়তেই থাকবে, কমবে না।

—দেখে-শুনে বাবা ঠিক করতে হয় গো, হাঃ হাঃ, তোমরা পারনি, পস্তাচ্ছ। আসল ঘটনা হচ্ছে এত পরিশ্রম করেও মোটা হওয়া ঠেকানো যাচ্ছে না, প্যান্তাখাঁচা ছুঁড়িগুলো পর্যন্ত পাত্তা দিতে চায় না গো। হাঃ হাঃ।

ব্যাণ্ডোকে খুশি করার জন্য নিলয়ও তার হাসির সঙ্গে হাসি মেলাল।

—অ্যাই নিলয়, একখানা দারুণ ব্লু আছে, দেখবে? ব্যাণ্ডোর গোল গোল চোখ দুটো টাকার মতো গোল দেখাল।

এই এক রোগ লোকটার। সঙ্গী নিয়ে নোংরা ছবি দেখায় ওর বিশেষ আনন্দ। ও রসে যাদের রুচি তারা ব্যাণ্ডোর কাছে ঘুরঘুর করে। নিলয়ের ভাবতেও ঘেন্না হয়। কিন্তু ব্যাণ্ডোর মতো পয়সাওলা ক্ষমতাওলা লোককে তা মুখের ওপর বলার সাহস ওর নেই।

—আজ থাক দাদা, আরেকদিন হবে। আপনার কাছে এসেছিলাম বিশেষ দরকারে…

—তা ঠিক, তা ঠিক, ব্যাণ্ডো মাথা নাড়তে লাগল, তোমার যেমন ফিগার তেমনি চমৎকার ফিগার নিনার, ঘরে একখানা বড় আয়না থাকলেই হল, ব্যাস্, হেঃ হেঃ!

নোংরা ইঙ্গিত জ্বালা ধরাচ্ছে নিলয়ের মাথায়, কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায় নেই।

—বলছিলাম কি দাদা…

—কি বলছিলে?

—সেদিনকার শুটিংয়ের ফিল্মগুলো আপনার কাছেই আছে··· যদি প্রোজেকশন করে দেখান···আমি বুঝতে পারছি না···লোকে নানারকম আজে-বাজে গল্প রটাচ্ছে···। নিলয় থতিয়ে থতিয়ে বলল।

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড ভাবল ব্যাণ্ডো—ঠিক আছে। দেখাচ্ছি কিন্তু ওনলি ফর ইওর স্যাটিসফেকশন। কেউ যেন না জানতে পারে।

—আমি ওয়ার্ড দিচ্ছি।

—বসো।

ব্যাণ্ডো উঠে থপথপ করে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল বড় কালো একটা ট্রাঙ্কের সামনে অ্যাসিস্টান্টকে ডেকে কি যেন বলল।

খুটখুট করে কয়েকটা শব্দ। এডিটিং রুম অন্ধকার। প্রোজেকটর থেকে আলো গিয়ে পড়ল স্ক্রিনে। কিরকির শব্দ হচ্ছে প্রোজেকটরের। পর্দার ওপর ভেসে উঠল

সেদিনের দৃশ্যটা। আলাদা আলাদা শট্‌গুলোকে সুন্দর জুড়েছে ব্যাণ্ডো। কিন্তু ব্যাণ্ডোর কাজের তারিফ করা বা দৃশ্যটা উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা নয় নিলয়ের।

ঘরের আলোগুলো জ্বলে উঠল।

—কি দেখলে গো? ব্যাণ্ডো জিজ্ঞেস করল।

—বুঝতে পারলাম না।

—কি বুঝতে পারবে, ব্যাণ্ডো হাসল, এ বাবা যাত্রা-থিয়েটার নয় গো। হাওয়ায় হাত চালালে লোকে ধরে নেয় ভীষণ মার হচ্ছে। সিনেমার আসল নকল এক হওয়া চাই। দাঁড়াও, দাঁড়াও। গোপাল, আরেকবার চালাও শেষের দিকটা, একদম ডেড স্লো স্পীডে।

আবার ঘর অন্ধকার। পর্দার ওপর আলো।

দ্রুত ছবিগুলো সরে যাচ্ছে পর্দার গা বেয়ে।

—ও. কে। স্লো, ডেড-স্লো। ব্যাণ্ডোর গলা।

ব্যালে নাচের দুই নর্তকের মতো দেখাচ্ছে অরুণকুমার আর নিলয়কে। ডান হাতটা অরুণকুমারের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল নিলয়। হাতটা পালকের মতো ভাসতে ভাসতে সরে গেল পেছনে। কাঁধ-ঘাড় বেঁকানো, দারুণ জোরে ঘুষি চালানোর ভঙ্গিতে। নিলয়ের চোখে পলক পড়ছে না। নিজেরই চলচ্চিত্রায়িত ডান হাতটির ওপর সমস্ত মনোযোগ একটা বিন্দুতে স্থির হয়ে আছে। আবার পালকের হাতটা অর্ধবৃত্তের পথে ভাসতে ভাসতে এসে অরুণকুমারের পেটে লাগল।

—স্টপ। ব্যাণ্ডোর হাঁক।

মুহূর্তটা কয়েক সেকেণ্ড স্থিরচিত্র হয়ে রইল পর্দার ওপর।

—মুভ অন।

অরুণকুমারের মুখে যন্ত্রণার আশ্চর্য এক্সপ্রেশন। দুটো হাত স্লো মোশনে নেমে এল তলপেটে, শরীরের ওপর দিকটা হাওয়া কাটতে কাটতে ঝুঁকে পড়ল টেবিলের ওপর।

—ও. কে।

আলো জ্বলল। ব্যাণ্ডো এসে বসল চেয়ারে।

—যা চেয়েছিলে পেলে? ব্যাণ্ডো বলল ড্রয়ার থেকে হুইস্কির বোতল বের করতে করতে। বোতল থেকে সরাসরি গলায় ঢেলে দিল জলের মতো। চোখ কুঁচকে পাতলা জিভ বের করে ঠোঁট চাটল। বোতলটা ঢুকিয়ে রাখল ড্রয়ারে।

—না, বুঝতে পারলাম না, বুঝতে পারলাম না। স্বগতোক্তির মতো উচ্চার করল নিলয়।

—দেখ বাবা, বুঝতেই যদি পারবে লোকে তাহলে তোমাদের ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করার দরকার হত না। ইউ মাস্ট অ্যাক্ট ইন রীয়্যাল-লাইফ ম্যানার, ওনলি উইদাউট দ্যা রীয়্যাল-লাইফ এফেক্ট। দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ আর পেড ফর।

—চলি ব্যাণ্ডোদা, নিলয় উঠে দাঁড়াল, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

—নীড নট মেনশান, ব্যাণ্ডোও উঠে দাঁড়াল, নিনা কেমন আছে?

—ভালো।

—তোমার চোখ আছে বাবা···ও রকম ফিগার···নীল নির্জনে ওর একটা হেঁটে যাওয়ার মিড-শট ছিল···এডিট করবার সময় বারবার প্রোজেকশন করে দেখেছি তুলনা হয় না··· হেঃ হেঃ।

স্বামী হিসেবে নিলয়ের পক্ষে অত্যন্ত আপত্তিকর ব্যাণ্ডোর কথাগুলোও তার মনে কোনো দাগ ফেলছে না।

ল্যাবোরেটরির দরজা পর্যন্ত নিলয়কে এগিয়ে দিয়ে অসাধারণ সৌজন্য দেখাল ব্যাণ্ডো—ডোন্ট্ ওয়ারি।

—থ্যাংক্স্।

বাইরে চড়া রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। মানুষজন বিশেষ নেই পথে। নিলয় রোদের মধ্য দিয়ে নেশায় আচ্ছন্ন মানুষের মতো হেঁটে যেতে লাগল। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সে কি সত্যিই আঘাত করেছিল অরুণকুমারকে? নিজেকে যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। মনের কোনো গোপন ইচ্ছা কি সেই মুহূর্তে তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল সমস্ত টেকনিক্যাল স্কিল? যদি তাই হয়, সেই ইচ্ছার চেহারাটা কেমন? তার তো জানা নেই। মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াতে লাগল নিলয়।

দরজা খুলে দিলেন মা। নিলয় অবাক শুধু নয়, মা'র শীর্ণ অসুস্থ চেহারা দেখে নিমেষে অন্য চিন্তা উধাও হয়ে গেল মন থেকে।

—মা, তুমি! মাগো, এ তোমার কি চেহারা হয়েছে!

—তোর কাছে থাকতে এলাম নিলু। তাড়িয়ে দিবি না তো বাবা? বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন মা।

মাকে জড়িয়ে ধরল নিলয়।—তুমি কি বলছ মা!

নিলয়ের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন মা। মাকে প্রশ্ন করে নিলয় তার দুঃখ বাড়াতে চাইল না। সে বুঝতে পারছিল। মা বড় দুঃসময়ে এসেছেন। তবু যেন মাকে বুকের আশ্রয় দিতে পেরে সে সহসা খুব সাহসী ও নিরুদ্বেগ বোধ করল। মা তার বড় আপন, সবার চাইতে আপন। কতদিন মনে মনে চেয়েছে মাকে তার কাছে নিয়ে আসতে। প্রত্যাখ্যানের ভয়ে সে চেষ্টা করতে পারেনি। মা আজ নিজে থেকে এসেছেন। বড় সুখের দিন আজ।

—কান্না রাখ তো মা, মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে নিলয় বলল, ওরা আসুক, আজ আমরা সবাই মিলে খুব আনন্দ করব। লক্ষ্মী মা আমার।

মায়ের মুখে হাসি ফুটল। তিনি উঠে গিয়ে স্যুটকেস খুলে একটা ছোট পুঁটুলি বের করে এনে নিলয়ের হাতে দিয়ে বললেন—সাবধানে রেখে দে।

—কি আছে মা এতে?

—আমার গয়না।

নিলয় গুটিয়ে গেল।—না আনলেই পারতে মা।

মা হাসলেন—এগুলো তোর বাপ-ঠাকুরদার দেয়া নয়। আমায় বাবা দিয়েছিলেন বিয়ের সময়। আমার নাতবৌকে আমি দিয়ে যাব নিজের হাতে।

—তাহলে কিন্তু বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

—করব।

কয়েক ঘণ্টার তিক্ত স্মৃতি মুছে গেল নিলয়ের মন থেকে।

৭

বাস-স্টপ থেকে দূরত্ব বেশি নয়। মিনিট পনেরোর হাঁটা পথ। নিনার ইচ্ছে ছিল হেঁটে যাবার। সাইকেল রিকশা আজকাল তিন টাকার কমে যায় না। তিন টাকার দামও এখন ওর কাছে অনেক। অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করার মানসিক প্রস্তুতি ওর আছে। কিন্তু ভাবিয়ে তুলেছে নিলয়। যতটা দুঃসাহসী ওকে ভেবেছিল নিনা, প্রথম আঘাতেই দেখা যাচ্ছে ও তা নয়। সাজানো সংসারের ভালোবাসা-সুখ হারানোর ভয়ে ও যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। নিনা কিন্তু মোটেই ভেঙে পড়েনি। ওকে অভাবের মধ্যে থেকে, অভাবের নিত্যদিনের উলঙ্গ চেহারা দেখতে দেখতে, তাব

বিরুদ্ধে ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের লড়াই করতে হয়েছে। নিলয়ের যুদ্ধ ছিল অন্যরকম। সচ্ছল সংসারের একজন হয়েও নিজেকে তার অংশীদার ভাবতে না পারার দুঃখই ছিল তার আসল। যাকে আজন্ম দেখা যায়, যেমন অভাবকে দেখেছে নিনা, তাকে আর তেমন ভয় করে না মানুষ। নিলয় অভাবকে সেভাবে দেখেনি।

রিকশায় বসে এইসব ভাবছিল নিনা। রোদের দাপটে চারপাশ ঝিমিয়ে পড়েছে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে বাবুসোনা। ফর্সা মুখ লাল। আঁচলে ওর মুখ মুছিয়ে দিল নিনা। বাবুসোনা আপত্তির শব্দ তুলল—না, না···।

রিকশা নিয়ে ভালোই করেছে। হেঁটে এলে বেচারার আরো কষ্ট হত।

—এই তো এসে গেছি সোনা। নিনা বলল।

মুখচেনা রিকশাওলা রিকশা চালাতে চালাতে বলল—আপনি আর সিনেমায় নামেন না দিদিমণি?

বিরক্তি চেপে নিনা বলল—না।

—জামাইবাবু কি করে দিদিমণি?

এ ধরনের প্রশ্ন রিকশাওলার মুখে মানায় না। কিন্তু কলোনিরই ছেলে। জন কত সম্পন্ন মানুষকে বাদ দিলে এখানে জীবিকার ব্যবধানে সম্পর্কের ব্যবধান তৈরি হয় না। এটাই তো ভালো—নিনার মনে হয়। কিন্তু রিকশাওলার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া যে অসম্ভব।

—চাকরি করে। নিনা বলল।

—সুন্টুদা যে বলেছিল ফিলিমে কাজ করে।

সুন্টু নিনার ছোড়দা। মনে মনে ছোড়দার ওপর ভীষণ রাগ হল নিনার। কি দরকার ঘরের খবর বাইরের আজে-বাজে লোককে বলে বেড়ানোর? সিনেমায় কাজ করা যেন খুব বাহাদুরি। এরাই বোধ হয় দাদাদের বন্ধু-বান্ধব!

নিতান্ত অনিচ্ছায় উত্তর দিল নিনা—আগে করত। এখন করে না।

—ও, আপনি শুনেছেন···? কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল রিকশাওলা।

নিনা জানতে চেয়ে ওকে আরো প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে চাইল না।

—আপনাকে খুব কম দেখি। রিকশাওলা তবু থামতে নারাজ।

—দূরে থাকি। বেশি আসা হয় না।

—গরিবমানুষ এখানে আর থাকতে পারবে না দিদিমণি, রিকশাওলা তার বৃত্তান্ত নিনাকে শোনাবেই, যতদিন দখলী জমি ছিল কেউ কিনতে চাইত না। এ সরকার

আমাদের লিজ করিয়ে দিল। ব্যস্, অমনি টাকাওলা লোকেরা কেনবার জন্যে ছোটাছুটি শুরু করল। শহরে জমির দাম আশি হাজার-এক লাখ কাঠা। এখানেও এখন বিশ-পঁচিশ হাজার কাঠা হয়ে গেছে। গরিব মানুষ নগদ টাকার লোভে বিক্রি করে দিচ্ছে। শুনছি নান্টুদা মন্টুদাও খদ্দের খুঁজছে।

নিনা মনে মনে আঁতকে উঠল। টাকা হাতে পেলে উড়িয়ে দিতে ওদের সময় লাগবে না। তবু যা হোক মাথার ওপর একটা চাল আছে, নিজের খানিকটা মাটি। শেষ পর্যন্ত কি বুড়ো-বুড়িকে ভিক্ষের থালা হাতে নিয়ে রাস্তায় নামতে হবে?

—লিজের জমি বিক্রি করা যায়? নিনা জিজ্ঞেস করল।

—তা জানি না, রিকশাওলা বলল, তবে হাতবদল হচ্ছে দেখছি। টাকা থাকলে সবই করানো যায়।

—তুমি থাক কোথায়?

—কলোনিতেই, আপনাদের বাড়ি ছাড়িয়ে আরো ভেতরে।

—তুমি কি করবে?

—না খেয়ে মরলেও জমি বেচব না। বাবা একবার উদ্বাস্তু হয়েছিল, সে কষ্ট আমি দেখেছি, আবার উদ্বাস্তু হওয়ার সাধ নেই আমার, তাতে ভিক্ষে করে খেতে হয় সেও ভি আচ্ছা। অবিশ্যি ভিক্ষে আমাকে করতে হবে না। আমরা কোনোদিন ভদ্রলোক ছিলাম না, জাতে জেলে। বাবা দেশে জাল নিয়ে লোকের পুকুরে পুকুরে মাছ ধরে বেড়াত। কোনো কাজে আমার লজ্জা নেই। এখন রিকশা চালাচ্ছি, না পোষায় সবজি নিয়ে বসে যাব, না হয় আরেকটা দেখব। ভদ্রলোক হওয়ার হাজার অসুবিধে দিদিমণি।

নিনার হঠাৎ ভালো লাগতে লাগল মানুষটাকে।

—তুমি ঠিক জান বড়দা ছোড়দা ভিটে বিক্রির চেষ্টা করছে?

—জানি। কিন্তু আমার নাম করে ওদের বলবেন না। হামলা করবে আমার ওপর। দিদিমণি, ভিটে ওদের বেচতে দেবেন না।

—আচ্ছা ভাই, বড়দা ছোড়দা কি করে বলতে পার?

—আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।

রিকশাওলা বাকি পথ একেবারে চুপচাপ রিকশা টেনে নিয়ে গেল।

বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নেমে নিনা ভাড়া মিটিয়ে দিল।

রিকশাওলা নিচু গলায় বলল—আপনার দাদাদের বলবেন না কিন্তু দিদিমণি।

—আচ্ছা, বলব না, কথা দিলাম। তোমার নামও জানি না আমি। ভয় কি?
—নাম খুঁজে বের করতে কতক্ষণ। ওদের পাঁচ মিনিটের কাজ।
—তুমি যেন বড্ড ভয় কর ওদের।
—এ তল্লাটে কে না করে। হালে আরো বেশি করছে।
রিকশাওলা রিকশা ঘুরিয়ে চলে গেল।

মা দাওয়ায় বসে সেলাই করছিলেন। নিনাকে দেখে উঠোনে নেমে এলেন।
—আস, দাদুভাই আস। নিনার কোল থেকে বাবুসোনাকে কোলে নিলেন মা। দিমার কোলে যেতে বাবুসোনার আপত্তি নেই।
দাওয়ায় বসে হাতপাখার হাওয়া খেতে খেতে নিনা বলল—বাবারে দেখি না? কই গেছে?
ভুই দাদার সম্বন্ধে ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করল না, তাদের বাড়িতে থাকা দৈবাৎ ঘটনা।
—সুন্টুরে জামিনে ছাড়াইয়া আনতে কোর্টে গেছে। মা মুখ নিচু করে ধরা ধরা গলায় বললেন।
নিনার চোখ পুরনো কালচে বাখারির বেড়া দেয়া উঠোন, তুলসীতলা, বকুলগাছ, আলকাতরা মাখানো মুলিবাঁশের বেড়ার ঘর হয়ে মায়ের মুখের ওপর এল।
—ছোড়দারে পুলিসে ধরছে ক্যান্? নিনা জিজ্ঞেস করল।
—লোকে ত কয় ওয়াগন ভাঙছে না কি করছে। অগ পার্টির লোকেরা কয় অগ পার্টিরে বিপদে ফালানের লাইগা মিথ্যা দোষ দিয়া ধরছে। আইজ নাণ্টু, অগ পার্টির লোকেরা মিছিল কইরা কোর্টে গেছে সুন্টুরে ছাড়াইয়া আনতে। তোর বাবারেও সঙ্গে লইয়া গেছে।
—দাদারা আবার পার্টির লোক হইল কবে?
—হইছে। কয় মাস হইল হইছে।
—হইয়া লাভ?
—আমি হের কি জানি। বুঝি না এ হুগল।
বোঝে না নিনাও। বাবার কাছ থেকে শুনেছিল বড় বড় দেশ-নেতাদের কাহিনী। তাঁরা সর্বস্ব ছেড়েছেন, হাসতে হাসতে দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, সহজ

সুখ ছেড়ে কঠিন দুঃখকে সঙ্গী করেছেন। রাজনীতি-করা মানুষদের সম্পর্কে নিনার মনে তাই ছিল শুধুই শ্রদ্ধা।

কিন্তু গত আট-দশটা বছর তার ধারণাগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। যাদের জায়গা হওয়া উচিত জেলখানায় তাদের অনেকেই কি এক অদ্ভুত কায়দায় নেতা হয়ে বসেছে। অশিক্ষিত গুণ্ডা-বদমাশ খুনে লুটেরাদের চরিত্রবান সাচ্চা মানুষ বলে সার্টিফিকেট দিতেও বাধে না সমাজের উচ্চশিক্ষিত মাথাদের। ডাকসাইটে গুণ্ডা হয়ে যায় নেতাজীর যোগ্য ভাবশিষ্য—মাথাওলা নেতার বয়ানে। নেতার মতে ইনি নাকি বিপথগামী যুবশক্তিকে সুপথে ফিরিয়ে আনায় অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সুপথে ফিরে আসা যুবশক্তির দাপটে অবশ্য পাড়ার লোক ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকে। টালির ঘরের বাসিন্দা নেতাজীর ভাবশিষ্য নিজের দোতলা বাড়িতে উঠে যান। ক্রমে ক্রমে দু'খানা মিনি, একখানা বাস, তিনটি দোকান।

এসব নিজের চোখে দেখেছে নিনা, জেনেছে এও রাজনীতি, কিন্তু বাবার কাছ থেকে পাওয়া সামান্য শিক্ষায় এত গভীর এবং জটিল রাজনীতি সে বুঝতে পারেনি। অতএব দাদাদের রাজনীতি করাও তার বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

—মরুক গিয়া, নিনা বলল, শোনলাম ওরা নাকি ভিটা বেচনের তাল করতাছে।

—তুই শুনলি কই?

—শুনছি। সত্যি?

—কইছিল দুই-চার বার। তোর বাবার মত নাই।

—দলিল বাবার নামে। বাবায় য্যান কোনোমতেই রাজী না হয়।

—আমারও মত নাই। তবে ওরা কইতে আছিল বেচলে ষাইট-সত্তর হাজার টাকা পাওন যাইব। গ্রামের দিকে গেলে দশ-বারো হাজার টাকায় থাকনের জায়গা হইয়া যাইব। বাকি টাকা দিয়া ওরা ব্যবসা করব।

—হু। থাকনের জায়গাও হইব না, ব্যবসাও ঘণ্টা করব। মদ খাইয়া বদমাইশি কইরা টাকাগুলি শ্যাষ করব। তোমাগরে রাস্তায় নামাইব। অগরে আমি জানি। খবরদার মা, রাজী হইও না। টাকাটা রাখ।

ব্যাগ থেকে দু'খানা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে মা র হাতে দিল নিনা।

মা অকুণ্ঠ হাতে নিলেন। মেয়ের মারফত এলেও জামাইয়েরই রোজগারের টাকা। মাসে মাসে হাত পেতে এ টাকা নিতে প্রথম দিকে বাধো বাধো ঠেকত। আপত্তির দু'একটা শব্দও উচ্চারণ করতেন। তারপর বেমানান লজ্জাকে প্রশ্রয় দেয়া ছেড়েছেন।

একশো টাকা কম নয়, দিন দশেকের ডালভাতের সংস্থান। স্বামীর সৎ উপার্জনে তাঁ
দাবি আছে, সে দাবি স্বামী সম্পূর্ণই মেটান, কিন্তু তাতে দশ কিলো চালের দামও হ
কিনা সন্দেহ। ছেলেদের নোংরা টাকায় হাত দিতে তাঁর আপত্তি, মুখ ফুটে চানও না
তবে দিলে ফিরিয়ে দেবার সাধ্যও নেই। অনটন সে সাধ্য তাকে দেয়নি। তিনি
গৃহিণী, স্বামী-সন্তানের সামনে ভাতের থালা ধরে দেবার দায়িত্ব যে তাঁরই।

মা টাকা রাখতে ঘরে গেছেন।

সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। উঠোনে গাছের ছায়া। ফুরফুরে হাওয়া আসছে
থেকে থেকে। ক্লান্ত বাবুসোনা মাদুরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটা হাড়-জিরজিরে গরু হেঁটে যাচ্ছে মেটে রাস্তা দিয়ে। সারা গায়ে শুকনো
গোবর, পিঠের ওপর লাল দগদগে ঘা। দুধ দেবার ক্ষমতা নেই বলে মালিক হয়তো
খেদিয়ে দিয়েছে।

মা এসে বললেন—তুই খাবি ত?

—তুমি খাও নাই?

—ভাবছিলাম ওরা আইলে খামু।

—কখন আইব কইয়া গেছে?

—না…কয় নাই…তবে…। মা থেমে থেমে বললেন।

মিনা হাসল।

—হাসছ ক্যান্?

—পোলাগ লাইগা দরদ দেইখা হাসি।

—তোর বাবায়ও ত খায় নাই।

—বাবার লাইগা অত দরদ তোমার নাই।

মা হেসে বললেন—তোর কার লাইগা দরদ বেশি, দাদুভাইয়ের লাইগা না
জামাইয়ের লাইগা?

—তোমার পোলাগ মতন হইলে পোলার লাইগা দরদ আমার থাকব না।

—কওন সোজা। ভগবানেরে কই তোর পোলা য্যান আমার পোলাগ মতন না
হয়। কিন্তু হইলে কালাইতে পারবি না।

—আমি পারুম।

—নারে মা, পারন যায় না। ওগরে আমরা কি দিতে পারছি? লেখাপড়া
শিখনের সুযোগ পাইল না, কামকাজ পাইল না…হগলই কপাল রে মা…

—কপালের দোষ দেও ক্যান্ মা? ওরা ত অখন পোলাপান না। কলোনির কত পোলা রিকশা চালাইয়া, চায়ের দোকান দিয়া, হাতের কাজ শিখ্যা পেটের ভাত জোগাড় করতাছে। না মা, তুমি ওগ হইয়া সাফাই দিও না।

মা বিব্রত হয়ে চুপ করে গেলেন।

নিনা ব্যাগ থেকে হরলিক্সের শিশির আধ শিশি দুধ বের করল। যখনই আসে বাবুসোনার জন্য ও দুধ নিয়ে আসে। দুধ চেয়ে মাকে লজ্জা দেয় না।

—দুধ গরম কইরা দেই? মা জিজ্ঞেস করলেন।

—পরে দিও। ঘুম থেইকা ওঠুক।

—তুই খাইয়া ল।

হাতঘড়িতে সময় দেখল নিনা। সওয়া একটা।

—আরেকটু দেখি, বাবায় আসে নি···। তুমি বস, আমি বরং দুইটা চাউল বসাইয়া দেই।

উঠতে যাচ্ছিল নিনা, মা বাধা দিলেন।

—ভাত রাঁধন লাগব না। চাইর জনের মতন রাঁধছি, হইয়া যাইব। করুণ সলজ্জ দেখাল মা'র মুখ।

মা'র মুখ দেখে একটা কঠিন শব্দ নিনার জিভের ডগা থেকে অনুচ্চারিত ফিরে গেল।

নিজেকে থিতোবার সময় দিয়ে ও বলল—মাগো, তোমারে দেইখা কষ্টও হয়, রাগও হয়। যা-ই কর মা, পোলাগ পরামর্শে ভিটামাটি য্যান বেইচা দিও না।

দু'জনের বলার কথাগুলো সহসা যেন ফুরিয়ে গেল। গ্রীষ্মের ঝিম-ধরা কলোনির দুপুর আকস্মিক ক্লান্ত নীরবতার মধ্যে ঠেলে দিল মা-মেয়েকে।

নিনার নিটোল আত্ম-বিশ্বাসে প্রশ্নের আঁকাবাঁকা চিড়গুলো ফুটে উঠছিল। কে কার জন্য কতখানি স্নেহ-ভালোবাসা বুকে নিয়ে বসে আছে তার সঙ্গে কারো মানুষ হওয়া না-হওয়ার সম্পর্ক খুবই কম। মানুষ সাবালক হওয়ার পর তার দরকার একটা আত্ম-বিশ্বাসের জমি—যেখানে দাঁড়িয়ে সে নিজের ক্ষমতা-অক্ষমতা বাজিয়ে নিতে পারে। এ দেশে ক'জনের ভাগ্যে সেটুকু জোটে? দাদারা গোল্লায় গেছে। গোল্লায় যাওয়ার রাস্তাগুলো আছে কেন? যাদের হাতে ক্ষমতা তারা দু'দিনে বন্ধ করে দিতে পারে। নাকি ক্ষমতা রাখতে গেলে এ রাস্তাগুলো খোলা রাখতেই হয়, নতুন রাস্তাও খুলে দিতে হয়। রাস্তা ছাড়া মানুষ চলতে পারে না, বাঁচতে পারে

না, তা সে রাস্তা যেমনই হোক। সোজা শক্ত ঝকঝকে তকতকে রাস্তা মানুষ নিজের চেষ্টায় তৈরি করে নিতে পারে না, একজন-দু'জন বাহাদুরকে দিয়ে দেশের বিচার হয় না। রিকশাওলা ছেলেটা যতই বলুক বড় গলায়—সে খাটতে পিছপা নয়, পেটের ভাতের জোগাড় সে করবেই—কিন্তু শুধু তাতেই কি মানুষের আত্ম-বিশ্বাসের জমি তৈরি হতে পারে ?. মানুষ মানুষের মতো হয়ে উঠতে পারে ? পেটের ভাত জোগাড় করাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হলে মানুষকে বড় হতে বলা, সৎ হতে বলা আহাম্মুকি, না হয় বদমায়েশি।

দাওয়া থেকে দেখতে পেল নিনা নান্টু আসছে। পা ফেলা দেখেই বোঝা যায় নেশা করেছে ভালোমতোই। কাছে আসতে জড়ানো গলায় গানও শোনা গেল। হরদম-শোনা হিন্দি গান। বদ্ধ মাতাল নান্টু।

বাখারির গেট সরিয়ে আছাড় খেতে খেতে সামলে নিয়ে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল নান্টু, দু'পা ফাঁক করে—সম্ভবত ব্যালান্স ঠিক রাখার জন্য। টালমাটাল মাথাটাকে অতি কষ্টে সোজা করে চোখ কুঁচকে তাকাল নিনার দিকে।

তারপর হুড়মুড় করে এসে পড়ল দাওয়ার ওপর।

—হায় মেরে বহেন, মেরে পেয়ারি ছোটি বহেন, বহুৎ দিন তুমকো দেখা নেহি···

—আঃ ছাড়, ছাড়, নিনা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না, এই বড়দা, ছাইড়া দে···

কি চেহারা হয়েছে নান্টুর! অনিয়ম-অত্যাচারে নষ্ট মানুষের মুখ। স্টুডিও পাড়ায় ঘোরাঘুরি করার সময় এ ধরনের মুখ বহু দেখেছে নিনা। দেখলে ঘেন্না করে, বিরক্তি লাগে।

নান্টুর মুখের ঝাঁজালো মদের গন্ধে গা গুলিয়ে উঠছে নিনার।

—সরা, হাত সরা, জোরে ঠেলে কাঁধের ওপর থেকে নান্টুর হাত সরিয়ে দিল ও, ছিঃ, লজ্জা করে না তোর ছোটলোকের মতো মাতলামি করতে···

—লজ্জা! কিসের লজ্জা? যা খেলে আরাম হয় তা খেতে লজ্জা হবে কেন ছোট্ট বোনটি আমার? ছোটলোক? ভদ্রলোকরা যত মদ খায় ছোটলোকেরা তার অর্দ্ধেকও পায় না। আরে বাবুসোনা, মাই ওনলি একমাত্র ভাগ্নে···চলে আও বেটা মেরা কোলমে আও। বাবুসোনার দিকে এগোল নান্টু।

মা আড়াল করে দাঁড়ালেন।—রৌদে পুইড়া আইছে। ওরে ঘুমাইতে দে।

—বহোতাচ্ছা। ঘুমোও, ঘুমু কর, লক্ষ্মী ছেলে, ঘুমু কর বাপ আমার।

—মন্টু আইল না? তোর বাবায় কই? মা জিজ্ঞেস করলেন।

—বাবা? বাবা কোর্ট সে গিয়া ধান্দামে। স্বন্টুকে জামিন দিল না। আমাদের উকিল কত করে বলল হাকিমকে। শালা নট নড়নচড়ন। দশদিন পরে আবার যেতে বলেছে। বলে কিনা স্বন্টু ওয়াগন ভেঙেছে, পুলিসের সঙ্গে পেটোবাজি করেছে। আমাদের উকিল কত বোঝাল, স্বন্টুর মতো ছেলে হয় না, হাঃ হাঃ, পুলিস নিশ্চয় ভুল করে কাকে ধরতে কাকে ধরেছে। বাপরে বাপ, শালার ম্যাজিস্ট্রেটের কি গোঁ। বলে, আপনারা যা-ই বলুন ছাড়া হবে না। আমরা বাইরে এসে এক ঘন্টা ধরে স্লোগান চেঁচালাম, কমসে কম দু'ডজন পেটো ছুঁড়লাম। আমাদের লীডার দেবব্রত গাঙ্গুলি শালা কি ফাটানো বক্তৃতা করল, কিস্সু হল না। স্বন্টু আবার জালে-ঢাকা গাড়িতে করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। তবে হ্যা, আমি সবাইকে বলে দিয়েছি, লেকচার দিয়ে বলে দিয়েছি, আমি যদি যুবনেতা নান্টু রায় হই তাহলে স্বন্টুকে আমি বেকসুর খালাস করে আনবই। কোর্ট যদি না ছাড়ে আমরা পেটো ঝেড়ে কোর্টই তুলে দেব।…সিনোরিটা বিনা চাটনি ক্যায়সে বনি…

গানের সঙ্গে নাচের ঘুরুনি দিতে গিয়ে উঠোনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নান্টু। উপুড় হয়ে পড়েই রইল মড়ার মতো।

গা-ঘিনঘিন করছে নিনার। মা'র কাছে দাদাদের উৎপাতের বিবরণ ও শুনেছিল, নিজের চোখে দেখেওছে অল্পস্বল্প। কিন্তু এ রকম দৃশ্য এই প্রথম। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু না খেয়ে চলে গেলে মা কষ্ট পাবে।

নান্টু উঠে বসেছে। হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে বসে আছে উঠোনে।

—মাতাল, ছোটলোক, হঠাৎ জ্বলে উঠল নিনা, যুবনেতা হইছে না আমার মাথা হইছে। ছোটলোক, গুণ্ডামি কইরা বেড়ায়…খাইটা খাইতে পারস না, রিকশা চালাইতে পারস না? চোর, গুণ্ডা…বাবার মতো মানুষরে তোরা…

—এই, চোপ, চোপরাও…। টলমলে মাথা তুলে চোখ পাকিয়ে বলল নান্টু।

—ক্যান্ চুপ করুম? তোর ডরে?

—আলবৎ আমার ভয়ে।

—এক আধলার মুরোদ নাই আবার ভিটা বিক্রি করনের ফিকির করতাছে।

দু'তিন বারের চেষ্টায় ঝোঁক সামলে উঠে দাঁড়াল নান্টু। টলতে টলতে এগিয়ে এল নিনার সামনে। মুখের সামনে আঙুল উঁচিয়ে বলল—কে বলেছে তোকে বিক্রি করছি আমি? মা? এই মা, তুম বোলা কেয়া?

হতভম্ব হয়ে দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন মা। ঝগড়া থামানোর চেষ্টা করছিলেন না। মাতাল নান্টুর চেহারা তার চেনা, সামলাতে গিয়ে অপদস্থ হয়েছেন বহুবার।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে এল নিনা। নান্টুর সামনে দাঁড়িয়ে চড়া গলায় বলল—মারে ভয় দেখাস নাকি তুই? তোগ মতন জানোয়ারের লাইগা ভাত রাঁইধা বইসা থাকে···সেই মায়েরে তুই রাঙা চউখ দেখাস? ভিটা বিক্রির চেষ্টা কইরা দেখ্ তুই, কি হাল করি তোর আমি···

নান্টুর মুখ-চোখে নেশা সরিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে প্রচণ্ড রাগ।

—বেশ করব, বিক্রি করে দেব। বাবা রাজী না হয় পেঁদিয়ে রাজী করাব। কি করবি, কি করবি তুই?

—কি বললি, কি বললি তুই হারামজাদা, বাঘিনীর মতো গর্জে উঠল নিনা, নিজের হাতে তোর গলা কাইটা আমি ফাঁসি যামু। এর লাইগা লোকের গাইল শুইনাও আমি তোগ লাইগা খাইটা মরছি? তোরা আমার বড় ভাই হইয়াও কি করছস বাবা-মা'র লাইগা? কইরা দেখ্ বাবা-মা'রে ভিটা-ছাড়া করনের চেষ্টা, যত বড়ই যুবনেতা হ আর ওয়াগন-ভাঙার সর্দার হ আমি ছাড়ুম না।

থরথর করে কাঁপছে নিনার সর্বাঙ্গ। নাকের বাঁশি ফুলে ফুলে উঠছে। রাগে দুঃখে বিস্ফারিত চোখে জল এসে গেছে।

বোনের অচেনা রুদ্রমূর্তির সামনে মিইয়ে গেল নান্টু। বিড়বিড় করতে করতে পিছিয়ে গেল পায়ে পায়ে—মুরোদের খোঁটা দিচ্ছে! যা যা, বিয়ে তো করেছিস একটা চারশো বিশকে, তার আবার বড় বড় বাতেলা। ফিলিমে কাজ করে! ঘোড়ার ডিম করে! একটা ছবিতেও শালাকে দেখলাম না।

গজগজ করতে করতে বেড়ার ধারে বসে পড়ল নান্টু।

নিলয় সম্পর্কে ওর মন্তব্যগুলো নিনার কানে পৌঁছেছে। বুকের ভেতর থেকে দারুণ ক্রোধের জ্বালা হঠাৎই উড়ে গেল বুকটাকে ফাঁকা করে দিয়ে। নিনা কখনো বলেনি ওদের নিলয় কি কাজ করে সিনেমায়, কোথায় যেন বেধেছে। বলতে পারেনি যে নিলয় অনেক কিছুই করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, নিজের সমস্ত শক্তি সাধ্য সততা উজাড় করে দিয়েও করে। অথচ নান্টু তার দুষ্কর্ম বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ায়, আর নিলয় তার কৃতিত্বের সামান্য প্রমাণও দিতে পারে না কাউকে। স্বামীর জন্য নিনার গর্বও বুকের চার দেয়ালের মধ্যেই বন্দী থাকে।

ঠোঁট কামড়ে ঘুরে দাঁড়াল নিনা। নিলয়ের লজ্জায় নিজের লজ্জায় হঠাৎ-আসা চণ্ডাল রাগটাকে ও ক্ষমা করতে পারছে না। এমন কখনো হয়নি। এভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলার ঘটনা ও স্মরণ করতে পারে না। কেন এমন হল ?

বাবুসোনা কখন জেগে উঠেছে। বসে বসে চোখ রগড়াচ্ছে হাতের উলটো পিঠে।

নিনা ওকে কোলে নিল। দাওয়ার ওপর থেকে ব্যাগটা নিয়ে কাঁধে ঝোলাল।

—আইজ যাই মা।

—খাইয়া যা স্বরো। ভীরু গলায় মা বললেন।

—আইজ না মা।

অসহায় করুণ চোখে তাকিয়ে রইলেন মা।

নিনা রাস্তায় পা দিল।

পেছন থেকে নাণ্টু চেঁচাচ্ছে—মাপ কর্ দে বহেন, স্বরো, আয়, স্বরো…

নিনা ফিরে তাকাল না।

৮

মা শুধু দেখলেন নিনার ক্লান্ত শুকনো মুখ, বাবুসোনা কাদা হয়ে আছে মায়ের কোলে।

—যা রোদ বৌমা, মা বললেন, বিকেলের দিকে বেরুলেই পারতে।

—অনেকদূর মা, বিকেলে বেরুলে ফিরতে রাত হয়ে যায়। নিলয়ের বাড়ানো হাতে বাবুসোনাকে দিয়ে নিনা বলল।

চৌকিতে বসল নিনা। নিলয় পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিল।

—বাবুসোনাকে মা'র কাছে রেখে যেতে পারতে। নিলয় বলল।

—মা তাহলে তিষ্ঠোতে পারতেন না। ক'টা দিন যাক, তখন ঝামেলা করবে না।

বাবুসোনা নিলয়ের কাঁধে মাথা রেখে চুপচাপ। ঘুমোয়নি যদিও।

মা দেখেছেন বৌমার ক্লান্তি, শারীরিক কষ্ট। নিলয় দেখেছে তার বেশি।

—তুমি চান করবে তো ? নিলয় জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ।

—তাহলে তুমি চান করে নাও। আমি বাবুসোনার মুখ-টুখ মুছিয়ে, জামা-ইজের পালটে, দুধ খাইয়ে দি।

—দাও।

—আমাকে দে না নিলু, মা বললেন, আমি করে দিচ্ছি।

—তুমি পারবে না মা। নিলয় বলল।

—না, মা পারবেন না, নিনা হাসল, তুমি পারবে! তোমাদের মানুষ করেননি মা।

—আমি তা বলিনি, মা'র শরীর ভালো নয় তা-ই।

—যাই, চানটা সেরে আসি। নিনা বলল।

—আরেকটু বসে যাও বৌমা, মা বললেন, গায়ের ঘাম না শুকোতে চান করলে সর্দিগর্মি হয়ে যেতে পারে।

নিনা উঠতে যাচ্ছিল, মায়ের কথায় বসে পড়ল আবার।

—যাক, এখন আর অবাধ্যতা করতে পারবে না। নিলয় সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে মন্তব্য করল।

—দেখছেন মা, নিনা মায়ের গা ঘেঁষে এল, মিছেমিছি আমার পেছনে লাগছে। এই, আমি তোমার অবাধ্য? কথা শুনি না?

—শোন, নিশ্চয়ই শোন, তবে বড় বড় ভারি ভারি কথা। ছোটখাট হলে শুনতে চাও না। এই না, না, মায়ের অত কাছে না। মাকে দখল করার মতলব ছাড়।

—বেশ করব, দখল করব, ঠেকাও দেখি তুমি। নিনা জড়িয়ে ধরল মাকে।

—ইস্, ঘেমো গায়ে জড়িয়ে ধরে দিলে আমার সুন্দর মাটাকে নোংরা করে।··· এ কি মা, তোমার চোখে জল কেন?

আঁচলে চোখ মুছে মা বললেন—কই না তো···

নিলয় নিনা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে নির্বাক হয়ে গেল। মায়ের কান্না বোঝার সাধ্য ওদের ছিল না।

যে বেদনার ইতিহাস আনন্দের মুহূর্তেও চোখের জল ঝরায় তা শুধু মায়ের মনই জানে। এমন করে বড় ছেলের বৌ তো কোনোদিন তাঁকে মা বলে ডাকেনি, জড়িয়ে ধরেনি ভালোবাসার দুই হাতে। বড় ছেলেও না।

বিকেল সন্ধ্যে কাটল ভারি আনন্দে—খুনসুটি গল্প-গাছা করে।

বয়স যত বাড়ে, মানুষ হয়ে পড়ে স্মৃতি-নির্ভর। স্মৃতির সম্বল নাড়াচাড়া করেই তার আনন্দ। দুর্বল অনিচ্ছুক দেহ, নিজেকে সমাজ-সংসারের কাছে অপ্রয়োজনীয়

মনে হতে থাকার বাস্তব ও কল্পিত কারণে বর্তমানে নিরাশ্রয় বোধ করে বয়স। তার সান্ত্বনা-আনন্দ স্মৃতি ও অতীত।

পুরনো দিনের অনেক গল্প শোনালেন মা। নিলয়ের ছেলেবেলার দুষ্টুমির গল্পই বেশি। তাতে হাসি আর রহস্যের খোরাক ছিল বিস্তর। অনেকদিন পরে প্রাণখোলা হাসির সুযোগ পেল নিনা।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বাইরের ঘরে চৌকির ওপর মাকে বিছানা করে দিল নিনা। দু'খানাই মাত্র ঘর। এ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

—এমন যত্ন করে বিছানা কেউ আমাকে করে দেয়নি মা। শুয়ে পাশ-বালিশ টেনে নিতে নিতে মা বললেন।

বাইরের ঘরে মাকে শুতে দেয়ায় যেটুকু সংকোচ ছিল নিনার তাও কেটে গেল।

নিজেদের বিছানা ঠিকঠাক করে নিনা ইঙ্গিতে নিলয়কে দু'ঘরের মাঝখানের দরজাটা দেখাল। এতদিন এটা বন্ধ করার দরকার হয়নি।

নিলয় বাইরের ঘরের আলো নিভিয়ে দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিল।

অঘোরে ঘুমোচ্ছে বাবুসোনা। ওর জায়গা দু'জনের মাঝখানে। নিলয় সাবধানে ওকে একপাশে শুইয়ে দিল। মাঝখানে—নিনার পাশের জায়গাটা—আজ ওর দরকার।

ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে শোবার আগে প্রাত্যহিক চুল আঁচড়ানোর পালা সারছিল নিনা। আয়নায় নিলয়ের চোখে চোখ পড়তে ও হাসল। নিলয়কে কিছুক্ষণ অপেক্ষায় রেখে আলো নিভিয়ে বিছানায় উঠে এল।

চুপচাপ খানিকটা সময় পার করে নিলয় বলল—তোমার মা-বাবা ভালো আছেন?

—ছোড়দাকে পুলিস ধরেছে। হাজতে আছে।

—কেন?

—ওদের কি কোনো গুণের কমতি আছে।

—ছাড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে?

—না। কেন, তুমি যাবে নাকি ছাড়াতে?

—আমার ক্ষমতা কোথায়?

—থাকলেও আমি তোমাকে যেতে দিতাম না। সামনের মাস থেকে টাকা দিতে চাও মানি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দিও। আমি আর ও বাড়িতে যাব না। বিরক্তিকর প্রসঙ্গে ইতি টানার সুরে বলল নিনা।

বাপের বাড়ি থেকে ফেরার পর ওকে দেখেই নিলয় বুঝেছিল কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। ও শক্ত ধাতের মেয়ে, কিন্তু তাই বলে আবেগের ঘাটতি নেই স্বভাবে, আর সেটা ও লুকোতেও পারে না। অন্তত নিলয়ের ভালোবাসার চোখ ওর মুখের রঙ-ফেরা ঠিকই পড়তে পারে।

নিনাকে সময় দিয়ে নিলয় বলল—আমাকে বলতে আপত্তি আছে ?

—কি হবে শুনে ? বাবা-মা'র লজ্জা অপমান শুধু চোখ চেয়ে দেখার জন্য যেতে আমার ভালো লাগে না। যদি ছেলে হয়ে জন্মাতাম···

নিলয়ের দিকে পেছন ফিরে শুয়ে আছে নিনা। নিলয় ওকে কাছে টেনে আনল, ঘাড়ে ঠোঁট ছুঁইয়ে আস্তে হেসে বলল—তুমি ছেলে হয়ে জন্মালে আমার কি দশা হত বল তো।

—মেয়ের অভাব নেই সংসারে, কেউ না কেউ জুটে যেতই। আর, না জুটলে সেটাই হত তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো।

—আমি তা মনে করি না। আমার যোগ্যতা যত কমই হোক, সাধ্যমতো সংসারটাকে জেনে-বুঝে যেতে চাই। গা বাঁচিয়ে চলায় সত্যিকারের আনন্দ আছে বলে আমি মনে করি না।

পাশ ফিরে নিলয়কে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মুখ চেপে নিনা বলল—ছি, ছি, তুমি কি ভাবলে আমি তোমার যোগ্যতা নিয়ে ইঙ্গিত করেছি ?

—আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছি নাকি যে ও রকম উদ্ভুট্টি চিন্তা করব।

নিলয়ের সোহাগের হাত নিনার নিটোল নরম বুকে আশ্রয় খুঁজে নিল।

আপত্তি করল না নিনা, একবার শিউরে উঠে আরো ঘন হয়ে এল নিলয়ের কাছে।

—তোমাকে যেন আজ বেশ সাহসী মনে হচ্ছে। কোনো ভালো খবর আছে ? এই—এই—, নিনা শরীরের একটা মোচড় দিল, কি হচ্ছে ?

হাত সরিয়ে নিয়ে হাসল নিলয়—যা হবার···

হাসিটা একটু জোরেই হয়ে থাকবে, নিনা ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল—আস্তে, মনে রেখো ও ঘরে মা আছেন। অসভ্যতা একদম বন্ধ।

—অসভ্যতা বন্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে আমি অসভ্য না হলে তোমারও কি ভালো লাগবে ?

—যাঃ।

—যাক, তুমি খবর জিজ্ঞেস করছিলে। খবর ভালো না। কাজকর্মের আশা দেখছি না। দু'চার জনের সঙ্গে দেখা হল, সকলকেই হতাশ মনে হল। ভরসা জগদীশ্বর।

ইচ্ছে করেই নিলয় অধীর ব্যাণ্ডোর সঙ্গে দেখা করার ঘটনা চেপে গেল।

—কি ভাবছে ওরা? নিনা শুধোল।

—ওরা আর কি ভাববে, ভাবছে আবোল-তাবোল। আসলে ভাববার মালিকই ওরা নয়।

নিলয়ের বলার সহজ সুরে অবাক হচ্ছিল নিনা।

—তুমি ভাবছ না?

—ভাবছি নিশ্চয়ই, কিন্তু হঠাৎ যেন কোথায় একটা সাহসের জায়গা পেয়ে গেছি। ভাবছি, তবে ভয় পাচ্ছি না। আশ্চর্য লাগছে।

নিলয়ের ঘন চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে নিনা বলল—এই তো বেশ…

—জান, মাকে পেয়ে হঠাৎই যেন আমি পালটে গেছি। সব নতুন নতুন লাগছে, আস্তে আস্তে, নরম গলায়, যেন বুকের অনেক ভেতর থেকে নিলয় বলতে লাগল, আমার মধ্যে বোধ হয় এখনো একটা বাচ্চা ছেলে বেঁচে আছে যে মাকেই মনে করে সবচেয়ে বড় আশ্রয়। অথচ মা'র কাছ থেকে ভালোবাসা ছাড়া এখন আর কি পেতে পারি আমরা? তিনি আমাদের সমস্যার সমাধান করা দূরে থাক নতুন সমস্যাই সৃষ্টি করবেন। হিসেবী নিলয় এটা বোঝে, কিন্তু বেহিসেবী বাচ্চা নিলয়ের কাছে মা মস্ত বড় অবলম্বন। আমি যেন ছেলেবেলায় ফিরে গেছি। জান, ভাইবোনদের মধ্যে মা আমাকেই সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। কম উৎপাত করেছি মা'র 'পরে। তারপর যখন বড় হলাম, বাবা রিটায়ার করলেন, বাড়ির কর্তা হয়ে দাদা আমাকে নিকম্মা-অপদার্থের সার্টিফিকেট দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল, তখনো মা আমাকে আগলে রাখতেন। মা পুরনো দিনের মানুষ, কিন্তু মনটা তাঁর অনেকের চাইতে নতুন, তাজা। বাবা মাকে বুঝতে পারেননি, দাদাকে বাদই দিলাম।

—তুমি মাকে বুঝতে পার বলেই মা তোমার কাছে এসেছেন। জান নিলয়, আমি খুব খুশি হয়েছি। ছেলেমানুষের মতো হলেও আমারও একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে। লোকে যখন দেখবে শুধু স্বামী নয় শাশুড়িও আমাকে ভালোবাসেন, ছেলের বৌকে আপন ভেবে তার কাছে এসে থাকছেন, এ যে আমার কত গর্বের… শোন, মাকে কিন্তু কালই ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

—হ্যাঁ, মা'র শরীরটা দেখলাম খুব খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলেন। আমি প্রশ্ন করে দুঃখ দিতে চাইনি। তুমি জান কি হয়েছে ?

—হ্যাঁ, পুনিয়া আমাকে বলেছে।

দাদার বাড়িতে মায়ের হেনস্তার বৃত্তান্ত নিনা শোনাল নিলয়কে। দরকার হলে পুনিয়া যে ওর কাছ থেকে মা'র চিকিৎসার জন্য টাকা নিতে বলেছে তাও জানাল।

—সত্যিকারের বোন আমার একটাই—পুনিয়া, সব শুনে নিলয় বলল, মায়ের পেটের বোনেরা যে যার মতো ভালো থাকতে ব্যস্ত। আসলে ওদের প্রাণ মন দুই-ই বড় ছোট। পুনিয়া একেবারে ওদের উলটো। ছেলেবেলায় ওর সঙ্গে আমার ভাব ছিল দারুণ। সব সময় টগবগ করত, দাপিয়ে বেড়াত। বাবলুকে বিয়ে করার আগেও একটা ছেলের প্রেমে পড়েছিল। এটুকুই ওর দোষ। নাম হয়ে গেল খারাপ মেয়ে। অথচ মানুষের বিপদে ওর মতো এগিয়ে যেতে পারে ক'জন। সকলেই ওর সাহায্য নেয়, আবার আড়ালে গালও দেয়। পুনিয়া ভ্রূক্ষেপ করে না। যারা ওর নিন্দে করে তাদের বিপদেও ছুটে যায়। বচন শোনাতেও ছাড়ে না, কটকট করে বলে দেয় যা মুখে আসে। অদ্ভুত মেয়ে।

—সম্পর্কে বোন না হলে ওকেই হয়তো তুমি বিয়ে করতে। হেসে বলল নিনা।

ঠাট্টা গায়ে না মেখে নিলয় বলল -হয়তো করতাম। তোমার সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে।

—তা-ই বল, ঠাট্টার জের টেনে নিনা বলল, তুমি পুনিয়াকেই ভালোবাসতে। আমি ওর আটপৌরে নকল, আসলকে না পেয়ে নকলকে জায়গা দিয়েছ।

—তবে রে ··

নিলয়ের অবাধ্য হাত দুটো নিনার শরীরের স্পর্শকাতর জায়গাগুলোতে দুরন্ত আক্রমণ শুরু করল।

—আস্তে, আস্তে, লক্ষ্মীটি···

নিনা উচ্ছল সমর্পণে এলিয়ে দিল শরীর। ঠোঁট দুটো এগিয়ে দিল নিলয়ের মুখের কাছে।

ছোট্ট ঘরটা উত্তাল সমুদ্রের মতো হয়ে গেল মুহূর্তে। ভালোবাসায় আশ্লিষ্ট দু'টি শরীরে রক্তের কলরোল দক্ষ শিল্পীর হাতে সেতারের ঝালার মতো বেজে উঠল।

মখমলের মতো কোমল ক্লান্তির আবেশ জড়ানো গলায় একসময় নিলয় বলল—মা তোমার ছেলের বৌয়ের জন্য যৌতুক এনেছেন।

—তার মানে ?

—দেখো কাল। আলমারিতে রাখা আছে।

—বলই না।

—মাকে বিয়ের সময় দাদামশায়ের দেয়া গয়না।

নিনা অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আমার বড্ড ভয় করছে।

—কেন ?

—অভাবের সময় যদি আমরা···

—নিজেদের ওপর সে বিশ্বাস কি নেই আমাদের ?

—আছে।···কিন্তু···

—কিন্তু নেই নিনা। ব্যাংকে যা আছে কাল তুলে নেব। তারপর দেখা যাবে

নিনার অগোছাল চুলের অরণ্যে মুখ লুকিয়ে চোখ বুজল নিলয়।

বাজার সেরে নিলয় খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিল। নিনা দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ের যোগান দিয়ে গেছে। বুকের নিচে বালিশ নিয়ে খাটের ওপর উপুড় হয়ে আছে নিলয়। সামনে খবরের কাগজ আর চায়ের পেয়ালা।

রান্নাঘরে নিশ্চিন্তে কাজ করছে নিনা। বাবুসোনাকে নিয়ে হাঁকডাক চেঁচামেচি নেই। বাইরের ঘরে ঠাম্মার সঙ্গে সে রীতিমতো ব্যস্ত। বন্ধুত্বটা নতুন, তাই পরিচয় মন-জানাজানির পালা চলছে। বাবুসোনা তার বিষয়সম্পত্তির সঙ্গে হাতে-কলমে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে ঠাম্মার। নেহাত প্রয়োজন না হলে মৌখিক শব্দের ব্যবহারে তার আগ্রহ কম। ঠোকাঠুকি-ভাঙচুরে যেটুকু শব্দ আর কি। মা নতুন বন্ধুর মন জয়ে নানান জারিজুরি খাটাচ্ছেন। তাতে ফলও ভালোই পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে অরুণকুমার সরে গেছে তৃতীয় পৃষ্ঠায়। পাঠকের আগ্রহের সঙ্গে তাল রেখে কাগজওলারা জায়গা ঠিক করে। অরুণকুমারের অবস্থার কোনো এদিক-ওদিক বা চমকপ্রদ পরিবর্তন না হওয়ায় পাঠকের আগ্রহ কমে আসাই স্বাভাবিক। মানুষের কৌতূহল বা আগ্রহ এমনই বস্তু যা নতুনত্ব না থাকলে অরুণকুমারের মতো ব্যক্তিকেও বেশিদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ধরে রাখতে পারে না। অবশ্য সাধারণ পাঠকের কৌতূহল নান্দনিক বা অ্যাকাডেমিক! শব্দ দু'টিতে কারো আপত্তি থাকলে বিকল্পের অভাবে আভিধানিক গুরুত্ব কমিয়ে নেয়া

যেতে পারে। তবে নিলয় ও আরো কয়েক হাজার মানুষের আগ্রহের কারণ যেহেতু একেবারে জীবিকার মূল জায়গাটার সঙ্গে জড়িত তাই তাদের আগ্রহে ঘাটতি নেই।

…অরুণকুমারের চিকিৎসকদের স্বাক্ষরিত স্বাস্থ্য-বুলেটিনে বলা হয়েছে তাঁর অবস্থার উল্লেখযোগ্য না হলেও সামান্য উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি তরল খাদ্য গ্রহণ করছেন। সামান্য শ্বাসকষ্ট আছে, তবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক। নিউ ইয়র্কের প্রখ্যাত দুই সার্জন ডক্টর লিও টয় ও ডক্টর টনি টাকলো আজ অরুণকুমারকে পরীক্ষা করেন। তাঁরা স্বাক্ষরকারী চিকিৎসকদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন। অরুণকুমারের চিকিৎসা নির্ভুলভাবে চলছে বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর জীবনের আশঙ্কা নেই বা পঙ্গু হয়ে যাওয়ার ভয়ও নেই বলে তাঁরা আশ্বাস দেন। তবে সুস্থ হয়ে কর্ম-জীবনে ফিরে আসতে দীর্ঘ সময় লাগবে। আপাতত এই চিকিৎসাই চলবে। তাঁর শারীরিক অবস্থার আরেকটু উন্নতি হওয়ার পর তাঁকে নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়ার বিষয় বিবেচনা করা হবে। সেখানে কয়েকটি বিশেষ পরীক্ষা ও আধুনিকতম চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই।…

বিশেষ প্রতিবেদক নিশান্ত সেনের সংযোজন: আমরাই প্রথম বলেছিলাম আমেরিকা থেকে দু'জন চিকিৎসক অরুণকুমারকে দেখতে আসছেন। তাঁরা এসেছেন। নিউ ইয়র্কের ডক্টর লিও টয় ও ডক্টর টনি টাকলো কাল এখানে পৌঁছেই বিমান-বন্দর থেকে সোজা চলে যান নার্সিং হোমে। তাঁরা চার ঘণ্টার ওপর সেখানে ছিলেন। অরুণকুমারের চিকিৎসদের সঙ্গে তাঁরা দীর্ঘ আলোচনা করেন, অরুণকুমারকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমরা জেনেছি ডক্টর টয় ও ডক্টর টাকলো তাঁদের প্রফেশনাল ফী নেননি। জানা গেছে এঁরা ক্যালিফোর্নিয়ার ভারতীয় যোগী শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরু মদনানন্দ যোগী মহারাজের সেক্সো-সোমাটিক-সাইকো-যোগিক কাল্টের সঙ্গে যুক্ত। অরুণকুমারও এই কাল্টের সভ্য এবং যোগী মহারাজের অন্যতম শিষ্য। তিনি যখনই আমেরিকা যান গুরুদেবের আশ্রমে কয়েকদিন কাটিয়ে আসেন। ডক্টর টয় ও ডক্টর টাকলোর যাতায়াত ও এখানকার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করছেন মহাগুরু দুঃস্থত্রাণ সংস্থা। এই সংবাদও বর্তমান প্রতিবেদক পাঠকদের আগেই জানিয়েছিলেন।

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে প্রখ্যাত শল্য-চিকিৎসক ডক্টর এন. এন. পরামাণিক যিনি জনস্বার্থে পাঁচজন চিকিৎসকের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন,

ডক্টর টয় ও ডক্টর টাকলো সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন কিসের ভিত্তিতে এঁরা অভিমত দিয়েছেন তা অরুণকুমারের চিকিৎসকরা তাঁদের বুলেটিনে বলেননি, কাজেই এঁদের অভিমতকে তিনি গুরুত্ব দিতে রাজী নন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, আমাদের পরাধীন মনোভাব এখনো ঘোচেনি, তাই দেশে বহু যোগ্য চিকিৎসক থাকা সত্ত্বেও বিদেশ থেকে সাদা চামড়ার ডাক্তার ভাড়া করে আনা হয়।...

হু। নিলয় খবরের কাগজটা ভাজ করে সরিয়ে রাখল। মোদ্দা ব্যাপার হচ্ছে অরুণকুমারের ফ্লোরে ফিরে আসতে অনেক দেরি। পরামার্শিক ডাক্তার পাত্তা না পেয়ে যা-ই বলুক, আমেরিকার ডাক্তাররা ছেলেখেলা করতে আসেনি। ওরা নিজের কাজটা অন্তত বোঝে। রুগীর নির্বুদ্ধিতাই ওদের আসল মূলধন নয়। যা হোক, একটা ভরসা ওরা দিয়েছে, অরুণকুমারের প্রাণের ভয় নেই। অরুণকুমারের সঙ্গে নিলয়ও আজ না হোক কাল ফ্লোরে ফিরে যেতে পারবে।

মা বাবুসোনাকে কোলে নিয়ে এ ঘরে এলেন।

—তুই আজ কাজে বেরুবি না নিলু?

—আমার কাজের বাঁধাধরা সময় নেই মা। রোজ কাজ থাকে না। আজ নেই। নিলয় বলতে গিয়ে সামান্য ইতস্তত করল।

এ সময় দরজার কলিং বেল বেজে উঠতে নিলয় স্বস্তি পেল। মা আবার কি গোলমেলে প্রশ্ন করে বসবেন কে জানে। মা'র সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চালিয়ে যেতেই হবে। নইলে তিনি হয়তো নিজেকে নিলয়ের একটা মস্ত বাড়তি বোঝা ভেবে কষ্ট পাবেন।

দরজা খুলে নিলয় দেখল ডক্টর দত্ত। এই আবাসনেই থাকেন। বাজার থেকে ফেরবার সময় নিলয় খবর দিয়ে এসেছিল। ডাক্তার হিসেবে মোটামুটি সুনাম আছে।

—বসুন ডাক্তারবাবু।

ডক্টর দত্তকে বসতে বলে নিলয় মাকে ডেকে আনতে গেল।

ও ঘরে গিয়ে বলল—মা এসো, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

—ডাক্তার কি হবে?

—সে আমি বুঝব। তুমি এসো। রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে বলল—নিনা, চা কর, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

—ডাক্তারবাবু, ইনি আমার মা। মা'র শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, খুব রোগা হয়ে গেছেন। দেখুন তো ভালো করে।

ডক্টর দত্ত তাঁর প্রতিবেশীদের সঙ্গেও বেশি বাক্যালাপ পছন্দ করেন না। সম্ভবত ঘনিষ্ঠতা লেনদেনে অসুবিধার সৃষ্টি করে।

তিনি সরাসরি কাজ শুরু করলেন—শুয়ে পড়ুন।

যত্ন করে অনেকক্ষণ ধরে মাকে পরীক্ষা করলেন ডক্টর দত্ত। দু'একটা প্রশ্নও করলেন।

উদ্‌বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে নিলয়।

পরীক্ষা শেষ করে ধীরে-সুস্থে অ্যাটাশে-কেস খুলে প্যাড বের করলেন ডক্টর দত্ত।

নিনা চা নিয়ে এল।

—আবার চা কেন্। ডক্‌টর দত্ত সৌজন্যেও গম্ভীর।

—সামান্য একটু চা—। নিনা যথোচিত হাসল।

—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু? নিলয় বলল।

—লিভারটা বেড়েছে, চায়ে চুমুক দিতে দিতে ডক্‌টর দত্ত বললেন, ম্যাল-নিউট্রিশন, অ্যানিমিয়া। বুকেও কনজেশন আছে। ভয় পাবার কারণ নেই, তবে চিকিৎসা চালাতে হবে। দু'চার দিনে রেজাল্ট আশা করবেন না। বয়স হয়েছে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুকের ফাঁকে ফাঁকে প্রেসক্রিপশন লিখতে লাগলেন ডক্‌টর দত্ত।

—ওষুধগুলো আজ থেকেই শুরু করে দিন। রক্তের কয়েকটা পরীক্ষা লিখে দিচ্ছি, ভালো জায়গা দেখে করিয়ে নেবেন। আচ্ছা, বাবু পাল স্ট্রীটের মুখে ডক্‌টর বর্মণের ক্লিনিকটা দেখেছেন?

—হ্যাঁ, কি নাম যেন···

—নিবারণ পলি-ক্লিনিক। ওখানে আমার প্রেসক্রিপশন দেখালেই হবে। বুকের একটা ছবিও করিয়ে নেয়া ভালো। কোথা থেকে তুলবেন আমি প্রেসক্রিপশনের পেছনে লিখে দিচ্ছি। ডায়েটের দিকটায় কিন্তু নজর দেবেন। হাই প্রোটিন—ছানা দুধ ডিম মাছ, চিকেনে আপত্তি না থাকলে সপ্তাহে দু'তিন দিন চিকেন—এই আর কি। ব্লাডের রিপোর্ট এক্স-রে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আচ্ছা, চলি—

'চলি' বললেন বটে ডক্‌টর দত্ত, কিন্তু ওঠার কোনো উদ্যোগ দেখা গেল না—সঙ্গত কারণেই।

—এক মিনিট ডাক্তারবাবু। বলে নিলয় নিনাকে ইশারায় ও ঘরে ডেকে নিয়ে গেল।

আলমারি খুলে নিনা জিজ্ঞেস করল—কত ?

—কুড়ি, নিলয় বলল, ব্যাংকের পাস-বই আর চেকবইটাও বের করে রেখো।

—ডাক্তারবাবু, আপনার ফীটা। দু'খানা দশটাকার নোট নিলয় ডক্তারবাবুর হাতে দিল।

—থ্যাংক ইউ। ডাক্তারবাবুর সতত গম্ভীর মুখে মুহূর্তের জন্য প্রসন্ন হাসি।

প্রসন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। বাস্তবিক মানুষ আজকাল বড় সুযোগসন্ধানী হয়ে উঠেছে। প্রতিবেশিত্ব বা পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে প্রফেশনাল ফী কম দেয়ার প্রবণতা ডাক্তারবাবু সহ্য করতে পারেন না। কোন্ ডাক্তার একশো টাকা ফী নেয়, মাসে রোজগার লক্ষ টাকা, কোন্ ব্যারিস্টার দাঁড়ালেই পাঁচ হাজার—সেটা বিচার্য নয়। আমার কাজের দাম আমি এই ধার্য করেছি, আমার কাজ নেয়া না-নেয়া তোমার ইচ্ছা, কিন্তু নিলে ধার্য দাম তোমাকে দিতেই হবে—তোমার হিসেবে যত বেশি বা অন্যায়ই হোক। ডক্টর দত্ত এখানকার লোকদের প্রতিবেশিত্বের সুযোগে কম দেয়া অপছন্দ করেন। এ ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান আছে দেখে তিনি খুশি হলেন। উঠতে উঠতে ডক্টর দত্ত বললেন—চিন্তার কারণ নেই। সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমি তো আছিই—

ও ঘরে নিনা তখন মায়ের গয়নার পুঁটলিটা হাতে নিয়ে দেখছিল।

৯

জগদীশদাকে ওরা দল বেঁধে পাকড়াও করেছে। যজ্ঞেশ্বর অনিল ও আরো তিনজন।

অনুরাধা স্টুডিওর লনে বসেছিল ওরা। সন্ধ্যে হয় হয়। রামদা'র দোকানে ঝাঁপ পড়ে গেছে। খদ্দের-পত্র তেমন নেই, মিছেমিছি কয়লা পুড়িয়ে কি হবে। দোকান বন্ধ করে চলে গেছে। ওরা লনে বসে এলোমেলো আলোচনা করছিল। জগদীশদা ল্যাবোরেটরিতে এসেছিল কাজে। তাকে টেনে বসিয়েছে ফেরার পথে।

—তারপর, কিসের গ্যাজালি চলছিল তোদের ? বিড়ি ধরিয়ে জগদীশদা বলল, রামদা'র দোকান তো বন্ধ। চা খেতে পারলে হত। যাকগে।

যজ্ঞেশ্বর বলল—হালচাল কি বুঝছেন জগদীশদা ?

—তুই যা বুঝছিস আমিও তা ই বুঝছি।

—খবরের কাগজ দেখে মনে হচ্ছে অরুণকুমার শিগগির উঠবে না।

—তা-ই মনে হচ্ছে।

—কি হবে জগদীশদা? অনিল বলল।

—কেন, অরুণকুমার যখন আসেনি তখন কি ছবি তৈরি হত না?

যজ্ঞেশ্বর: হত। তবে তখন দিনকাল ছিল আলাদা। মানুষ এখনকার মতো ছিল না। পুরনো আমলের ছবি কয়েকখানা দেখেছি, শুনেছি দারুণ চলেছিল। টেকনিক্যাল সাইড, অ্যাকটিং এখনকার ছবির সঙ্গে তুলনা করলে হাসি পায়। ভেবেছি, লোকে তাহলে ছবিগুলো নিয়েছিল কেন!

জগদীশ: টেকনিক্যাল কাজ, অ্যাকটিংয়ের ধাঁচ রোজই পালটাচ্ছে, উন্নতি হচ্ছে। আজ যা নতুন কাল তা-ই পুরনো। তখনকার দিনে ঐ অ্যাকটিংই ছিল নতুন, ঐ সেকেলে ক্যামেরার কাজই লোকের চোখে চমক লাগাত।

যজ্ঞেশ্বর: আমিও তাই বলতে চাই। অ্যাকটিং, টেকনিক্যাল কাজ যে সময়ের যেটা সেই সময়ে সেটাই নতুন। তাহলে আমাদের তৈরি ছবি এখন চলতে চায় না কেন? আসলে মানুষই নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে।

জগদীশদা: ওঃ, আমরা যেন কত রুচিওলা ছবি তৈরি করছি! না, না, ওসব ধারণা ছেড়ে দে। শোন্, আমার ছেলেবেলায় খুব অ্যাক্টো করার শখ ছিল। সন্তোষ গোঁসাইয়ের নাম নিশ্চয়ই শুনেছিস। ওঁর কাছে তালিম নেবার সুযোগ পেয়েছিলাম। উনি বলতেন, স্টেজে যখন দাঁড়াবি মনে করবি তোর সামনে একপাল ভেড়া বসে আছে। ওঁর বলার উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে নিজের মনটাকে তৈরি করে নিতে পারলে নার্ভাসনেস আসবে না। ছবি যারা তৈরি করে তারাও দর্শককে ভেড়ার পাল মনে করে, তবে তাদের উদ্দেশ্যটা আলাদা। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই কিছু লোককে বাদ দিলে আমরা ভেড়ারই পাল। এমন জিনিস তৈরি কর যা তৈরি করতে মগজ লাগে না, ভেড়ার পালও গিলবে হাই হাই করে। এখন চলছে ভেড়ার পালের খাদ্য তৈরি করার কমপিটিশন, তাতে আমরা হেরে যাচ্ছি—বেশি টাকার সঙ্গে কম টাকা কোনোদিনই পারে না। আমরা খড়কুটো আঁকড়ে ধরে টিকে থাকার চেষ্টা করছি এই পর্যন্ত।

যজ্ঞেশ্বর: মানুষকে আণ্ডার-এস্টিমেট করা হল না?

জগদীশ: না, মানুষ সাধারণভাবে ভালো, সে ভালোটা কাছের লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশায় চলা-বলায়। কিন্তু ভালো-লাগা জিনিসটা অন্যরকম, সেখানে

ভালো-মন্দ দেশ ভবিষ্যতের চিন্তা ক'জনের মাথায় থাকে? মানুষের রুচি তৈরি করে মানুষেই, তেমন মানুষ আমাদের দেশে ক'টা? এরা উঠে আসুক তা নিশ্চয়ই দেশের মাথারা চায় না। তাহলে তো নোংরা জিনিস এরাই বন্ধ করে দিত। যাক, তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নয়। আমাদের পেট চালানোই সমস্যা। আমার জন্য ভাবি না, যেমন-তেমন করে চলে যাবে। তোরা যে কি করবি···। নতুন তিন চারখানা ছবির কাজ শুরু হবে শুনছি। তোরা শুনেছিস?

অনিল: না। হলেও পাত্তা পাব না।

জগদীশ: তা ঠিক। এত লোক কাজ খুঁজছে, কাজ কোথায়?

যজ্ঞেশ্বর: আচ্ছা জগদীশদা, ফিল্ম-লাইনে আমরা যারা ছোটখাট কাজ করি তারা মিলে কো-অপারেটিভ করে যদি ছবি করি?

জগদীশ: অসম্ভব। ছোটখাট ব্যবসা কো-অপারেটিভ করে চালানো যায়, কিন্তু তোদের ফাইনান্স জোগাড় করা অসম্ভব। তুই হয়তো বলবি ব্যাংকের লোন, সরকারী গ্রান্ট—এগুলো শুনতেই ভালো। ব্যাংকের লোন শোধ দিতে হবে, ছবি যদি ফ্লপ হল, ব্যস্, হয়ে গেল। সরকার গ্রান্ট একবার দিতে পারে, বারবার দেবে না। শেষ পর্যন্ত একখানা ছবিতেই কো-অপারেটিভও শেষ। এ পুরো ফাটকা খেলা, বড়লোকের খেলা। মিথ্যে খাটুনি সার হবে তোদের। এ জিনিস এ দেশে কোথাও হয়েছে বলে শুনিনি।

সহদেব নিতাই বংশী চুপচাপ শুনছিল।

বংশী এবার বলল—যা দাঁড়াচ্ছে আমাদের অন্য ধান্দা দেখতে হবে।

জগদীশদা অল্পক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবল, তারপর বলল—দেখ্, পারলে ভালো। এ লাইনে তোরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজ জানিস, চেনাজানাও অল্পবিস্তর আছে। অন্য কাজ জুটিয়ে নিতে পারিস ভালো। আজকাল খুব কম লোকই ইচ্ছে করলে একটা ছেড়ে আরেকটা কাজ ধরতে পারে। তাছাড়া

কথাটা শেষ না করে জগদীশদা কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল।

যজ্ঞেশ্বর একটু অপেক্ষা করে বলল—তাছাড়া কি জগদীশদা?

—যজ্ঞেশ্বর, আমিও আগে মাঝে মাঝে ভাবতাম কি হবে ফিল্ম-লাইনে পড়ে থেকে। যা আমি হয়েছি তার বেশি কিছু হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। তার চেয়ে বরং একটা পাকা চাকরি দেখে নেয়া ভালো। চেষ্টা করলে পেয়েও যেতাম। তখন দিনকাল এত খারাপ ছিল না, মুরুব্বীও ছিল আমার। কিন্তু পারিনি লাইন

ছাড়তে। এ শালা বড় বাজে লাইন, বড় বাজে নেশা। নেশা যদি তোদের না ধরে থাকে খুব ভালো।

জগদীশদার বিড়ি নিভে গিয়েছিল। আরেকটা ধরিয়ে টানতে থাকল। আর যজ্ঞেশ্বর অনিল সহদেব নিতাই বংশীরা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে কি যেন সন্ধান করতে লাগল একে অন্যের মুখে।

সহদেব টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর।

নিতাই বংশীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বিড়ি বের করে নিয়ে বলল—একটাই ছিল। নিলাম।

—নে। বংশী বলল।

ফস্ করে দেশলাই জেলে বিড়ি ধরাল নিতাই।

একটা ঘাস তুলে নিয়ে গোড়াটা দাঁতে কাটছে অনিল।

—ও, জগদীশদা পকেট থেকে বিড়ির কৌটো বের করে ওদের মাঝখানে রাখল, নে, নে, মনেই ছিল না যে তোদেরও চলে।

যজ্ঞেশ্বর ছাড়া সবাই বিড়ি নিল কৌটো থেকে। ওর বিড়ি-সিগারেটের নেশা নেই।

জগদীশদা একসময় বলল—সবার ভাবনা ভেবে আমরা কোনো সুরাহা করতে পারব না। তার চেয়ে স্বার্থপরের মতো নিজেদের, মানে, কাছের কজনার জন্যে ভাবাই বুদ্ধিমানের কাজ। এক দঙ্গল মানুষকে জড়িয়ে এত বড় সমস্যার সমাধান আমরা তো করতে পারব না। চাচা আপন বাঁচা নীতিই নিতে হবে। দেখি, নতুন ছবির কাজে আমাকে যদি ডাকে তোদের নেবার জন্য বলব।

যজ্ঞেশ্বর জগদীশদার বক্তব্য তুলে নিল—ঠিকই। ওসব নেহাতই আলোচনা, আলোচনাতেই শেষ। কিন্তু এভাবে তো সংসার চলে না জগদীশদা। পাশাপাশি অন্য কাজ না ধরলে কারোই চলছে না।

—আমার দেনা হয়ে গেছে দেড় হাজার। কি করে শোধ হবে মা ভগা জানে। বলে সহদেব পাশ ফিরল।

বিড়িতে আঙুল-পোড়ানো টান দিল নিতাই—আমার ন'শো। খিটকেল কাবলিওলা। সুদ দয়া করে মাসে পঞ্চাশ টাকা। দিতে পারছি না। পালিয়ে বেড়াই, বাড়িতে থাকি না। শালা সেদিন বৌকে খিস্তি করে গেছে।

যজ্ঞেশ্বর : ফিরিস্তি জগদীশদার জানা আছে। আমরা বসে বলাবলি করছিলাম রোজগার যেমন করেই হোক বাড়াতে হবে।

জগদীশ : অনেক ছেলেকে আজকাল নানারকম টুকটাক কাজ করতে দেখি। বাঙালীর ছেলেরা আগে এসব কাজের নাম শুনলে নাক সিঁটকত। এখন গুণ্ডামি মস্তানি যেমন বেড়েছে, ছেলেদের লজ্জা ভয় ছেড়ে নতুন নতুন কাজ করার ইচ্ছেও বেড়েছে। এটা ভালো।

যজ্ঞেশ্বর : এই সহদেব, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? কি বলছিলি তখন বল্ না জগদীশদাকে।

উঠে বসল সহদেব। —বলছিলাম আমরা পাঁচজনে যদি দুটো স্ন্যাক-বার চালাই কেমন হয়?

জগদীশ : স্ন্যাক-বার?

সহদেব : রাস্তার ধারে চাকাওলা গাড়িতে রোল-টোল গরম গরম ভেজে দেয় দেখেন না? খুব চলছে। হোটেল-রেস্টুরেন্টে যা দাম, লোকে ভালোমন্দ খেতে খুব ভিড় করে এসব দোকানে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে খেতে ভদ্রঘরের মেয়েরাও এখন লজ্জা পায় না।

মিনিট খানেক ভেবে জগদীশদা বলল—মন্দ বলিসনি। কিন্তু তোদের কারো কি এ কাজের অভিজ্ঞতা আছে?

সহদেব : নিতাই কিছুদিন হোটেলে রাঁধুনির অ্যাসিসট্যান্টের কাজ করেছিল। ও চপ কাটলেট রোল মোগলাই পরোটা বানাতে জানে। ওর কাছ থেকে শিখে নেব।

জগদীশ : কিরে নিতাই, পারবি ওদের শিখিয়ে নিতে?

নিতাই : হাতে-কলমে কাজ। করতে করতে শেখা হয়ে যাবে।

যজ্ঞেশ্বর : কাজটা শিখে নিতে পারলে, আমরা ভাবছিলাম, সবার সবদিন স্টুডিওতে কাজ থাকবে না, দুটো ছোকরা রেখে দিলে চালানো শক্ত নয়।

বংশী : ফিলিম আমার ভালো লাগছে না জগদীশদা। যদি চলে আমি পুরোপুরি এ কাজে নেমে যাব।

জগদীশ : তবে আর কি, লেগে যা।

যজ্ঞেশ্বর : ঝামেলা আছে। সুবিধেমতো জায়গা পাওয়া চাই। কর্পোরেশন পুলিস···হাজার ছয়েক মূলধন লাগবে···জোগাড় করাই সমস্যা ··

—হুঁ। শব্দটা করে জগদীশদা নিজের মধ্যে ডুবে গেল।

কর্পোরেশনে সুরেনবাবু আছে। বুঝিয়ে বললে কমের মধ্যে ব্যবস্থা করে দেবে। পুলিস সমস্যা নয়। পুলিস সমস্যা হলে ফুটপাথে হাজার হাজার দোকান চলতে পারত

না। আসল সমস্যা ছ'হাজার টাকা। কে দেবে ওদের এত টাকা? দু-চার-ছ'শো হলে এক্ষুনি জোগাড় হয়ে যেত। ওহ্‌হো, হঠাৎ জগদীশদার মনে পড়ল নর্দার্ন ব্যাংকের ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার তপনবাবুকে। ভদ্রলোকের বাড়ি, গাড়ি, মোটা মাইনে, সুন্দরী স্ত্রী, মাপা দু'টি ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও মনে শান্তি ছিল না। এমন বহু মানুষ দেখেছে জগদীশদা যাদের সিনেমায় মুখ দেখানোর জন্যে আদেখলেপনার শেষ নেই। জগদীশদার সঙ্গে আলাপ হতে যেই তপনবাবু শুনেছিল যে সে ফিল্ম লাইনের লোক অমনি অমন গুরুগম্ভীর ভারিক্কে লোকটারও সে হয়ে গিয়েছিল জগদীশদা। তারপর বাচ্চা ছেলের মতো আরজি পেশ—আবদার। জগদীশদার মাথায়ও লোকটাকে হাতে রাখার হিসেব ছিল। তাই তপনবাবু দুটো ছবিতে আড়াই থেকে তিন লাইন জনতা-পার্ট বলার সুযোগ পেয়েছিল। আহা, কি তৃপ্তি, কি আনন্দ, কি চরিতার্থতা! কৃতজ্ঞতার ঋণ আজও ভোলেনি তপনবাবু। অতএব সেই কৃতজ্ঞতার ঋণের রাস্তা দিয়েই ব্যাংক থেকে এদের ছ'হাজার টাকা ঋণের ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।

—শোন্, জগদীশদা নীরবতা ভঙ্গ করল, তোরা খোঁজখবর নিয়ে তৈরি হ। টাকা জোগাড় করে দেবার দায়িত্ব আমার, শোধ করার দায়িত্ব তোদের। মেরেও দিতে পারিস, ও টাকা মারলে দোষ নেই, শুধু মারবার কায়দা কোনো ওস্তাদের কাছ থেকে জেনে নিস।

—সে আবার কি! অনিলের বুদ্ধি কিঞ্চিৎ গোলা, সে বিস্মিত।

—তোর অত বুঝে দরকার নেই, জগদীশদা হাসল, তোরা বরং আস্তে আস্তে শোধই করে দিস। গরিবের সৎ থাকাই ভালো। কর্পোরেশনের ভারও আমি নিচ্ছি। পুলিসের জন্য ভাবনা নেই, ওরা ভালোবেসেই তোদের ভার নেবে। ···হ্যাঁ, নিলয়কে তোদের সঙ্গে নিতে আপত্তি আছে?

সরাসরি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যজ্ঞেশ্বর বলল—সেদিন নিলয়বাবু এসেছিল স্টুডিওতে।

—কেন?

—জানি না। হতে পারে কাজ-টাজের খোঁজে। রামদা'র দোকানে আমি অনিল আর ভোলাদা বসেছিলাম। আমাদের সঙ্গে আধঘণ্টা ছিল। দারোয়ান বলছিল, বাগুো সাহেবের কাছেও নাকি গিয়েছিল।

—কথা-টথা কি হল? জিজ্ঞেস করল জগদীশদা।

—বিশেষ কিছু না। এটা-সেটা সাত-সতেরো।

জগদীশদা বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেবার জন্য আবার বিড়ি ধরাল। ব্যাঙের সঙ্গে নিলয়ের কি দরকার থাকতে পারে? ছোঁড়াটা নিজের বুদ্ধি খাটাতে গিয়ে ফ্যাসাদে না পড়ে। নাঃ, কালই যেতে হবে ওর বাড়িতে।

—নিলয়দা এ কাজ করবেই না। অনিল বলে উঠল আচমকা।

—কেন, করবে না কেন? জগদীশদা মুখ ঘোরাল ওর দিকে।

—ওর মাথামাথি ওপরে। সহদেব বলল।

—অনেক জানিস দেখছি, ঠাট্টার সুর জগদীশদার গলায়, তোরাও তো, বাইরের লোকেরা ভাবে ফিলিমে কাজ করিস, কি না কি ফিলিম ব্যাপারটাই ঐ রকম. বুঝলি?

—বাদ দিন ওসব, যজ্ঞেশ্বর বলল, নিলয়বাবু আসতে চাইলে আমাদের আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না। ভালোই তো।

যতই জোর দিয়ে তার সম্মতি জানাক যজ্ঞেশ্বর, একটা আড়াল কিন্তু থেকেই যাচ্ছে. জগদীশদার কানে সেটা ধরা পড়ল। অন্যের জায়গাটা মানুষ খতিয়ে বুঝতে চায় না. ওপর ওপর দেখাটাই মনে করে নির্ভুল। নিজের জায়গাটাই বা বোঝে ক'জন? যাকগে, কাজের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে ঠিক হয়ে যাবে। মনকে আশ্বাস দিল জগদীশদা।

ঝুপ্ করে লোড-শেডিং নেমে এল। আশপাশের বাড়িগুলোর জানলার আলো নিভে যেতে ভুতুড়ে বাড়ির মতো দেখাতে লাগল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার চারধার।

—ঘণ্টা তিনেকের ধাক্কা, যজ্ঞেশ্বর বলল, উঠে পড়া যাক।

—হ্যাঁ, জগদীশদা উঠতে উঠতে বলল, তোরা কাজ শুরু করে দে। আমার যা করবার করে দেব। আটকাবে না। মানুষ লড়ছে দেখলে আমার ভালো লাগে।

ওরা জগদীশদাকে সামনে রেখে ঘন হয়ে হাঁটতে লাগল। কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু বিশ্বাস করা যায় এমন একজন দুর্লভ মানুষের সঙ্গে পথ হাঁটার আনন্দ বোধ হয় ওদের সকলেরই মনে।

দরজা খুলে জগদীশদাকে দেখে নিনা বলল—কে আসতে বলেছিল আপনাকে?

—কে আবার বলবে, নিজেই এলাম। জগদীশদা হেসে বলল।

—ঘোড়ার ডিম।

—আরে পাগলি, একেবারে সময় পাই না। জগদীশদা চৌকিতে বসল।

—নিজের কাজের সময় পান, এর-তার ব্যাপার খাটবার সময় পান, আমাদের বেলায়ই সময় পান না। যত দরদ মুখেই।

জগদীশদার গলার আওয়াজ পেয়ে নিলয় এর মধ্যে এ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

—দেখ, নিলয়, আসতে না আসতেই ঝগড়া শুরু করেছে তোর বৌ।

—আপনাদের ভাই-বোনের ব্যাপার, আপনারা বুঝুন। নিলয় বলল হাসি-হাসি মুখে।

—হুঁ, বৌয়ের দোষ দেখতে পাবি কেন। ছেলেগুলো বিয়ের পর কেমন যেন হয়ে যায়।

—এই—এই—। ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে নিনা জগদীশদাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করল ও ঘরের দিকে দেখিয়ে।

—কি ব্যাপার? জগদীশদা গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—আমার মা। মা, মা—। নিলয় মাকে ডাকল।

জগদীশদা মুখে প্রশ্নের ভঙ্গি নিয়ে তাকাল।

—মা এখন আমাদের কাছে থাকছেন। নিনা আস্তে বলল।

বাবুসোনাকে কোলে নিয়ে মা এলেন। জগদীশদা উঠে দাঁড়াল।

—আমার মা, নিলয় পরিচয় করিয়ে দিল, মা, ইনি জগদীশদা, আমাদের দাদার মতো। এঁরই দয়ায় আমাদের যা কিছু।

—তুই বড্ড বাড়িয়ে বলিস নিলয়। পায়ে হাত দিয়ে মাকে প্রণাম করতে করতে জগদীশদা বলল।

—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা, মা বললেন, নিলু তোমার কথা আমাকে বলেছে। তুমি ওকে দেখো বাবা। তুমিই ওর সত্যিকারের অভিভাবক।

—মস্ত বড় দায়িত্ব দিলেন মাসিমা। আমার কাঁধে কি অত জোর আছে?

—আছে বাবা। নইলে সবাই তোমার কাছে ছোটে?

—যেখানে কোনো ভরসাই নেই মাসিমা, সেখানে লোকে তাবিজ কবচ মাদুলি জলপড়া লটারির টিকিটেও ভরসা খোঁজে। আমিও সেই রকম। কই রে নিনা, চা খাওয়াবি না?

—আর কি খাবেন বলুন। নিনা বলল।

—কিচ্ছু না। ফার্স্ট ক্লাস করে এক কাপ চা, ব্যস্, পকেট থেকে একটা চকোলেট

বের করে বাবুসোনার হাতে দিয়ে জগদীশদা ওকে কোলে নেবার জন্ম হাত বাড়াল, এই যে ভাগ্নে কানাই, এসো, আমার কোলে এসো।

চকোলেট নিতে বাবুসোনার আপত্তি ছিল না, কিন্তু জগদীশদার কোলে যেতে দেখা গেল রীতিমতো আপত্তি।

নিলয় মা'র কোল থেকে বাবুসোনাকে নিয়ে বলল—মা, তোমার দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, তুমি বরং ও ঘরে গিয়ে বসো।

মা চলে গেলেন।

জগদীশদা আবার হাত বাড়াল। কিন্তু বাবুসোনার মনোযোগ চকোলেটে, জগদীশদার বাড়ানো হাতকে আমল দিল না।

—নিনা, দেখছিস তোর ছেলের কাণ্ড। আমাকে পাত্তাই দিচ্ছে না।

ঠিক করেছে। আসেন না কেন? ন'মাসে ছ'মাসে একদিন এসে চকোলেট ঘুষ দিলেই কাজ হবে?

—আচ্ছা ট্রেনিং দিয়েছিস ছেলেকে। ঘুষও নেয়, কাজও করে না, এ কেমন ছেলে রে! অবিশ্যি ছেলে তোর দেশের হাওয়া মেনেই চলছে। জগদীশদা হা হা করে হাসল।

—এর পর আমিও তা-ই করব। নিনা বলল।

—তোকে তো ঘুষ দেয়া হয়েই গেছে।

—কই আর দিলেন?

—কেন, নিলয়।

—যাঃ। যাই, আপনার চা করে আনি। পালাই পালাই করবেন না যেন। নিনা চলে গেল রান্নাঘরে।

নিলয় বাবুসোনাকে মা'র কাছে দিয়ে এসে জগদীশদার পাশে বসল।

—তুই সেদিন ব্যাণ্ডোর কাছে গিয়েছিলি শুনলাম। ও ঘরের দিকে চোখ রেখে খুব নিচু গলায় জগদীশদা বলল।

—হ্যাঁ। নিলয় মেঝেতে চোখ রাখল।

—কেন?

—সেদিনকার শটগুলো ব্যাণ্ডোদার কাছে আছে। সাজানোও হয়ে গেছে।

—সে তো হল। তোর তাতে কি দরকার?

—ঐ সিনের একটা প্রোজেকশন দেখতে চেয়েছিলাম।

—ব্যাঙ্গো দেখাল ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তোর হঠাৎ ওটা দেখার কি দরকার পড়ল ?

—এমন বিশ্রী অবস্থা চলছে···আমার যেন নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছে···

—দেখে কি সেটা মন থেকে দূর হল ?

—না···মানে···

—ব্যাঙ্গোর কাছে যাওয়া তোর ঠিক হয়নি। স্টুডিওর অনেকেই এর মধ্যে জেনে ফেলেছে তুই ব্যাঙ্গোর কাছে গিয়েছিলি। যা করে ফেলেছিস তা আর ফেরানো যাবে না। জানিস, এ নিয়ে কত রকম ঘোঁট হতে পারে ? আরে বাবা, এ লাইনের মতো কেচ্ছা কানাকানি মিথ্যের কারবার কোথাও নেই। কত লোক স্রেফ কেচ্ছা বানিয়ে বেঁচে আছে। সাবধানে পা ফেলতে শেখ্। আমাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না, যা খুশিই করি না কেন। কিন্তু মনে রাখিস, তুই অরুণকুমারের ডামি।

নিলয় না-বোঝার দৃষ্টিতে তাকাল।

—গাধা কোথাকার, জগদীশদা হতাশভাবে বলল, তোর সঙ্গে দরকারী আলোচনা আছে। রাস্তায় বেরিয়ে বলব।

এ ধরনের কথা জগদীশদা আগেও বলেছে, নিলয় ভাবল, এবং ফিল্ম-লাইনের হালচাল যে সে একেবারে জানে না তাও নয়। তাকে নিয়ে এত সাবধানতা কেন জগদীশদার ? অরুণকুমারের ডামির কাজ সে অনেকদিনই করছে। লোকের যত মাথাব্যথা অরুণকুমারের জন্য। অরুণকুমারের লাখ লাখ ফ্যানের ক জন নিলয়ের খবর জানে ? জানলেও কি তাদের বিন্দুমাত্র কৌতূহল আছে তার সম্পর্কে ? ভেতরের কায়দাও হচ্ছে তাকে আড়ালে রাখবার। যেজন্য নিলয় মজুমদার নামটা কখনো ছবির ভূমিকা-লিপিতে ওঠেনি। যে নাম তার হতে পারে না, যে নামে তাকে কেউ চিনবে না, সেই রকম একটা নাম, যা মানুষের এমন কি কুকুরের হলেও নির্বিশেষ, বা বাচ্চার হাতে চুষিকাঠির মতো, তাকে দেয়া আছে।

ওরা বিলক্ষণ জানে এ নামের দাবিদার হওয়া নিলয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। লোকে বিশ্বাস করবে না। নিজের সত্যিকারের দাম নিলয়ের জানতে বাকি নেই। আর্টিস্টদের নানারকম দর আছে—বাজারদর ছাড়াও—যেমন গ্ল্যামার, অ্যাপীল ইত্যাদি ইত্যাদি। নিলয়ের দর একটাই—সামান্য বাজারদর—যার ওঠা-নামাও সামান্যই। অরুণকুমারের মতো নিজের ইচ্ছাতেই ওঠানো-নামানোও যায় না। তাহলে হঠাৎ এমন কি-দর

ব্যক্তির কি দর তৈরি হল? স্কাণ্ডাল-ভ্যালু বলে কোনো শব্দ আছে কি? আছে হয়তো বড়দের শাস্ত্রে। কিন্তু নিলয়ের বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না সে কেমন করে এর আওতায় আসতে পারে।

জগদীশদা বিড়ি টানছিল।

নিনা ট্রেতে দু'কাপ চা আর প্লেটে চানাচুর নিয়ে ঘরে ঢুকেই নাক কুঁচকে বলল—ইস্, বিড়ির কি গন্ধ।

জগদীশদা নির্বিকার।—কি আর করবি বোন, গরিব দাদার বিড়িই সম্বল। এই, চানাচুর আবার কেন?

—শুধু চা আমি দিতে পারব না, নিনা চৌকির ওপর ট্রে নামিয়ে রাখল, খেলে খান, না খেলে ফেলে দিন।

—একেবারে মিলিটারি, জগদীশদা হাসল, খাচ্ছি রে বাবা খাচ্ছি। নিলয়ের ওপর কি জবরদস্তি হয় বুঝতে পারছি।

—জিজ্ঞেস করেই দেখুন না। নিনার ভ্রূ বাঁকা হল।

জগদীশদা চানাচুর চিবোতে চিবোতে বলল—তোর সামনে ভয়ে সত্যি বলবে নাকি?

—তাহলে আড়ালেই জিজ্ঞেস করবেন।

—তা-ই করতে হবে। মাসিমা ওর দেখভাল করবার দায়িত্ব যখন আমাকেই দিয়েছেন…

চা হাসি-আহ্লাদ গল্প-গুজবে খানিকটা সময় কাটিয়ে জগদীশদা বলল—আজ উঠতে হয় বোনটি।

নিনার ইচ্ছা ছিল জগদীশদাকে খেয়ে যেতে বলার। কিন্তু পয়সাকড়ির অবস্থা ভেবে বলতে সাহস করেনি। লোকের সামনে শুধু ভাত ডাল তরকারি আর দেড় ইঞ্চি সাইজের দু'খানা ট্যাংরা মাছের ঝাল ধরে দেয়া যায় না।

—আবার ক'মাস পরে আসবেন? নিনা কপাল কুঁচকে বলল।

—বড্ড ঝগড়াটি হয়েছিস, আগে এমন ছিলি না। আসব রে আসব, সময় পেলেই চলে আসব। চল্ নিলয়, আমাকে এগিয়ে দিবি।

রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একবার এপাশ-ওপাশ দেখে নিয়ে জগদীশদা বলতে লাগল—দেখ, নিলয়, তুই নিজেও জানিস ঘটনাটা অ্যাকসিডেন্ট। অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। বোকার মতো লোককে অন্যরকম সন্দেহ করবার সুযোগ করে

দিচ্ছিস কেন? প্রথম থেকেই গুনগুন চলছিল। তোর উচিত ছিল একদম বোক সেজে থাকা। ব্যাণ্ডোর কাছে গিয়ে কি করেছিস বুঝতে পারছিস? তোর মনের অবস্থা বোঝার দায় কারো নেই। বরং উলটোপালটা গবেষণা করার সুযোগ করে দিলি। এমন বোকামি আর ভুলেও করিস না।···আচ্ছা, মাসিমা কি এখন তোর কাছেই থাকবেন?

—হ্যাঁ, দাদা মা'র সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করছিল। বৌদিও সরেস। মা'র শরীর ভালো নয়। চিকিৎসা হচ্ছিল না। আমার মামাতো বোন পুন্তি দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে মাকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে মা আমাদের কাছে বেশ খুশিতেই আছেন।

—একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তোদের দারুণ জিত।

—নিশ্চয়ই। নিনাও খুব খুশি। পয়সাকড়ির টানাটানি এ সময়েই শুরু না হলে আমাদের সত্যিই ভারি আনন্দ হত। মার চিকিৎসায় অনেক টাকা এর মধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। ডাক্তার বলছে কিছুদিন চিকিৎসা চালাতে হবে। এক বাঁচোয় রোগটা টি. বি. নয়। ডাক্তার প্রথমে সেই রকম সন্দেহ করেছিল। এক্সরে-তে পাওয়া যায়নি তাই রক্ষে।

—এত খরচ চলছে কি করে? সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল জগদীশদা।

—ব্যাংকে দশ টাকা রেখে বাকিটা তুলে নিয়েছি। চারশো তিরিশ টাকা নিনাকে এক ভরির একটা সরু হার দিয়েছিলাম, ওকে দেয়া আমার একমাত্র গয়না। হারটা বন্ধক রেখে পেয়েছি বারোশো টাকা। যে রেটে খরচ হচ্ছে এ টাকা শেষ হতে বেশিদিন লাগবে না। তারপরে কি হবে জানি না। পাঁচ হাজার টাকার মতো পেমেণ্ট আমার পাওনা, দু'এক জায়গায় চেষ্টা করেছি, সকলেই পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। আর গয়না বলতে নিনার আছে কানে দুটো রিং, হাতে দু'গাছা করে চুড়ি। পেমেণ্ট-গুলো না পেলে···

—ওগুলোও বিক্রি করতে হবে না হয় বন্ধক দিতে হবে। তাতে আর ক'টাকা পাবি? ক'দিন চলবে? অরুণকুমার কাজ না শুরু করতে পেমেণ্টও কেউ ছাড়বে না। তোর ছবি মানেই অরুণকুমারের ছবি ছবি শেষ করতে পারবে কিনা তাই নিয়ে এখন ওদের চিন্তা। যদি শেষ করতে না পারে তাহলে যাদের যাদের টাকা মেরে দিতে অসুবিধা নেই তাদের টাকা ওরা মেরে দেবেই। তোর তো আর কোর্টে গিয়ে টাকা আদায় করার মুরোদ নেই। ঢাকের দায়ে মনসা বিকোবে।

—কি যে করি···

—যা হোক করতেই হবে। যজ্ঞেশ্বর অনিল সহদেবরা মিলে দুটো স্ন্যাক-বার খুলবে ভাবছে।

—রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে চপ কাটলেট ভেজে বিক্রি করা?

—হ্যাঁ, ব্যবসাটা চলে ভালো। আমি দেখেছি। তা, দুটোর জায়গায় তিনটেও দেয়া যায়। তোকে নিতে ওরা রাজী আছে। ওরা পাঁচজন, তুই এলে ছ'জন। দু'জনে একটা করে চালাবি। ওদের বলেছি ব্যাংক থেকে লোনের ব্যবস্থা আমি করে দেব। গুছিয়ে নিতে মাস খানেক। একমাস কোনোরকমে চালিয়ে নে, তারপর শুরু করে দে। বুঝে-সুঝে চালাতে পারলে মন্দ হবে না। পরে না হয় ওটা সাইড ইনকাম হিসেবেই থাকবে।

নিলয় নিরুত্তরে হেঁটে চলল অনেকক্ষণ, তারপর কুণ্ঠার সঙ্গে বলল—কিছুদিন দেখা ভালো না? যদি···

বড় দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল জগদীশদার। কিন্তু একই সঙ্গে হাসি এবং একটা তিক্ত মন্তব্য চেপে সে বলল—তখন সুযোগ না-ও থাকতে পারে। তাড়াহুড়ো নেই, ভেবে দেখ্।

বাস এসে গিয়েছিল। 'চলি রে' বলে জগদীশদা বাসে উঠে পড়ল।

১০

ট্যাক্সিতে তুরুপ সেন আর জ্যাকি খাম্বাটা। ওরা যাচ্ছে নিলয়ের বাড়ি। মেজাজ খুশ। কারণ তুরুপ কায়দা করেই জমি তৈরি করেছে। নিলয় যাতে ফেরাতে না পারে। ইণ্টারভিউ ওকে দিতেই হবে। তারপর স্টোরি তৈরি করা তুরুপের দু'ঘণ্টার মামলা। ও ঠিক কোন্ অ্যাঙ্গেল থেকে সাবজেক্টটা ধরবে জানে শুধু খাম্বাটা। এ নিয়ে ওদের বহু আলোচনাও হয়েছে। ওরা এখন তৈরি।

তিন পেগ করে জিন অ্যাণ্ড লাইম খেয়ে ওরা ট্যাক্সিতে উঠেছে। হুইস্কি ওদের প্রিয় পানীয় হলেও ইণ্টারভিউ নিতে যাবার সময় হুইস্কি ওরা খায় না। গন্ধটা অনেকে বরদাস্ত করতে রাজী নয়, স্বয়ং একই পথের পথিক হলেও। জিনের গন্ধ মালুম পাওয়া যায় না। জিনের যা ধর্ম, সন্ধ্যের ফুরফুরে হাওয়ায় নেশা গাঢ় হয়ে

উঠছিল। অবশ্য ওরা অভিজ্ঞ ব্যাপারী, ঠিক সময়ে নেশারও রাশ টেনে ধরতে জানে।

—থাম্ বাটা বাটা বাটা বাটা বাটা। তুরুপ হাঁটুতে তাল ঠুকতে কতে গুনগুন করে গান ধরল। মাইকেল জ্যাকসনের জগঝম্পের কায়দায়।

খাম্বাটা মেয়েলী গলা করে জমাটি একটা হিন্দি ছবির গানের সুরে জবাব দিল—তুরু তুরু তুরু মেরে তুরু…উ…উ…। গলা ভেঙে তিন রকম স্বর বের করল খাম্বাটা।

তুরুপ খাম্বাটার দাবনায় চাপড় মেরে বলল—জবাব নেই। দে, সিগারেট দে।

—বুঝলি তুরুপ, আমার মনটা শালা খিচখিচ করছে, একটা ইনোসেণ্ট লোককে…। খাম্বাটা তুরুপের সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে বলল।

—উপায় নেই রে খাম্বাটা। দিস ইজ দ্যা সিসটেম। ক'টা ডাক্তার রুগীর জানের পরোয়া করে? তুই জানিস নর্থে কোনো লোকের পেটে অ্যাপেনডিক্স নেই?

—যাঃ, অ্যাপেনডিক্স ছাড়া মানুষ হয়? তুই ইয়ার্কি করছিস।

—ইয়ার্কি নয় বাবা। ডক্টর গুঁই আর ডক্টর চ্যাটার্জি মিলে নর্থের সব লোকের অ্যাপেনডিক্স কেটে বাদ দিয়েছে। পেটে ব্যথা? অ্যাপেনডিক্সটা এক্ষুনি কেটে ফেলতে হবে, বার্স্ট করে গেলে বাঁচানো শক্ত…আমার আড়াই হাজার প্লাস নার্সিং হোম। অপারেশনে রিস্ক একটু-আধটু আছেই। দু' একটা মারাও পড়ে। সরি বাঁচাতে পারলাম না, ভগবানের ওপরে কারো হাত নেই। টাকাটা অবশ্য অপারেশনের আগেই নেয়া হয়ে থাকে। জাস্ট একটা উদাহরণ দিলাম। সর্বত্র এই জিনিস—এনি প্রফেশন, এনি সার্ভিস। ন্যাচারালি, আমরা, মানে শুয়ারের বাচ্চা সো-কলড বুদ্ধিজীবীরা, আলাদা হতে পারি না। আফটার অল আমরা হচ্ছি জাতির বিবেক আমরা পচে না গেলে জাতটা পচে কি করে? উই আর সিম্পলি ডুইং আওয়ার ডিউটি টু দ্যা নেশন বাই হেলপিং ইট টু রট্। অ্যাম আই ক্লিয়ার?

—ইয়েস, অ্যাজ ক্লিয়ার অ্যাজ মাই কনশেন্স।

—যা নেই তার সঙ্গে আবার তুলনা কেন? বহুদিন ধরে ও শালাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—তবে প্রকাশদার সঙ্গে প্রফেশনাল এথিক্স-ফেথিক্সের বাত ঝাড়ছিলি কেন?

—আমরা বুদ্ধিজীবী। জে. জে. টি. টি।

—মতলব?

—জে. জে. টি. টি—যখন যেমন তখন তেমন। উই দ্যা শুয়ারের বাচ্চা বুদ্ধিজীবী

যখন যেমন তখন তেমন। আমাদের কাজ হচ্ছে টু রাইট অ্যাণ্ড টক্‌ টু আওয়ার বেস্ট সেল্‌ফ্‌-ইণ্টারেস্ট। বুঝলি ?

—বুঝলাম। তোর শালা নেশা হয়েছে।

—বোম্বেটে, তুই কি বলছিস রে ? তিন পেগ জিনে তুরুপ সেনের নেশা ? বলিস না, বলিস না, শুনলে লোকে হেসেই মরে যাবে। এই যে ভাই, বাঁদিকে দাঁড় করাও।

ট্যাক্সি থেকে নামল ওরা দু'জন। তুরুপ ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল—আচ্ছা ব্রাদার, সুধামাধব হাউসিং এস্টেটটা কোন্‌দিকে ?

ট্যাক্সি-ড্রাইভার মিটার তুলে দিতে দিতে বলল—সোজা চলে যান এই রাস্তা ধরে। ডান দিকে দেখতে পাবেন।

—বেশি হাঁটতে হবে ?

—না, মিনিট পাঁচেক।

—থ্যাংক ইউ। বলে তুরুপ হাঁটতে লাগল।

—জায়গাটা পশ্‌ মনে লাগছে না। খাম্বাটা মন্তব্য করল খানিক পরে।

—মিডল ইনকাম গ্রুপের ফ্ল্যাট হবে পশ্‌ এলাকায় ? নেশা কার হয়েছে বুঝতে পারছিস ?

—আরে বাবা, অরুণকুমারের ডামি…

—ধেত্তেরি, তুই শালা ক্যামেরার বাইরে কিস্‌সু জানিস না। শোন্‌, ওর এক্সাইটেড মোমেণ্টের কয়েকটা স্ন্যাপ আমার চাই।

— পাবি শালা, খাম্বাটার আত্মপ্রত্যয় নিখাদ, লে, সিগারেট খা।

সিগারেট ধরিয়ে কাঁধের ঝোলা থেকে ডায়েরি বের করে নিলয়ের ঠিকানা দেখে নিল তুরুপ। ডাইনে সুধামাধব হাউসিং এস্টেটের গেট। তিন ঝাঁক বাড়ি, একেক ঝাঁকের চেহারা একেক রকম। দামের হেরফেরে গড়পরতা চেহারার ওপর রং-নকশার এধার-ওধার।

ওরা গেট পেরিয়ে প্রথম বাড়ির ঝাঁকটার দিকে এগোতে লাগল।

নিলয় তখন নিনার দেয়া মাসকাবারী জিনিসের ফর্দটার ওপর চোখ বোলাচ্ছিল। কম কম আনলেও দেড়শো টাকার কমে হবে না। বাবুসোনার এক কৌটো দুধের দামই চল্লিশ টাকার মতো। মা'র ওষুধও ফুরিয়ে এসেছে। হাতে যা আছে তাতে ফর্দের কেনাকাটা, মায়ের ওষুধ হরলিক্স, দিন কয়েকের কাঁচা বাজার রেশন হয়ে যাবে। তারপর ?

তারপর আবার ঈশ্বরের কাছে অরুণকুমারের জন্য আরোগ্য ও অনন্ত জীবন-যৌবনের প্রার্থনা জানিয়ে যেতে যেতে 'হা টাকা, হা টাকা' করে হন্যে হয়ে বেড়ানো। বাজারের পাওনা আদায়ের চেষ্টা নিরর্থক—এটা পরিষ্কার। নিনার চারগাছা চুড়ি আর কানের রিং দু'টিতে হাত দেয়া, ও নিজে থেকেই দিতে চাইবে, অসম্ভব। ধার দিতে পারে এবং দেয়ার ইচ্ছা আছে এমন মানুষ নিলয়ের জানা নেই, অন্তত মনে পড়ছে না আপাতত।

এক আছে পুন্তি। ওর কাছে হাত পাতা যায়। দুটো জিনিস—আদ্যন্ত জানানো এবং হাত পাতা—হয়তো পুন্তির কাছেই একমাত্র অসংকোচে করা যায়। কিন্তু টাকাটা তো আসবে পুন্তির বরের কাছ থেকে—কৌশলে হাতানো কিংবা বলে আনা। হয়তো পুন্তি হাতানোই পছন্দ করবে, স্বামীর কাছে দাদাভাইকে ছোট করতে চাইবে না। কিন্তু নিলয় মনের সায় পাচ্ছে না।

আরেক আছে রত্নভাণ্ডার—নিজেদের আলমারির লকারেই। ভাবতেই শিউরে উঠল নিলয়। মা'র কাছে উলঙ্গ হয়েও রাজার মতো দাঁড়ানো যায়। মা তাঁর সর্বস্ব দিয়েও সন্তানকে রাজবেশে সাজিয়ে দেবেন। কিন্তু রাজত্বহীন সেই রাজা তারপর রাজবেশ বিক্রি করে স্ত্রী-পুত্রের অন্নসংস্থান করবে।

অতএব হে অরুণকুমার, হে ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র, আইস, পাপী সকলকে তাহাদের দুঃখতাপ হইতে পরিত্রাণ করহ। ঈশ্বরপুত্র কহিলেন, যে আমাতে আইসে, যে আমার সত্যে হৃদয় রাখে, তাহার হৃদয় আমাতে সূর্যের মতো আলোক দেখিয়া সাহসী হয়। এ সমস্ত গভীর জটিল বিষয় চিন্তার জন্য অনন্ত রাত পড়ে আছে সামনে। আপাতত ফর্দের জিনিসগুলো এনে দেয়া যাক। নিনার সংসারযাত্রা সরল হবে।

বাজারের থলে হাতে নিলয়ের সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা তুরুপ আর খাম্বাটার।

—আরে মশাই, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। ভাগ্য ভালো আমাদের, দেখা হয়ে গেল। তুরুপ অমায়িক ও অন্তরঙ্গ।

চলচ্চিত্র-সাংবাদিকতায় দুই বিখ্যাত ব্যক্তি তুরুপ সেন, জ্যাকি খাম্বাটা। নিলয় ওদের বহুবার দেখেছে, যদিও আলাপ-পরিচয়ের প্রয়োজন বা সুযোগ হয়নি।

—আপনারা! আসুন, আসুন। নিলয় বিস্মিত ও সতর্ক।

নিলয়ের বাইরের ঘরে বসে তুরুপ আর খাম্বাটা মুহূর্ত চোখে চোখে ইশারা বিনিময় করল। মর্মার্থ—'দেখছিস ব্যাটার অবস্থা ?' 'তা-ই তো দেখছি।'

—আমার এ রকম হোমলি পরিবেশ ভারি ভালো লাগে। ভুরুপ একেবারে পারিবারিক হয়ে উঠল, বসল পায়ের ওপর পা তুলে।

—আমার দেশের ঘর বিলকুল মনে পড়ল। খাম্বাটা বিলকুল মিথ্যে বলল, বোম্বেতে ওর বাবা নামকরা টেক্সটাইল মিলের টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভাইজার।

নিলয় ওদের একটি শব্দও বিশ্বাস করছিল না, তবু মুখে হাসি মাখিয়ে বিনয়ের অবতার হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর ওদের মতলব আঁচ করবার চেষ্টা করছিল।

—নিলয়বাবু, ভুরুপ বলল, আমরা আপনার ইণ্টারভিউ নিতে চাই।

—আমার ইণ্টারভিউ? ঠাট্টা করছেন? নিলয় বলল।

—কেন, আপনার সঙ্গে ইণ্টারভিউ কি বিনোদন-বার্তার আকর্ষণ বাড়াতে পারে না? বড় বড় নায়করা ডামি ছাড়া অচল। দর্শকরা কি তা জানে? দরজাটা কাইণ্ডলি বন্ধ করে দিন। আমরা কনফিডেনশিয়ালি আলাপ করতে চাই। ভুরুপ বলল মাঝখানের দরজাটা দেখিয়ে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিলয় বলল—ডামি যে ব্যবহার করা হয় এটা বোধ হয় অনেকেই জানে। নায়কদের পক্ষে লাইফ রিস্ক করে শট্ দেয়া সম্ভব নয়, ওদের লাইফের দাম অনেক, তাছাড়া ফিজিক্যাল ফিটনেস অন্যান্য স্কিলও অনেকেরই থাকে না। তাই রিস্ক-শটে ডামিদের দরকার হয়। আমার মনে হয় না দর্শকদের কাছে এটা খুব একটা নতুন নিউজ।

ভুরুপ: সাধারণভাবে ডামিদের নিয়ে আমারও মাথাব্যথা নেই। বাট ইউ আর এ ভেরি ভেরি স্পেশ্যাল ডামি। আপনার সঙ্গে অরুণকুমারের চেহারার অদ্ভুত মিল থাকার ফলে আপনাকে যেভাবে ইউজ, আই শুড সে এক্সপ্লয়েট, করা যায় তা কি অন্য ডামিকে দিয়ে সম্ভব?

প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে নিলয় বলল—আমি ওঁর ডামি হবার অনেক আগে থেকেই অরুণকুমার সুপার-স্টার।

ভুরুপ: আরে মশাই, তা কি আপনার কাছ থেকে আমাকে জানতে হবে? কিন্তু আপনি ওর ডামি হবার পর থেকে ও যে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে তার খবর আপনি না বলতে চাইলেও আমাদের জানা আছে। এমন অনেক রিস্কি ক্লোজ শটের জন্য অরুণকুমার বাহবা পায় যেগুলো লং-শটে অন্য ডামি দিয়ে করালে কখনোই ঐ এফেক্ট হতে পারে না।

নিলয়ের অজান্তে ওর মুখে তিক্ত হাসির কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল। চোখ দুটো দেয়ালে অরুণকুমারের সঙ্গে ওর একটা সিনেমার দৃশ্যের ছবির ওপর স্থির।

ক্যামেরার ফ্লাশ-গানের হঠাৎ-আলোর ঝলকে চমকে উঠল নিলয়। ও তাকাল খাম্বাটার দিকে। তৎক্ষণাৎ আবার শাটার টিপল খাম্বাটা। আবার আলোর ঝলক।

—অ্যামেজিং, অ্যামেজিং, ঐ মোমেণ্টে ঠিক যেন অরুণকুমার, লোভ সামলাতে পারলাম না। খাম্বাটার মুখ খুশিতে সারল্যে শিশুর মতো।

বিনা অনুমতিতে ছবি তোলার জন্য নিলয় রাগে ফেটে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। সামলাতে সাহায্য করল খাম্বাটার শিশুর মতো মুখ। কিন্তু ঐ অপাপবিদ্ধ মুখে তুরুপের দিকে তাকিয়ে তার বাঁ চোখের এক সেন্টিমিটার মাপের নিপুণ কারুকাজ দেখার বা অর্থ অনুধাবন করার মতো চতুর নিলয় নয়।

—প্লীজ, খাম্বাটার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করল নিলয়, আমার ছবি কাগজে ছাপবেন না।

—মিথ্যে কেন আপনার আপত্তি বুঝতে পারছি না, ইণ্টারভিউ দিন, ছবি-টবি দিয়ে ছাপা হবে, রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবেন। এতদিন যে সার্ভিস দিয়েছেন কি পেয়েছেন তার দাম? আপনার ইনকাম মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি। অরুণকুমারের তুলনায় কিছুই না। তার চেয়েও বড় জিনিস আপনার কাজের কোনো অ্যাপ্রিসিয়েশন নেই। তুরুপ বলল।

নিলয়: অরুণকুমারের সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না, আর্টিস্টের সঙ্গে ডামির তুলনা হয় না। তাছাড়া, সিনেমা শিল্পের মাথারা, অরুণকুমার নিজেও, আমাকে পাবলিসিটি দেয়া পছন্দ করেন না। বিনোদন-বার্তার মতো নামকরা কাগজে আমার ইণ্টারভিউ বেরুনোর ফল আমার পক্ষে খারাপ হবে।

তুরুপের মুখ হঠাৎ গম্ভীর দেখাল।

—না বেরুলেও আপনার সুবিধা হবে না। ব্যাণ্ডো সাহেব আমাদের প্রোজেকশন দেখিয়েছেন। কয়েকখানা স্টিলও আমরা তৈরি করিয়ে নিয়েছি। বুঝতেই পারছেন স্কু' বোতল স্কচের টাকা আমরা অমনি অমনি খরচ করিনি। ইণ্টারভিউ অর নো ইণ্টারভিউ, ওগুলো আমরা ছাপবই।

—আপনাদের লাভ?

—আপনি কি বলছেন নিলয়বাবু? যে সিনে অরুণকুমার আহত হল তার স্টিলগুলি ছাপতে পারলে যে কোনো কাগজ লাখ খানেক কপি বেশি বিক্রি করতে পারবে। পরের ইস্যুগুলোতেও ফলো-আপ নিউজ থাকবে। আপনি নিউজ-ওয়ার্ল্ডের লোক হলে ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন। যা-ই হোক, ছবিগুলো আমরা ছাপছি।…

তবে ছবিগুলোকে আমরা নিশ্চয়ই ইণ্টারপ্রেট করব। কি কায়দায় করব তা নির্ভর করছে আপনার ওপর।

—আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না। নিলয়ের মুখ ফ্যাকাশে।

—আপনার বোঝার দরকারও নেই। নিলয়বাবু, আপনি কি ভাবছেন জানি না, কিন্তু অরুণকুমার সুস্থ হয়ে ওঠার পর আপনার প্রফেশনাল লাইফ কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করছে আমাদের ওপর। কো-অপারেশন বিগেটস্ কো-অপারেশন। আপনি বেশি আর জানতে চাইবেন না। সাহায্য করুন, সাহায্য পাবেন। নিন এটা রাখুন। তুরুপ তার ঝোলা থেকে দু'খানা দশ টাকার নোটের হাজার টাকার বাণ্ডিল নিলয়ের সামনে রাখল।

—এ কি? টাকা কিসের? নিলয় বিভ্রান্তের মতো প্রশ্ন করল।

—আপনার কো-অপারেশনের দাম বা পুরস্কার। দেখুন নিলয়বাবু, দু'হাজার টাকা আপনার-আমার কাছে অনেক। কিন্তু বিনোদন-বার্তার কাছে নাথিং। একটা ভালো স্টোরির জন্য আমরা কত টাকা খরচ করি তা লোকে ধারণাও করতে পারে না। টাকাটা তুলে রাখুন। তাহলে এবার আমরা শুরু করি।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো টাকার বাণ্ডিল দুটো তুলে নিল নিলয়।

ঝোলা থেকে টেপ-রেকর্ডার বের করল তুরুপ—নিলয়বাবু, আমাদের ইণ্টারভিউ রেকর্ড করে রাখব। নিউজ বা কারো বক্তব্য ডিসটর্ট করা আমি ভীষণ অপছন্দ করি। প্রফেশনাল এথিক্স মেনে চলা আমার একটা দুর্বলতা! সাংবাদিকতা মানে মিথ্যাচার নয়। আচ্ছা, শুরু করা যাক।

টেপ-রেকর্ডারের বোতাম টিপল তুরুপ।

—আচ্ছা, নিলয়বাবু, আপনি তো অরুণকুমারের ডামির কাজ করেছেন বহু ছবিতে?

—হ্যাঁ, ওঁর চেহারার সঙ্গে আমার চেহারার একটু মিল থাকায়···

—একটু নয়, অনেকটাই। অল্প দূর থেকে দেখলেও লোকে আপনাকে অরুণকুমার বলে ভুল করবে। সেজন্য আপনার বিশেষ অ্যাডভানটেজ আছে। বড় অভিনেতার চেহারার সঙ্গে ডামির চেহারার মিল থাকলে দু' তরফেরই সুবিধা। আপনার কি মনে হয়?

—অরুণকুমারের সুবিধার কথা আমি বলতে পারব না। তবে আমার সুবিধা নিশ্চয়ই। ওঁর ছবিতে আমি কাজ পাই।

—অরুণকুমারের কাছে তাহলে আপনি কৃতজ্ঞ?

—অবশ্যই। তবে তার চেয়েও বেশি কৃতজ্ঞ ভগবানের কাছে, কারণ তিনি আমাকে অনেকটা অরুণকুমারের মতো করে তৈরি করেছেন।

—আচ্ছা নিলয়বাবু, ধূসর স্বপ্নের যে দৃশ্যে অভিনয় করার সময় অরুণকুমার আহত হন, সেই দৃশ্যে তখন তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছিলেন তো আপনি?

—হ্যাঁ, আমি।

—এই স্টিলগুলো কি সেই দৃশ্যেরই?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, দেখলে মনে হয় না যে আপনি অরুণকুমারকে আঘাত করছেন?

—এ…এ…এ…তো অভিনয়!

—না, না, আপনি উত্তেজিত হবেন না। অভিনয় তো বটেই। চমৎকার অভিনয় করেছেন আপনারা। অরুণকুমার বড় অভিনেতা, কিন্তু আপনার অভিনয়ও অপূর্ব হয়েছে। এগুলো স্টিল। আমি সিনটার প্রোজেকশনও দেখেছি।

—ও!

—নিলয়বাবু, আপনার ডামি হয়ে না থেকে অভিনেতা হতে ইচ্ছে করে না?

—বোকার মতো ইচ্ছে করে লাভ কি?

—বোকার মতো ইচ্ছে বলছেন কেন?

—অরুণকুমারের মতো চেহারা নিয়ে তাঁর ডামি হওয়া যায়, আলাদা একজন অভিনেতা হিসেবে সিনেমায় জায়গা পাওয়া অসম্ভব।

—ঠিকই বলেছেন আপনি। এর জন্যে কি আপনার মনে কোনো ক্ষোভ নেই? কোনো রাগ নেই?

—ক্ষোভ? রাগ? কার বিরুদ্ধে?

—ধরুন, অরুণকুমারের বিরুদ্ধে।

—আমাকে কি আপনার পাগল বলে মনে হচ্ছে? যার জন্য আমি করে খেতে পারছি তার বিরুদ্ধে থাকবে আমার রাগ? বরং ভগবানের বিরুদ্ধে রাগ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে পারতেন। কারণ আমাদের মতে তিনিই স্রষ্টিকর্তা।

—ডামিকে সাধারণত কি ধরনের কাজ করতে হয় নিলয়বাবু? তাদের কি বিশেষ ট্রেনিং দরকার হয়?

—তুরুপবাবু, এসব আপনি আমার থেকে ভালো জানেন।

—তবু আমাদের পাঠকদের জন্য বলুন না।

—সাধারণত ডামির প্রয়োজন হয় রিস্ক-শটে হিরোকে শারীরিক ঝুঁকি থেকে বাঁচানোর জন্য। মনে করুন, হিরো বাড়ির পাইপ বেয়ে ছাদে উঠছে বা দারুণ স্পীডে মোটর সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী খাদের পাশ দিয়ে। আপনি আশা করতে পারেন না কোনো দামী হিরো এ ধরনের শট্ দিতে গিয়ে তার লাইফের রিস্ক নেবে। তাছাড়া আরেকটা সুবিধাও হয় যদি হিরোর সঙ্গে ডামির চেহারার বেশ মিল থাকে। সেখানে ডাবল রোলে অভিনয়ের সময় শট্ টেকিং ও এডিটিংয়ের ঝামেলা কমিয়ে আনা যায়।

—যেমন ধূসর স্বপ্নে?

—হ্যাঁ, যেমন ধূসর স্বপ্নে।

—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না যে অনেক রোলে হিরোর সাকসেসের মূলে অনেকটা অবদান আপনাদের, অথচ আপনাদের কোনো স্বীকৃতি নেই, টাকাপয়সার প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো। হিরোর তুলনায় আপনারা যা পান···

—না··না···অভিনয় অনেক সূক্ষ্ম জিনিস। তার সঙ্গে সার্কাসের খেলোয়াড়ের তুলনা হয় না তুরুপবাবু।

—অ্যানালজিটা টেনেছেন ভালো। কিন্তু আমারও একটা অ্যানালজি আছে, আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে। বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রী-ফন্ত্রী যে ভাষণ দেয়, সেগুলো লিখে দেয় তাদের সেক্রেটারিরা। বাহবা পায় নেতারা। এমন কি, অনেক সময় এসব ভাষণ আবার বই হয়ে বেরোয়। মানুষ পড়ে ধন্যি ধন্যি করে, আহা কি দেশপ্রেম, কি ইতিহাস-চেতনা, সমাজনীতি-রাজনীতি-অর্থনীতির কি গভীর জ্ঞান! আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, সেক্রেটারি মশায়ের বুকের ভেতরটা কি তখন খচখচ করে না?

—মানুষ যখন, করে বই কি। তবে এটা মেনে নিয়েই তো চাকরি করা।

—তাহলে আপনার মনটাকেই বা অস্বীকার করেন কি করে?

—আপনার তুলনাটা ঠিক হয়নি। একজন ডামির কাজ আর একজন উচ্চশিক্ষিত সেক্রেটারির কাজে অনেক তফাত।

—মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আসল জায়গাটায় মিল আছে। দু'জনেই নিজের সত্তার অংশ অন্য একজন মানুষকে নিঃশব্দে দিয়ে যায় তাকে তুলে ধরবার জন্য।

—নিঃস্বার্থভাবে নয়। তারা এর জন্য টাকা পায়। টাকা পাওয়ার শর্তও এটা।

—কিন্তু যা পাওয়া উচিত সে টাকা তারা পায় না। মর্যাদার প্রশ্ন বাদই দিলাম। দেখুন, মানুষের মন বলে একটা বস্তু আছে। সে এটাকে সাধারণ মানুষের জিনিসপত্রের প্রতিদিন বেড়ে-যাওয়া দামের মতো মেনে নিতে পারে বলে আমার মনে হয় না। মনের কোণে অল্প-বেশি বেদনা দুঃখ জ্বালা থাকবেই। সকলের ক্ষেত্রে মাত্রাটা হয়তো সমান নয়।

—থাকতে পারে। আমি শুধু আমার মনটাকেই জানি।

—যাক, বাদ দিন ও প্রসঙ্গ। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে অরুণকুমারের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেমন ছিল? আই মীন, আপনারা কি বন্ধু ছিলেন?

—আপনি কি বলছেন তুরুপবাবু? অরুণকুমারের বন্ধুবান্ধবদের আপনি আমার চেয়ে ভালো চেনেন। আমার মতো অতি সাধারণ একজন মানুষ অরুণকুমারের বন্ধু হতে পারে কি? স্ট্যাটাস মানতেই হবে। বন্ধুত্ব সমানে সমানেই হয়। উনিশ-বিশ তফাতেও চলে। কিন্তু অরুণকুমার আর নিলয় মজুমদারে চলে না। উনি নিশ্চয়ই আমাকে অপছন্দ করেন না। কিন্তু বন্ধুত্ব? না···না···।

—টাকাপয়সা আর জনপ্রিয়তাই কি একজন মানুষের বড়ত্বের মাপকাঠি?

—আপনি কি বলেন জানি না, সমাজ তা-ই বলে। অবশ্য প্রতিভাও একটা মস্ত বড় জিনিস। সেখানেও অরুণকুমার একালের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, আর আমি বড় জোর একজন মিডিওকার জিমন্যাস্ট।

—অরুণকুমার নিশ্চয়ই অসাধারণ প্রতিভাবান অভিনেতা। কিন্তু তার অভিনয় জীবনের নেপথ্যে আপনার অবদানও কম নয়। তাহলে বন্ধুত্ব হতে পারে না কেন? বহু অসাধারণ মানুষের সাধারণ বন্ধু ছিল।

—বিষয়টা কি আলোচনা করবার মতো জরুরী? বাদ দিন না—

—না নিলয়বাবু, বাদ দেবার বিষয় এটা নয়। হয়তো আমার কৌতূহল অ্যাকাডেমিক, কিন্তু আমি কেবলই ভাবি যখন জীবিকার প্রয়োজনেই হোক বা শিল্পের প্রয়োজনেই হোক দুটো মানুষের সত্তা সাময়িকভাবেও অভিন্ন হয়ে যায়, তখন বাইরের জীবনেও তাদের খুব কাছাকাছি আসাই স্বাভাবিক।

—আপনার ধারণা ভুল। ডামি আমি একলা নই। তাদের অভিজ্ঞতাও আলাদা নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

—আমি কিন্তু অর্ডিনারি ডামিদের সম্বন্ধে বলছি না। দে আর জাস্ট নন-আইডেনটিটি, বাট ইউ টু আর এক্সচেঞ্জিং আইডেনটিটিজ—আপনি আর অরুণকুমার।

—আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না। তবে আপনার জেনে রাখা ভালো আমারও কোনো আইডেনটিটি নেই। প্লীজ, এ নিয়ে আর প্রশ্ন করবেন না।

—না করতে হলেই খুশি হতাম। কিন্তু আপনার ভালোর জন্যই করা দরকার। আপনি কি জানেন যে কিছু লোক রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে আপনি ইচ্ছে করে অরুণকুমারকে আঘাত করেছেন?

—মিথ্যে কথা। বানানো গল্প। শয়তানি।

—কিন্তু লোকের মুখ আপনি বন্ধ করবেন কি করে?

—অরুণকুমারকে আঘাত করে আমার লাভ? উনি অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকে আমাকে কি অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে জানেন? ওরা মিথ্যেবাদী, বদমাশ…

—ওরা বলছে ঈর্ষা, ঈর্ষাই আপনার অরুণকুমারকে আঘাত করার কারণ। অরুণকুমারের জন্য আপনি জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন বারবার, বহু ডিফিকাল্ট শটে ওকে উতরে দিয়েছেন, অথচ উনি আছেন সম্রাটের মতো, আপনি…

—মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে। অল ব্লাডি লায়ারস…

—সেইজন্যই আমি বুঝতে চাইছিলাম আপনাদের সম্পর্কটা ঘৃণার না বন্ধুত্বের।

—কি বুঝেছেন আপনি?

—বুঝতে পারিনি নিলয়বাবু। ইণ্টারভিউর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

খুট্ করে বোতাম টিপে টেপ-রেকর্ডার বন্ধ করে দিল তুরুপ।

খাম্বাটা ইতিমধ্যে কয়েকবারই তার বোম্বেটে নামের মর্যাদা রক্ষা করে নিলয়ের বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তির মুহূর্তে ক্যামেরার শাটার টিপেছে।

—নিলয়বাবু, তুরুপ বলল, আপনি যদি চান আমাদের ইণ্টারভিউর ক্যাসেটের একটা কপি করে দিচ্ছি।

—দরকার হবে না। নিলয়ের গলায় অসীম ক্লান্তি।

—আরেকটা ফ্রেণ্ডলি অ্যাডভাইস আপনাকে দিচ্ছি নিলয়বাবু, আপনি সুলক্ষণার সঙ্গে একবার দেখা করুন।

—কেন?

—আমি যতদূর দেখেছি ওর মতো নটোরিয়াস মেয়েছেলে ফিল্ম লাইনে দ্বিতীয়টি নেই। ওকে আমড়াগাছি করে এলে আপনার পক্ষে ভালোই হবে।

—আমাকে পাত্তা দেবে কেন? হয়তো দেখাই করবে না।

—করবে, করবে, তুরুপের হাসি রহস্যময়, আচ্ছা, তাহলে এবার ওঠা যাক। ধন্যবাদ এবং নমস্কার।

নিলয় নিঃশব্দে হাত তুলল।

রাস্তায় নেমে তুরুপ বলল—যাক, আরেকটা নতুন অ্যাঙ্গেল পাওয়া গেল।

খাম্বাটা সপ্রশ্ন চোখে তাকাল তুরুপের দিকে—মতলব?

—আরে বুদ্ধু, সুলক্ষণার সঙ্গে ওকে দেখা করতে বললাম কেন? নজর রাখতে হবে ও যায় কিনা, জাস্ট এ নাইস বিট অব স্ক্যাণ্ডাল…হাঃ…হাঃ…

—শালা চুতিয়া আছিস মাইরি তুই, ব্যাটাকে একেবারে চৌপট করে দিলি। তুরুপকে বাহবা জানাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল খাম্বাটা।

মাঝখানের দরজাটা খুলে দিতেই নিনার প্রশ্নের মুখোমুখি হল নিলয়।

—কারা এসেছিল? দরজা বন্ধ করে এত কি শলা-পরামর্শ?

মা বসে আছেন খাটে। পাশে বাবুসোনা। মা'র মুখেও প্রশ্ন ও দুশ্চিন্তার ছায়া।

নিলয় আর গোপনীয়তার প্রয়োজন বোধ করছে না। নিজেকে অনেক যুদ্ধের অভিজ্ঞ যোদ্ধা ভাবার সামান্য গোপন আত্ম-গরিমা তার ছিল। কিন্তু ক'দিনে সেই জায়গাটা একেবারে শূন্য, এমন কি আত্ম-বিশ্বাসের দুর্বল শিকড়গুলিও উপড়ে যাবার মুখে। মানুষের জটিল অরণ্যে সহসা সে দিশাহারা পথযাত্রী। কাউকে অন্তরালের আশ্রয় দেবার সাধ্য তার নেই। সে নিজেই নগ্ন, অসহায়; তুরুপ সেনের মতো মানুষরা আজ তাকে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারে। দু'হাজার টাকা দিয়ে তার কাছ থেকে যে ইণ্টারভিউটা তুরুপ কিনে নিয়েছে, নিলয় বুঝতে পারছে না, গতানুগতিক কিছু কথাবার্তার জন্য এত টাকা সে কেন দিল। ইণ্টারভিউ দিতে যাতে সে বাধ্য হয় সেজন্য ইঙ্গিতে ভয় দেখাতেও ছাড়েনি। কিন্তু কেন? তুরুপ সেন তার মতো মোটাবুদ্ধির মানুষ নয়। খেলা নিশ্চয়ই একটা আছে, কিন্তু নিলয়ের ধারণার বাইরে সেটা।

—টাকাটা রেখে দাও। দশটাকার নোটের বাণ্ডিল দুটো নিনাকে দিল নিলয়।

—টাকা কোথায় পেলে ? এত টাকা !

—তুরূপ সেন এসেছিল জ্যাকি খাম্বাটাকে নিয়ে। ওরা দিয়েছে।

তুরূপ সেন জ্যাকি খাম্বাটার পরিচয় নিনার জানা।

ওরা তোমাকে টাকা দিল কেন ?

—আমার ইণ্টারভিউর দাম।

—তুমি জগদীশদাকে জিজ্ঞেস না করে ইণ্টারভিউ দিতে রাজী হলে কেন ?

—উপায় ছিল না। তাছাড়া দু'হাজার টাকা…

—তুমি ওদের উদ্দেশ্য জান না। টাকা দিয়ে ইণ্টারভিউ নেয় বলে আমি শুনিনি।

—জানলেও উপায় ছিল না, ইণ্টারভিউ আমাকে দিতেই হত।

—না দিলে ?

মুহূর্ত থেমে নিলয় বলল—টাকার প্রয়োজন আমাদের আছে। কিন্তু টাকার লোভে আমি ইণ্টারভিউ দিইনি নিনা। তুরূপ সেনের কলমকে সকলেই ভয় করে। আমি ওর উদ্দেশ্য জানি না। হয়তো আমার ক্ষতিই করবে। কিন্তু ইণ্টারভিউ না দিলেও ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, তাই টাকাটা নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছি।

নিলয়ের বিভ্রান্ত মুখের দিকে মুহূর্ত তাকিয়ে রইল নিনা। তারপর টাকাটা রাখবার জন্য আলমারি খুলতে লাগল।

মা বললেন—বোস্ নিলু।

নিলয় খাটে বসল।

—তোর কি কোনো বিপদ হয়েছে বাবা ? ক'দিন ধরেই আমার মনে হচ্ছে তুই যেন সব সময় কি ভাবিস।

—ছোটখাট একটা গোলমাল। আমাদের লাইনে এ হয়েই থাকে। মিথ্যে ভেবে তুমি শরীর খারাপ করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। নিলয় ম্লান হাসল।

সব ঠিক হয়ে যাবার আশ্বাস কিন্তু মায়ের কানে বিশ্বাসযোগ্য শোনাল না। তিনি শুধু বললেন—দেখিস বাবা, বুঝে-শুনে চলিস।

১১

দু'দিন পরে এক ভদ্রলোক এল নিলয়ের সঙ্গে দেখা করতে। তখন সকাল ন'টা।

মাঝবয়েসী গোলগাল লোকটি। মাথাভর্তি কাঁচাপাকা বাঁ কান ঘেঁষে সিঁথি কাটা চুলের নিচে সরু কপাল। অস্বাভাবিক ঘন ভ্রূর নিচে কুতকুতে দুটো চোখ। থলথলে মাংসল মুখে সূক্ষ্ম গোঁফের কারুকর্ম। পরনে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, চওড়া পাড়ের দামী ধুতি, পায়ের চপ্পল জোড়ার দাম নিলয়ের ধারণার বাইরে। গলায় সোনার চেন-হারে নিলয়ের অচেনা এক গুরুদেবের ছবি সহ ত্রিকোণ লকেট—রোমশ বুকের আরামে আশ্রিত। হাতের মোটা আঙুলে দামী পাথর-বসানো আংটির সংখ্যা ও জৌলুস লক্ষণীয়। সব মিলিয়ে চেহারায় একটা অভদ্র আভিজাত্য। লোকটাকে কখনো দেখেছে বলে নিলয় মনে করতে পারল না।

—নিলয়বাবু, আমাকে আপনি চিনবেন না, লোকটা জাঁকিয়ে বসে বলল, কিন্তু আপনাকে আমি ভালোমতোই চিনি, মানে, নিজের প্রয়োজনেই চিনে নিতে হয়েছে। আমি আপনাদের লাইনের লোক নই। আমার নাম কৃষ্ণপদ মল্লিক। পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি, গোটা কয়েক বাড়ি-টাড়ি আর তিনটে ব্যবসা নেড়ে-চেড়ে খাই। হ্যাঁ, নিচে নতুন কনটেসা গাড়িটা রেখে এসেছি। বানচোৎ ড্রাইভারটা আজকে আসেনি। নিজেই ড্রাইভ করে এসেছি। গাড়িটা ড্যামেজ করে দেবে না তো কেউ। দিনকাল যা হয়েছে অকহতব্য।

—না, সে ভয় নেই। এখানে মোটামুটি ভদ্রলোকেরাই থাকে।

—কিন্তু শালার ভদ্রলোকের ছেলেগুলো যে ভদ্রলোক নয়। যাক যেজন্যে আসা, কি কুক্ষণেই যে মশাই ফিলিম করবার শখ চাগিয়েছিল! দুরন্ত যৌবন বলে কোনো ছবির নাম আপনি শুনেছেন?

স্মৃতি হাতড়ে নিলয় বলল—না।

শুনলেও মনে নেই। কম দিন নয়, বছর আষ্টেক ছবিটা আটকে আছে। অরুণকুমার হিরো, নতুন হিরোইন। তিন-চারদিনের কাজ মাত্র বাকি ছিল। অরুণকুমারের বায়নাক্কায় ছবি আটকে গেল। গেল তো গেলই। এমন ডাঁট মশাই ইয়ের বাচ্চাটার, একবার না বলেছে তো না-ই, কিছুতেই হ্যাঁ করাতে পারলাম না।

নিলয়ের কাছে ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকতে লাগল।

—অরুণকুমারের সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার চুক্তি হয়েছিল। লিখিত চুক্তি ছাড়া উনি কাজ করেন না।

—তা হয়েছিল। কিন্তু চুক্তি না মানলে আমি কি করতে পারি বলুন? কৃষ্ণপদ নিরুপায়ভাবে ঘাড় নাড়ল।

নিলয় হেসে ফেলল।—আপনি এত বিষয়সম্পত্তির মালিক, এতগুলো ব্যবসা চালান, আপনি জানেন না চুক্তিভঙ্গ করলে কি করতে হয় ?

—জানি বই কি নিলয়বাবু, নিশ্চয় জানি। কিন্তু ঐ যে গরিবের ঘোড়ারোগ হয়েছিল। আমি চুনোপুঁটি, অরুণকুমার রাঘব বোয়াল। ওর সঙ্গে কোর্ট-কাছারি করে আমি পারব কেন ?

—তাহলে কোর্টে আপনি গিয়েছিলেন বলুন ?

—না যাওয়ার মতোই। কৃষ্ণপদ নিলয়ের প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল।

—যা-ই হোক, আমাকে এ গল্প শুনিয়ে আপনার লাভ ?

—আছে বই কি, আছে বই কি লাভ, নইলে মশাই, সাত-সকালে আপনাকে বিরক্ত করতে আসি।

—বলুন, আমি কি করতে পারি।

—তিন-চারদিনের কাজ হলেই ছবিটা শেষ হয়ে যায়। আপনি অরুণকুমারের বদলি হিসেবে কাজটা তুলে দিন। দশ হাজার টাকা আপনাকে দেব—পুরোটাই আগাম।

বিস্ময়কর টাকার অঙ্কটা শুনে নিলয়ের বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত কয়েকটা লাফ দিল। দশ হাজার টাকা ! নিরাপদ নিশ্চিন্ত কয়েকটা মাস। ভেবে-চিন্তে ভবিষ্যতটাকে ঢেলে সাজাবার মতো সময়। কিন্তু ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে জটিল, ঘোরালো। এক ঝাঁক প্রশ্ন ধাওয়া করে এল নিলয়ের মাথায়। মিনিট খানেক চুপ করে বসে থেকে নিজেকে গুছিয়ে নিল ও।

তারপর বলল—কৃষ্ণপদবাবু, দশ হাজার টাকা আমার কাছে লোভনীয় নিশ্চয়ই। কিন্তু এ কাজে হাত দেয়ার আগে আমাকে সবদিক ভেবে দেখতে হবে। কেননা, আমার ভবিষ্যতের প্রশ্ন আছে। কিছু মনে করবেন না, আমার কতকগুলো প্রশ্ন আছে। উত্তর দেয়া না-দেয়া আপনার ইচ্ছে, কিন্তু না জেনে আমার পক্ষে এগনো সম্ভব নয়।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। মিনে-করা রুপোর ডিবে থেকে নাকে নস্যি ঠাসল কৃষ্ণপদ।

—আপনি যখন আমাকে খুঁজে বের করেছেন, ধরে নিতে পারি ফিল্মে আমি কি কাজ করি তাও আপনি জানেন। অরুণকুমারকে চটিয়ে আমার পক্ষে কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। আপনার সঙ্গে অরুণকুমারের গোলমাল কি মিটে গেছে ?

—সে আমি মিটিয়ে নেব। তার জন্য চিন্তা করবেন না।

—মিটেই যদি যায় তাহলে ওঁর কাজ ওঁকে দিয়েই করান না।

—ও যে আবার কাজ করতে পারবে, পারলেও কবে পারবে তার ঠিক নেই।

—তাহলেও বদলি দিয়ে কাজ করিয়ে নিজের নাম খারাপ করতে উনি রাজী হবেন কেন? ওঁর মতো অভিনয় তো আমি করতে পারব না।

—ওকে রাজী করানোর দায়িত্ব আমার। আর অভিনয়? লোকে আসল-নকলে ফারাক বুঝতেই পারবে না এমন ক্যামেরাম্যান আমার হাতে আছে।

—তার মানে অরুণকুমারের গেইট, এক্সপ্রেশন, ক্লোজ-আপ থাকবে না। দর্শককে বোকা বানানোর জন্য ক্যামেরাম্যান অ্যাঙ্গেলগুলো ঠিক করে নেবে। লং-শটে ওঁর সঙ্গে আমার পার্থক্য বোঝা যায় না। কিন্তু ভয়েস, ডেলিভারি পাব কোথায়?

সিল্কের রুমালে গোঁফ পর্যন্ত গড়িয়ে আসা নস্যি-মেশা নাকের জল সশব্দে মুছে কৃষ্ণপদ বলল—গলাও ভাড়া পাওয়া যায়। চোখ বুজে শুনলে বুঝতে পারবেন না, কে কথা বলছে, অরুণকুমার না আর কেউ। সব বন্দোবস্ত আমার করা আছে। রাজী হয়ে যান মশাই, রাজী হয়ে যান।

বাঃ, চমৎকার, নিলয় ভাবল, দ্বিতীয় অরুণকুমার দেবে শরীর, অবয়ব, তৃতীয় অরুণকুমার দেবে কণ্ঠ। তৈরি হবে প্রথম অরুণকুমারের জীবন্ত বিগ্রহ। প্রথম আসল এক এবং অদ্বিতীয় অরুণকুমার দেবে শুধু তার নামের ঐশ্বর্য। কত টাকার বিনিময়ে? দশ হাজার নিশ্চয়ই নয়। তিরিশ চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা চেক তার অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। এজন্য রোগশয্যা থেকে টয়লেটে যাবার কষ্টটুকুও তাকে স্বীকার করতে হবে না।

—ধরুন, নায়কের সমস্যার সমাধান হল। কিন্তু নায়িকা? নিলয় জিজ্ঞেস করল

—আরে মশাই, আমিই প্রথম ওকে চান্স দিয়েছিলাম। ঐ প্রথম ঐ শেষ মাগী এখন হোটেলে নাচে। তু তু করে ডাকলেই ছুটে আসবে।

কৃষ্ণপদর কথাবার্তার অশিক্ষিত অমার্জিত পয়সার গরম নিলয়ের ভালো লাগছিল না। কিন্তু দশ হাজার টাকার অঙ্কটা ভালো-লাগা মন্দ-লাগার অনেক ওপরে অরুণকুমারের যদি সম্মতি থাকে তাহলে নিলয়ের কাজটা নিতে বাধা কোথায়?

—অন্য রোলের আর্টিস্টদের পাবেন? নিলয়ের প্রশ্ন।

—ওদের কোনো কাজ নেই। দু'একটা ছুটকো লোক লাগবে। ও রামা-শ্যামাকে দিয়ে করিয়ে নেব।

—বেশ, আমি রাজী আছি, নিলয় খানিকক্ষণ ভেবে বলল, কিন্তু অরুণকুমারের ে

এতে আপত্তি নেই তা আপনাকে লিখে দিয়ে আমার সঙ্গে চুক্তি করতে হবে। আমি ঝামেলায় জড়াতে চাই না।

—আবার লেখাপড়ার ঝঞ্ঝাট কেন, কৃষ্ণপদর ঝকমকে আংটি-পরা আঙুলে নসির কৌটোটা খেলা করতে লাগল, দশ হাজার ক্যাশ-ডাউন পাবেন কাজ শুরু করার আগেই, রসিদও দিতে হবে না। ইনকাম-ট্যাক্সের কোনো ঝামেলা থাকবে না আপনার। বলুন, এটুকু কাজের জন্য দশ হাজার টাকা কি কম হল আপনার পক্ষে?

সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল নিলয়। কৃষ্ণপদর খেলাটা সে ধরতে পারছিল না।

—মাপ করবেন। লেখাপড়া না হলে একাজ নেব না। নিলয়ের গলায় শেষ কথা বলার সুর।

—দেখুন, পনেরো পর্যন্ত উঠতে পারি।

—তাহলেও না।

—এখন তো আপনার কাজকর্ম নেই। কবে যে আবার কাজ পাবেন···।

লোকটার নোংরা ব্যবসায়ী বুদ্ধি ঠিকই আছে। খোঁজখবর নিয়েই এসেছে।

উত্তপ্ত হয়ে নিলয় বলল—সেটা আপনার না ভাবলেও চলবে। আমার ফাইনাল কথা আপনাকে বলে দিয়েছি। মানা না-মানা আপনার ইচ্ছে।

—উত্তেজিত হবেন না। এই নিন আমার কার্ড, কৃষ্ণপদ উঠে দাঁড়াল, যদি পরে ভেবে আমার প্রস্তাবটা ভালো মনে হয় টেলিফোন করে জানিয়ে দেবেন। মনে রাখবেন পনেরো হাজার টাকা বড় কম নয়। অত টাকা ঘরে তুলতে আমাকেও যথেষ্ট মেহন্নৎ করতে হয়। টাকা কি কেউ মশাই অমনি অমনি ছাড়ে? আর, টাকা রোজগার করতে হলে রিস্ক একটু-আধটু নিতেই হয়। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

নিরুত্তরে দরজা খুলে দিল নিলয়।

নিনা কান সতর্ক রেখেছিল। কৃষ্ণপদ চলে যেতেই ও এসে বলল—শোন, জগদীশদার মত না নিয়ে এক পা-ও এগোবে না। তোমাকে দেখছি এখন অনেকেরই দরকার হচ্ছে। কিন্তু দরকারগুলো আমার তেমন ভালো মনে হচ্ছে না।···লক্ষ্মীটি, তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি। সেই সুযোগে কেউ তোমাকে বিপদে না ফেলে। নিনার গলা নরম হয়ে এল।

—ভয় নেই। আমি এক্ষুনি জগদীশদার কাছে যাচ্ছি। দেরি হলে ভেবো না। বাড়িতে ওকে না পেলে খুঁজে বের করতে হবে। কৃষ্ণপদ লোকটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

জগদীশদা বাড়িতেই ছিল।

কৃষ্ণপদ মল্লিকের নাম শুনেই সে লাফিয়ে উঠল।

—হারামজাদা কেষ্টপদ তোর কাছে গিয়েছিল! ব্যাটা পয়সা ছাড়া দুনিয়ায় কিছু চেনে না। বেঁকা রাস্তায় সহজে পয়সা তোলার ফিকিরে আছে সর্বদা। হাড়-বজ্জাত। কি মতলবে গিয়েছিল তোর কাছে?

আদ্যন্ত নিলয় বলল জগদীশদাকে।

জগদীশদাও মাঝে মাঝে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিল।

তারপর বলল—ব্যাটার মতলব আঁচ করা শক্ত। টাকাপয়সা ওর বিস্তর। কিন্তু বেশির ভাগই দু'নম্বরী। জানিস তো ফিল্মে দু'নম্বরী টাকাই বেশি। আট-ন বছর আগে ও একবার ছবি করতে নেমেছিল। বোধ হয় মতলব ছিল কিছু কালো টাকা সাদা করে নেবে। তাতে দোষ দেখছি না, অনেকেরই কালো টাকা খাটিয়ে সাদা করবার জায়গা এটা। আমাকে টানবার চেষ্টা করেছিল। আমার লোকটাকে ভালো লাগেনি, আমি রাজী হইনি। তা, কাজ শুরু হল। ছবির নাম দুরন্ত যৌবন। ওর একটা বাঁধা মেয়েমানুষ ছিল—নন্দিনী মতিলাল—এখন মিস্ পম্পা নাম নিয়ে ক্যাবারে নাচে। নন্দিনী হিরোইন। অরুণকুমার হিরো। অরুণকুমারের সঙ্গে তিন লাখ টাকার মৌখিক চুক্তি হয়েছিল, লেখাপড়া হয়েছিল এক লাখের। কেষ্টপদ শুরু থেকেই নানা রকম ফিকির করতে লাগল। পাগল-ছাগল দেখে কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা নিল ফিল্মে চান্স দেবে বলে। তাদের ভালো রকমই টুপি পরাল। তারা লাইনের লোক নয়, কিল খেয়ে কিল হজম করতে বাধ্য হল। এতেই শেষ হলে ওকে ঠেক খেতে হত না। কিন্তু সবাইকেই ও বোকা বানাতে লাগল। টাকা আদায় করতে লোকের প্রাণান্ত। শেষ পর্যন্ত অরুণকুমারের সঙ্গে চালাকি করতে গিয়েই ও মার খেল। লিখিত চুক্তির এক লাখ টাকা অরুণকুমারকে দিয়েছিল। বাকি টাকা নিয়ে আজ-কাল করছিল। অরুণকুমারের কাছে সব খবরই পৌঁছয়। সে মালটিকে চিনে নিয়েছে। একদিন সোজা বলে দিল বাকি টাকা তার বাড়িতে পৌঁছে না দিলে আর ডেট দেবে না। কেষ্টপদর গায়ে কলকাত্তাই জমিদারী রক্ত। তার আঁতে লেগে গেল। সে অরুণকুমারকে কোর্টের ভয় দেখাল। সাপের মাথায় পা। কেষ্টপদর মতো দশটা বড়লোক অরুণকুমারের ট্যাঁকে। তার ওপর জানিস তো ওর মেজাজ। বলে

দিল, বাকি দু'লাখ কেন আরো দশ লাখ দিলেও সে কাজ করবে না। কেষ্টপদ যা পারে করুক। ব্যস্, ছবির দফা গয়া।

—কৃষ্ণপদ কোর্টে যায়নি? নিলয় জিজ্ঞেস করল।

—ঐ বোকামিটা করেনি। তাতে শুধু টাকার শ্রাদ্ধই হত। অরুণকুমারকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজী করবার চেষ্টা করেছিল। অরুণকুমার একবার বেঁকে বসলে শিবের বাপের অসাধ্যি। কেষ্টপদর কয়েক লাখ টাকা বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে রইল, দুরন্ত যৌবনের ইতি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাটা ঐ রদ্দি ছবিটার পেছনে এত রিস্ক নিয়ে আবার টাকা খরচ করতে চাইছে কেন। জগদীশদা নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করল যেন।

—ধরুন, ও আমাকে অরুণকুমারের জায়গায় নিয়ে ছবি শেষ করল, তাহলেও ছবি বাজারে ছাড়তে পারবে না। অরুণকুমার নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে না ছবি রিলিজ হলে। নিলয় বলল।

—কেষ্টপদর মাথায় কি প্যাঁচ আছে কে জানে। ও হয়তো ভাবছে অরুণকুমার শিগগির সুস্থ হচ্ছে না। এ সময় অরুণকুমারের নতুন ছবি হিসেবে ছবিটা ভালো বিক্রি পাবে। আর অরুণকুমারও কিছু করতে পারবে না, কারণ লিখিত চুক্তির টাকা তাকে দেয়া আছে। কেষ্টপদ বলবে, অরুণকুমার অক্ষম বলেই বদলি দিয়ে তাকে ছবি শেষ করতে হয়েছে। যা শোনা যাচ্ছে অরুণকুমার বছর খানেকের আগে কাজ করবার মতো সুস্থ হবে না। কেষ্টপদর হালফিল খুঁটির জোর অনেক। বছর দুয়েক হল ও নেতা হয়ে বসেছে। সামনের ইলেকশনে নমিনেশনও পাবে শুনছি। আমার মনে হচ্ছে ও পার্টির মাথাদের কাছ থেকে ভরসা পেয়েছে। ঝটপট কাজ শেষ করে ছবিটা বাজারে ছেড়ে দিতে পারলে ঐ মড়া ছবি এখন প্রচুর টাকা দেবে। রিলিজ পেতে অসুবিধা হবে না। অরুণকুমার হিরো—ছবির রিলিজ পেতে সাত দিন। বুঝলি নিলয়, ব্যাপার এইটেই। কেষ্টপদ এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চায়—টাকাকে টাকা, অরুণকুমারের ওপর বদলা নেয়াও হল।

—অরুণকুমার ছাড়বে কেন?

—কি করবে অরুণকুমার? সে সুস্থ থাকলে আপত্তি তুলতে পারত, তার জায়গায় বদলি দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে বলে, এটা বে-আইনী। এখন যা অবস্থা তাতে আইন কেষ্টপদর দিকেই থাকবে। বহুদিন ছবিটা আটকে আছে, প্রযোজকের প্রচুর টাকা ক্ষতি। এ অবস্থায় সে যদি এ পথ নিয়ে থাকে তাতে অন্যায় হয়নি। কোর্ট

মনে হয় এ রকমই বলবে। অরুণকুমার কি বলতে পারবে যে দু'লাখ কালো টাকা সে পায়নি বলে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল? তারপরেও আছে, কেষ্টপদ এখন নেতা। ওদের পার্টির চেহারা চমৎকার। ক্যাডার বেশির ভাগ গুণ্ডা, মস্তান, ওয়াগন-ব্রেকার, আর প্রথম সারির নেতারা সব সমাজের শিরোমণি—উকিল, ব্যারিস্টার, শিল্পপতি, ফ্লিম-স্টার, কে নয়। কেষ্টপদকে ঠেকায় কে?

—আমি রাজী না হলে আমার ওপর হামলা হবে না তো? নিলয় শঙ্কিত।

—হবে না জোর দিয়ে বলতে পারি না। তবে হলেও সুবিধা করতে পারবে না। চাপ দেবার চেষ্টা করছে দেখলেই আমাকে জানাস। কারা এইসব মালকে ঠাণ্ডা করতে পারে আমি জানি। তুই চিন্তা করিস না। ও তো বলে গেছে তুই যদি মত পালটাস তবে ওকে টেলিফোন করে জানাতে। তুই চেপে বসে থাক্। এ কাজ নেবার প্রশ্নই ওঠে না।

—এতদিন কেউ পাত্তা দিল না, অরুণকুমার বিছানা নিতেই দেখছি আমি খুব দামী লোক হয়ে উঠেছি।

—এ দামও কিন্তু তোর নয় রে, অরুণকুমারেরই। জগদীশদা বলল। বলেই কথাটার নিষ্ঠুর সত্যে সে নিজেই লজ্জিত হল।

মণিবৌদি চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

—কি গো অরুণকুমারের ছবি, দেখা নেই কেন? নিলয়ের হাতে চায়ের পেয়ালা দিয়ে মণিবৌদি বলল।

—ছবি মালা পরে দেয়ালে ঝোলবার চেষ্টা করছে। হেসে উত্তর দিল নিলয়।

—ছি, ছি, কি যে বল! নিনা কেমন আছে? বাচ্চা?

—বাবুসোনা ভালোই আছে, এ বয়েসে সবাই ভালো থাকে। নিনা সুস্থ আছে, কিন্তু ভালো আছে বলতে পারি না। আমার জন্যেই।

—তুই বড্ড ফ্রাসট্রেটেড কথাবার্তা বলছিস নিলয়, জগদীশদা পেয়ালায় লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, মণি, নিলয় আজ আমাদের সঙ্গে খাবে।

—ন্‌না। নিলয় মৃদু আপত্তি করল।

—কেন, কি রাজকার্য তোর? শোন্, আমি আজ বেরুচ্ছি না। তুই তো বাড়িতে বলে এসেছিস যে আমার কাছে আসছিস? জগদীশদা বলল।

—তা বলে এসেছি।

—তবে আর কি। নিনা ভাববে না। আজ কষে গ্যাঁজানো যাক। মণি, ভালো করে দু'একটা আইটেম কর দিকি।

—এই তো, বৌদির ওপর উৎপাত শুরু করলেন।

—জিজ্ঞেস করে দেখ, তোদের বৌদিকে, মণিবৌদির দিকে তাকিয়ে হাসল জগদীশদা, আমি উৎপাত না করলে ওর মন খারাপ হয় কিনা।

ভালো লাগার সঙ্গে লজ্জার মেশামিশি চাপা দিতে কণ্ঠে ঈষৎ কৃত্রিম তীক্ষ্ণতা আনল মণিবৌদি—যত বয়স বাড়ছে মুখও তত আলগা হচ্ছে। যাই ভাই, তোমরা গল্প কর। এই শোন—

জগদীশদাকে ডাকার স্বর শুনেই নিলয় বুঝল।

—না বৌদি, এগারোটার সময় ঠা ঠা রোদে দাদাকে আবার বাজারে পাঠানো চলবে না। ঘরে যা আছে তা-ই খাব। লৌকিকতা করলে ভাবব আমি আপনাদের আপন নই।

—তুই খেপেছিস নিলয়, জগদীশদা বলল, ও বললেই আমি বেরুচ্ছি নাকি। তোর সঙ্গে কি আমার ভদ্রতার সম্পর্ক। তাছাড়া পকেটের অবস্থাও সুবিধের নয়।

মণিবৌদি মুখের নিরুপায় ভঙ্গি করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিলয়ের মন হঠাৎ শান্ত নিরুপদ্রব আশ্রয়ের আরাম বোধ করল। মানুষ কি শুধু টাকায় সম্পদে সচ্ছলতায়ই বাঁচে? কষ্টে, ভালোবাসায় প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধেও তো বাঁচে। সে বাঁচায় বাঁচার আনন্দ কি কম? জগদীশদার কাছে এলে তার আন্তরিকতা, জীবনকে বাস্তব অথচ সহজভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি মনের মধ্যে একটা শান্ত দৃঢ়তা এনে দেয়। মনে হয় মানুষ হারে তখনই যখন সে হার স্বীকার করে নেয়। জগদীশদা জীবনের মালিন্য কুশ্রীতা দৈন্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না (নিত্যদিনের সঙ্গীদের সে অস্বীকার করে কি করে!), কিন্তু পরাজয়কে সে কোনোমতেই স্বীকার করে না। পিছু হটতে হয় অনেক সময়, কিন্তু সেটা তার পরাজয় নয়, রণকৌশল। জগদীশদার নীরব যুদ্ধে রণহুংকার নেই, কিন্তু নিরাসক্ত নির্ভীক যোদ্ধার মানসিকতা সে ছড়িয়ে দেয় কাছের মানুষদের মনে।

—কিরে, কি ভাবছিস?

জগদীশদার প্রশ্নে নিলয়ের খেয়াল হল যে অনেকক্ষণ সে নির্বাক হয়ে আছে।

—না, মানে, এমনিই চুপ করে ছিলাম।

—বেশি ভাবিস না। কাজ আর ভাবনাকে যে পর্যন্ত মেলাতে পারবি সে পর্যন্তই

ভাববি, তার বেশি ভাবলে ভাবনা অসুখে দাঁড়াবে।…আচ্ছা, তুই বিভু সান্যালকে চিনিস ?

—না।

—লোকটার অনেক গুণ ছিল। উচুদরের ক্যামেরাম্যান। কিন্তু হেন দোষও নেই যা ওর ছিল না। তাই আউট হয়ে গেল লাইন থেকে। কালে-ভদ্রে দেখা হয়। কি করে কেউ জানে না। কিন্তু নেশা-ভাঙ মেয়েমানুষ আগের মতোই চালিয়ে যাচ্ছে। সেদিন দেখা হতে তোর কথা জিজ্ঞেস করল। হঠাৎ তোর সম্পর্কে ওর ইণ্টারেস্ট কেন জিজ্ঞেস করতে পাশ কাটিয়ে গেল। বুঝলাম না কি ব্যাপার। তোর কাছে গেলে একদম পাত্তা দিবি না।

নিলয়ের মনের মধ্যে তুরুপ সেনের ঘটনাটা কাঁটার মতো খচখচ করছিল। কিন্তু সংকোচ কাটিয়ে বলতে পারল না। অথচ তুরুপের তাকে এক ধরনের ব্ল্যাকমেল করে ইণ্টারভিউ আদায় করা এবং তার দু'হাজার টাকা নেয়া দুটো খবরই জগদীশদাকে বলতে পারলে সে শান্তি পেতে পারত। বিনোদন-বার্তার পক্ষ থেকে তার ইণ্টারভিউ নেয়াটাই একটা রহস্য। সাদামাটা ঘটনায় কি এমন রহস্যের আকর্ষণ আছে যে তুরুপ সেন অনায়াসে দু'হাজার টাকা তাকে দিয়ে গেল ? তার মানে এই আপাত-সহজ ব্যাপারটার পেছনে এমন কিছু আছে যা নিলয়ের বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না। তার ইণ্টারভিউটাকে তুরুপ সেন কিভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরে চমক সৃষ্টি করবে তা নিলয়ের বুদ্ধির বাইরে, কিন্তু জগদীশদা হয়তো আন্দাজ করতে পারত। কিন্তু ভয় ও দু'হাজার টাকার প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণের কাহিনী জগদীশদাকে বলতে বাধছে। অবশ্য শিগগিরই জগদীশদা জানবে, বিনোদন-বার্তায় রিপোর্ট বেরুলেই। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো। দেখা যাক তুরুপ সেন কি করে। বিপদ-আপদ হলে তখন জগদীশদার কাছে গিয়ে দাঁড়ানো যাবে। তাকে নিলয় আগে জানায়নি বলে সে অভিমান নিয়ে বসে থাকবে না। জগদীশদা তেমন মানুষই নয়।

—আচ্ছা জগদীশদা, নিলয় বলল, আমরা এইভাবেই পড়ে পড়ে মার খাব ?

জগদীশদা চারপাশে বিড়ির ধোঁয়ার জাল তৈরি করে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগল—আমার কি মনে হয় জানিস, গোটা দেশটার দিকে তাকালে ? আমরা যেন মৃত বা মুমূর্ষু কিছুকে আগলে বসে আছি। প্রাণপণে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছি এ মৃত বা মুমূর্ষু নয়, সামান্য অসুস্থ, সাধারণ চিকিৎসা হলেই সুস্থ হয়ে উঠবে। অথচ দরকার সংকারের জন্য তৈরি হওয়া। ঘরের ভেতরে মড়া

নিয়ে বাড়ির বাইরের বাগানে চন্দ্রমল্লিকা ফোটানোর কথা ভাবা যায় না। অথচ বড় বড় মাথারা তা-ই করছে। আমরা যারা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, সমস্তটা জড়িয়ে ভাবতে শিখিনি বা শেখানো আমাদের হয়নি, তাদের কি করার আছে? নিলয়, তুই একাই শুধু ডামি নোস। এক অর্থে দেশের বেশির ভাগ মানুষই কয়েকটা লোকের ডামি। যখন আমার যুক্তি তর্ক বুদ্ধি সমস্ত হারিয়ে যায়, কয়েকটা মানুষের তৈরি করা হাওয়ার সঙ্গে আমি ভেসে যাই, তখন কি আমি ডামি নই সেই লোকগুলোর?

নিলয় হেসে বলল—এসব তত্ত্ব কি আমার মাথায় ঢুকবে?

—আমার মাথায়ও যে ভালোভাবে ঢোকে তা নয়। মনে হয় এই পর্যন্ত। যেখানে বড় করে ভাবতে পারি না, সেখানে যার যেটুকু সাধ্য সৎভাবে বাঁচার আর বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। হ্যা, ছোট মাপের যুদ্ধের জন্য নিজেকে তৈরিও রাখতে হবে। এইভাবে মানুষের মনে সত্যিকারের বড় মাপের যুদ্ধেরও মানসিকতা তৈরি হবে। তখন যদি কিছু হয়। এখন যুদ্ধটা একক, বড় জোর ছোট ছোট গণ্ডির মধ্যে। আমরা তো বড় করে ভাবতেই শিখিনি।

জগদীশদা চুপ করে নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল। আর নিলয় ব্যক্তিগত সমস্যা-গুলোর মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতেও এই মুহূর্তে সেগুলো জগদীশদার কাছে মেলে ধরতে পারল না নতুন করে।

একসময় জগদীশদা বলল—তোর জন্য আমি ভাবছি। রাস্তা একটা ভেবে বার করবই। তোর সংসারটাকে তো ভেসে যেতে দেয়া যায় না।

—কই গো, চান করতে যাও। রান্নাঘর থেকে মণিবৌদির তাড়া এল।

খেয়ে-দেয়ে আড্ডা গল্প-গুজবে দুপুরটা কাটিয়ে বিকেলের দিকে হালকা মনে জগদীশদার বাড়ি থেকে বেরুল নিলয়।

বিকেলের ফিরতি বাসে বিশেষ ভিড় ছিল না। নিলয় জানলার ধারের সিটে বসে ঠাণ্ডা মাথায় নানা কথা ভাবছিল। জগদীশদা যতদিন আছে বৌ-বাচ্চা নিয়ে তাকে অন্তত উপোস করে মরতে হবে না। জগদীশদা তাকে রাজা-উজীর বানিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু খেটে-খেতে-চাওয়া মানুষদের জন্য হাজারো বুদ্ধি আছে তার মাথায়। শুধু বুদ্ধিতে কাজ হলে অবশ্য সংসারে এত লোকের এত সমস্যা থাকত না। আর যে দুটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন তাও মেলে জগদীশদার কাছে। তার

যোগাযোগগুলোকে সে কাজে লাগাতে জানে। কোন্ রাস্তায় কার সাহায্যে কার কোন্ সমস্যার সমাধান সহজে হবে তা সে ভেবেও নিতে পারে নিমেষে। আর পারে মানুষের মনে কাজ করবার একটা মানসিকতা এনে দিতে।

মোদ্দা কথা, বেঁচে থাকার জন্য যে কাজ সেইখানে সংস্কারমুক্ত হতে পারলে জগদীশদা তাকে পথ বাতলে দেবার ক্ষমতা রাখে। দিতে আগ্রহী। লড়াই করে বাঁচা মানে যে যার সীমার মধ্যে যতটুকু পারা যায় আদায় করে নেয়া নয়। জগদীশদা মনে করে লড়াই করে বাঁচা মানে জীবনটাকে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধক্ষেত্র মনে করা। লড়াই শব্দটাকে সে ছোট করতে রাজী নয়। লড়াই মানে শুধু মালিকের কাছ থেকে দাবি আদায়ের স্লোগান নয়। লড়াই তার চেয়ে ঢের বড় জিনিস। কিন্তু সেই বড় জায়গায় পৌছতে হলে সবার আগে দরকার কাজ করা, কাজকে সম্মান করতে শেখা। কাজকে সম্মান করতে না শিখলে কাজের জন্য দাম আদায়ের লড়াইয়ের ভিতটাই নড়বড়ে হয়ে যায়। জগদীশদা বলে, কাজ করে, কষ্ট করে বাঁচতে চেষ্টা করা প্রথম দরকার। জানি, চেষ্টা করলেই বাঁচার মতো কাজের সুযোগ সকলের নেই। কিন্তু চেষ্টা যে করে সে-ই বোঝে কষ্টের দাম, কাজের দাম। এরাই পারে সত্যিকারের লড়াই করতে। অনেক ঘাম ঝরিয়ে একজন সৈন্য তৈরি হয়। আমরা সব তালপাতার সেপাই। যুদ্ধও হচ্ছে সেই রকম। অথচ যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।

সারা দুপুর নিলয়ের পাশে শুয়ে গল্প করেছে জগদীশদা। বড় বড় বচন শোনানোর, আপ্তবাক্য বলার ভঙ্গি ছিল না। নিতান্ত সাদামাটা ভাষায় নিজের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি নিলয়কে শুনিয়েছে। নিলয়ের মধ্যবিত্ত মনের টানা-পোড়েন তার সব বক্তব্যের মর্ম ধরতে পারেনি, কিন্তু বিশ্বাস ও সাহসের ভূমি খোঁজার প্রয়োজন সে বোধ করেছে, যে মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভালোভাবে বুঝে নেয়া সম্ভব।

বাসটা হিলটন স্ট্রীটের মোড় হয়ে যায়। 'হিলটন স্ট্রীট, হিলটন স্ট্রীট' কণ্ডাকটরের চিৎকারে হঠাৎ যেন হুঁশ ফিরে এল নিলয়ের। মনে পড়ে গেল তুরুপ সেনকে। সে নিলয়কে বলেছিল একবার সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা করতে। তড়িঘড়ি বাস থেকে নেমে পড়ল নিলয়।

তুরুপ অবশ্য তাকে পরিষ্কার করে বলেনি সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা করে তার কি সুবিধা হবে। বলেছে, মহিলাকে একটু তোষামোদ করে এলে নিলয়ের তাতে ভালো হবে।

হতে পারে, নিলয় ভাবল, মহিলাটি দুঁদে, অরুণকুমারের মতো ব্যক্তিকেও সে

ভালো করেই বেঁধেছে। বড়লোকের মর্জির হদিশ মেলা ভার। অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটাকে অরুণকুমার কিভাবে নিয়েছে নিলয় তা জানে না। সাধারণত দুর্বলকে মেরে সবলের বড় আনন্দ। সবলে সবলে লড়াই সাজানো কুস্তির আসর, নেপথ্যে আপস-লাভের বাটোয়ারা। অরুণকুমার যদি মনে করে থাকে সেদিনের অ্যাক্সিডেন্টের জন্য নিলয় দায়ী তবে আর দেরি না করে অন্যত্র অন্নজলের সন্ধানে যাওয়াই তার উচিত। সুলক্ষণার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হলে অরুণকুমারের মনোভাব বোঝা যেতে পারে। আর সুলক্ষণা যদি সদয় হয় অরুণকুমারও নির্দয় হবে না আশা করা যায়। কিন্তু সুলক্ষণা কি রাজী হবে তার সঙ্গে দেখা করতে?

খানদানী পাড়া হিলটন স্ট্রীটের বিরাট অ্যাপার্টমেন্ট-হাউস স্নো-হ্যাভেনের বিপুল দুগ্ধশুভ্রতার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল নিলয়। সে কি যেচে অপমানিত হতে যাচ্ছে? সুলক্ষণা বড় বেশি স্ট্যাটাস-সচেতন, আর নিচের স্ট্যাটাসের মানুষদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করলে স্ট্যাটাস বজায় থাকে না বলেই বোধ হয় তার বিশ্বাস। সুলক্ষণার দুর্ব্যবহারের শিকারদের এ রকমই ধারণা। তুরুপ সেন তাকে এ কি ফাঁপরে ফেলল?—নিলয় ভাবল। নাকি অন্য কোনো মতলব আছে তুরুপ সেনের? সেটার আন্দাজ পেতে হলেও তো সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা করা দরকার।

যা থাকে কপালে—বুক ঠুকে এগিয়ে গেল নিলয়।

গেটের দারোয়ানের চোখে বিস্ময়। সে কোনো প্রশ্ন করল না। অরুণকুমারের সম্ভ্রান্ত সুন্দর সাদৃশ্যের ছাড়পত্র!

চত্বরে টবের সযত্ন বাগানে উচ্চকোটি মহিলাদের পদচারণা, বেঞ্চে বেঞ্চে ইংলিশ-মিডিয়মে পালিশ করা ইংরেজী, বয়কাট্-ববছাঁটের বাংলা, আঁকাড়া রাজস্থানী-গুজরাতী। পরিচারিকাদের তত্ত্বাবধানে মাল্‌টি-ন্যাশানালের শিশু-খাদ্যের বিজ্ঞাপনের শিশুরা।

নিলয়ের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় চোখে চোখে অজস্র কানাকানির অনুভূতি দিচ্ছিল তাকে।

সে পা চালিয়ে লিফ্‌টের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

লিফ্‌ট্‌-ম্যান তাকে সেলাম জানাল। হতে পারে এটা তার চাকরির প্রয়োজনে অর্জিত অভ্যাস। কিন্তু নিলয়ের মনে হল সে অরুণকুমারের প্রাপ্য সেলাম থেকেই খানিকটা চুরি করে নিয়েছে।

লিফ্‌ট্‌ নিলয়কে পৌঁছে দিল পরিবেশদূষণ-মুক্ত এগারো তলার নির্মল বাতাসে, যেখান থেকে নিচে তাকালে প্রহৃত ক্লান্ত নগরীকে আশ্চর্য জীবন্ত ও সুন্দর মনে হয়।

অরুণকুমারের ফ্ল্যাটের দরজায় কলিং বেল টিপল নিলয়। ভেতরে একটি পাখি মিষ্টি ডেকে উঠল দু'বার।

দরজার ছ'ইঞ্চি ফাঁকে একটা সতর্ক মুখ উঁকি দিল।

—কাকে চাই?

—সুলক্ষণা দেবী আছেন?

—আছেন। আপনি ভেতরে আসুন।

অত্যন্ত সহজে দরজা খুলে গেল। অবিশ্বাস্য সহজে। সেই সাফারি-পরা সম্ভ্রান্ত চাকরটিকে চিনতে পারল নিলয়, যে একবার তাকে অরুণকুমারের শরীরচর্চার ঘরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেও নিশ্চয়ই চিনেছে নিলয়কে, নিলয়কে না হোক অন্তত অরুণকুমারের সঙ্গে তার চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্যকে, নইলে এত সহজে প্রবেশাধিকার মেলা অযৌক্তিক।

—বসুন।

ড্রইংরুমের সোফায় নিলয়কে বসিয়ে চাকর বলল—কি বলব মেমসাহেবকে?

—আমি ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। বলুন, নিলয় মজুমদার···নাম বললে উনি কি চিনবেন···আপনি বরং বলুন···

ভরসা দিল চাকর—আমাকে আপনি বলে লজ্জা দেবেন না স্যার। মেমসাহেবকে আমি যা বলবার বলছি। আমার নাম স্যার, ভিকি। বাপের দেয়া নাম ছিল ভজকৃষ্ণ। সাহেব পালটে ভিকি করেছেন। নামটা খুব ইস্‌মার্ট, না স্যার?

—হ্যাঁ, চমৎকার নাম। তা, তোমাদের কুকুর-টুকুর নেই তো ভিকি? কুকুরকে আমার ভীষণ ভয়। তুমি মেমসাহেবকে খবর দিতে গেলে আর কুকুর আমাকে তেড়ে এল···

—না স্যার, কুকুর আমাদের নেই। মাঝখানে ছিল একটা, মেমসাহেব আমার সঙ্গে মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন ডিকি। তা, সে ব্যাটা স্যার, শুধু কার্পেটে মুতবে। কিছুতেই বাথরুমে যাবে না। মেমসাহেব স্যার ওকে ভীষণ ভালোবাসতেন, কিন্তু ভালো ভালো কার্পেটগুলো নষ্ট করা কাঁহাতক সহ্য হয় বলুন, শেষ পর্যন্ত মেমসাহেব এক বন্ধুকে দিয়েই দিলেন কুকুরটা। তিন দিন ভীষণ মন খারাপ হয়েছিল মেমসাহেবের। আমার কিন্তু স্যার একটুও দুঃখ হয়নি, গলা নামাল ভিকি, বলুন স্যার, ভিকির সঙ্গে মিলিয়ে কুকুরের ডিকি নাম রাখা···আপনি কিন্তু স্যার মেমসাহেবকে বলে দেবেন না যেন···

—আরে না না···

—আপনাকে স্যার ডিকি দেখলেও কামড়াতে আসত না, ব্যাটার কিন্তু স্যার কামড়ানোর অভ্যেস ছিল খুব।

—কেন, আমাকে ছাড় কেন? আমি কে এমন মহাপুরুষ?

—আপনার সঙ্গে স্যার, সাহেবের এমন মিল না, ডিকি আপনাকে সাহেব বলেই মনে করত।

—না ভিকি, কুকুর ভুল করে না। ওদের মানুষ চেনার ব্যাপারটা অন্যরকম। কিন্তু তুমি যে আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছ, মেমসাহেব তোমাকে বকবেন না?

—না স্যার, এখন বকবেন না। এখন শব্দটায় বিশেষ মোচড় দিল ভিকি।

—ভিকি, ভিকি। পাশের ঘর থেকে সুলক্ষণার ডাক।

গলাটা চেনা নিলয়ের, এবং মনে হল যেন একটু জড়ানো। শ্রদ্ধা ও বিনয়ের ভঙ্গিতে নিজেকে আড়ষ্ট করে রাখল নিলয়।

—এই রে, চলে এসেছে। ফিসফিস করে বলে ভিকি ছুটল।

—কার সঙ্গে কথা বলছিলে ভিকি? সুলক্ষণার প্রশ্ন।

নিলয় উৎকর্ণ।

—এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—ইডিয়ট, ঢুকতে দিলে কেন আমাকে জিজ্ঞেস না করে? যে-সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেই তুমি দরজা খুলে দেবে? তুমি জান আমি কে? জান?

—জানি মেমসাব, আপনি সবার বড় আর্টিস। আপনার সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না। জজগুলো গাধার বাচ্চা বলে আপনাকে ন্যাশানাল অ্যাওয়ার্ড দেয়নি। গড়গড করে মুখস্থের মতো বলে গেল ভিকি।

—গুড, ভেরি গুড।

রীতিমতো মত্ত সুলক্ষণা। ঘামতে ঘামতে ভাবল নিলয়। মাতাল সুলক্ষণার মূর্তি তার জানা নেই। মানে মানে সরে পড়বে নাকি? নাঃ, দেখাই যাক, হয়তো মাতাল সুলক্ষণা স্বাভাবিক সুলক্ষণার মতো অতটা বিপজ্জনক নয়।

—এই, এই ইডিয়ট ভিকি, আমার প্রশ্নের উত্তর কোথায়? লোকটা উইদাউট মাই পারমিশন ফ্ল্যাটে ঢুকতে পেল কি করে?

—ভদ্রলোককে একেবারে আমাদের সাহেবের মতো দেখতে। আগেও এসেছেন। তাই···

—ও, তাহলে স্যাট ভামি বয়, নিলয় না কি যেন···বলতে বলতে পর্দা সরিয়ে সুলক্ষণা ড্রইংরুমে এসে দাঁড়াল।

কাঠের পুতুল নিলয় অনেকটা ঝুঁকে নমস্কারের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। এক নজরে যেটুকু দেখল সুলক্ষণাকে তাতেই দ্বিগুণ ঘামতে লাগল সে। ফিনফিনে স্বচ্ছ ড্রেসিং গাউনের পেছনে সমস্ত অবয়বের রেখাগুলো স্পষ্ট। কটকটে লাল রঙের অতি সংক্ষিপ্ত ব্রা-প্যান্টি। ঠোঁটের কালচে লাল লিপস্টিকের আস্তর আর মুখের গোলাপী পেন্ট ধেবড়ে গেছে এখানে-সেখানে। টেনে টেনে চোখের পাতা মেলে রাখছে সুলক্ষণা। টলমল পায়ের ওপর শরীরটা দুলছে অল্প অল্প।

কোনোমতে এসে সোফায় গা ছেড়ে দিল সুলক্ষণা। বসবার আদেশের অপেক্ষায় নিলয় দাঁড়িয়ে। ভিকি দরজার কাছে।

—সিট ডাউন, সিট ডাউন। নাচের ভঙ্গিতে আন্দোলিত হল সুলক্ষণার হাত।

নিলয় বসল জড়সড় হয়ে।

—বলুন ইয়ং হ্যানসাম, কি করতে পারি আপনার জন্য।

নিলয় হঠাৎ আবিষ্কার করল তার বলবার কিছু নেই।

—মানে···ভাবলাম···এই···। শব্দগুলোকে হাতড়াতে লাগল নিলয়।

—বলুন, বলুন···। বুকের ওপর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল সুলক্ষণার।

—যদি আপনার কোনো কাজে লাগতে পারি···মানে স্যারের দয়ায়ই আমার সব···। নিরর্থক কয়েকটা শব্দ আউড়ে গেল নিলয়।

সুলক্ষণার ওপর তার কথার কোনো প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে না নিলয় লক্ষ্য করল। কোনো ভদ্রমহিলাকে এভাবে মাতাল হতে নিলয় কখনো দেখেনি। মনের ভেতরে ভয় আর শঙ্কার আড়ষ্টতা সরিয়ে বিশ্রী বিরক্তি।

সে চুপচাপ বসে রইল। সামনে সুলক্ষণার নির্লজ্জ উপস্থিতি। ওকে এখন আর নিলয়ের বিন্দুমাত্র ভয় করছে না। কুশলী গবেষকের মতো নিলয় সুলক্ষণাকে দেখতে লাগল।

—ওফ্, ইট্‌স্ টু হট্, টু হট্। ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়াল সুলক্ষণা।

এখানেই সাক্ষাৎকারের ইতি ভেবে নিলয়ও দাঁড়াল।

হঠাৎ নিলয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন ওকে আবিষ্কার করল সুলক্ষণা। নিলয়ের মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির রাখবার চেষ্টা করতে করতে অদ্ভুত হাসির সঙ্গে বলল—বড্ড গরম, না?

—হ্যাঁ।

—কাম অন্। ঠাণ্ডায় বসে গল্প করি। মুহূর্তে নিলয়ের একখানা হাত সুলক্ষণার দখলে।

পরিস্থিতিটা ভালো করে বুঝে ওঠবার আগেই নিলয় দেখল সুলক্ষণা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। নিলয় বাধা দিতে পারছে না বা কি তার করণীয় ভেবে পাচ্ছে না। ভিকির দিকে তাকাতে সে তার অবস্থানের সঙ্গে অত্যন্ত বেমানানভাবে নিলয়কে চোখ মারল।

অবিশ্বাস্য বেড-রুমের ঠাণ্ডা আরামে নিলয়কে নিয়ে গিয়ে তার হাত ছেড়ে দিল সুলক্ষণা। পেছনে ধীর সৌজন্যে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। সুলক্ষণা গড়িয়ে পড়ল বিছানায়—আঃ…

বিরাট ঘরটার আশ্চর্য সজ্জা অলঙ্করণ আর হিমশীতলতার মধ্যে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে নিলয়।

—কাম অন্। সুলক্ষণার বিলোল আহ্বান।

পাথরের থামের মতো দুটো পা নিলয়কে মেঝের সঙ্গে গেঁথে রেখেছে।

বিছানায় কয়েকটা গড়াগড়ি দিয়ে উঠে এল সুলক্ষণা। নিলয়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় আলতো করে ওর গালে টোকা দিয়ে হাসল। দেয়ালের কাছে গেল সুলক্ষণা, কি যেন করল, অলৌকিক দেয়াল থেকে রিমঝিম বাজনা ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। নকশা-কাটা কাচের কারুকার্যের আড়াল সরে গেল আঙুলের ছোঁয়ায়, রঙিন বোতলের সম্ভার থেকে একটা তুলে নিয়ে বিছানার পাশে নিচু গোল টেবিলে রাখল সুলক্ষণা। কাট-গ্লাসের দুটি পাত্রে ঢালল সেরা হুইস্কি।

—এসো। লেট্‌স্ হ্যাব এ নাইস টাইম। সুলক্ষণা বসল বিছানার কিনারে।

—মাপ করবেন, আমি ড্রিঙ্ক করি না। ঘরঘরে আওয়াজ বেরুল নিলয়ের গলা থেকে।

—আই সী।

একে একে দু'টি গ্লাসের মদ গলায় ঢেলে দিল সুলক্ষণা। চোখ বুজে কপাল কুঁচকে বসে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর উঠে দাঁড়াল। গালের মাংস স্নায়বিক আক্ষেপ থিরথির করে কাঁপছে। চোখের হাসিতে কামনা-ক্রূরতা।

—তুমি জান না ইয়ং হ্যানসাম, আমি কি ভীষণ আনহ্যাপি। আমি সব ছেড়েছি অরুণের জন্য…বাট হি…ওর অ্যাফেয়ার্সের শেষ নেই…কিন্তু আমি সুলক্ষণা…আই

ডোন্‌ট্‌ কেয়ার, কাম অন্‌, লেট্‌স্‌ এনজয়···

হাতের এক টানে ড্রেসিং গাউনটা সুলক্ষণার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। নিপুণ আঙুলে ব্রা-প্যান্টি খুলে গেল। নিলয়ের সামনে সুলক্ষণার উলঙ্গ অশ্লীল অন্ত্য-যৌবন।

দৃষ্টিহীন পাথুরে চোখে তাকিয়ে আছে নিলয়। অরুণকুমার-সুলক্ষণা—প্রেম-পূর্ণতা-বৈভব! মুখোশের অন্তরালে হা হা করছে শূন্যতা। এরই নাম সুখ? এরই নাম সম্পদ? ঘৃণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে নিলয়। এদেরই কৃপাপ্রার্থী হয়ে এসেছে সে?

নিলয়ের শুষ্ক মৃত গাছের মতো কঠিন শরীরের ওপর এসে আছড়ে পড়ল সুলক্ষণা। বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলতে থাকল বারবার—প্লিজ···প্লিজ···ইউ আর সো মাচ লাইক অরুণকুমার অব ফিফটিন ইয়ারস ব্যাক···

প্রসাধন অ্যালকহল আর অস্নাত শরীরের কটু গন্ধে নিলয়ের মনে হল সে এক্ষুনি তার বুকের ওপর রাখা সুলক্ষণার মাথায় বমি করে ফেলবে।

—দুঃখিত, আমি ইমপোটেণ্ট।

এক ঝটকায় সুলক্ষণাকে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে কোনো দিকে না তাকিয়ে দরজার দিকে এগোল নিলয়।

পেছন থেকে সাপের মতো হিসহিস করে উঠল সুলক্ষণার গলা—ইউ বাস্টার্ড!

১২

দু'দিন ধরে নেহাত দরকার না পড়লে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে না নিলয়। বেরুতে ইচ্ছেও করে না। আবার কখন কি উৎপাত দেখা দেয় কে জানে। তার চেয়ে চার দেয়ালের মধ্যে মা-নিনা-বাবুসোনার সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগে। যদিও নিলয় ভালোই জানে চার দেয়ালের নিরাপত্তার জন্যও প্রয়োজন টাকার। টাকা ঘরে বসে পাওয়া যাবে না। আপাতত তুরুপ সেনের দেয়া দু'হাজার টাকা নিরাপত্তার যোগান দেবে। কিন্তু তারপর? মা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে সময় লাগবে, অর্থাৎ নিয়মিত সংসার-খরচের ওপরেও টাকার দরকার। আসবে কোথা থেকে? নিলয় চিন্তা না করবার চেষ্টা করে। অবশ্য বৃথা চেষ্টা।

নিলয়ের মনের মধ্যে আরো একটা কাঁটা বিঁধে আছে। সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা করার ঘটনা নিনাকে বলার জন্য বারবার মনের ভেতর থেকে তাগিদ এসেছে। নিনার

কাছে কোনোদিন কোনো কিছুই সে গোপন করেনি। কিন্তু বলতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়েছে। নিনা ওকে অবিশ্বাস করবে না, এ বিশ্বাস নিলয়ের আছে। বড় জোর ওর বোকামিকে একটু খোঁটা দেবে। তবু নিলয় বলতে পারেনি। দৃশ্যটার বীভৎসতাই ওকে নীরব করে রেখেছে।

মানুষের পদস্খলন অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তা যে এত কদর্য নির্লজ্জ একটা অভ্যাস হতে পারে তা নিলয়ের ধারণার মধ্যে ছিল না। হ্যাঁ, সুলক্ষণার ক্ষেত্রে এটা যে অভ্যাস তাতে নিলয়ের সন্দেহ নেই। অধঃপতনকে কতখানি স্বাভাবিক করে নিতে পারলে মানুষ তার পরিবেশ আশপাশের মানুষকে পর্যন্ত ভুলে যেতে পারে!

এই কুৎসিত অভিজ্ঞতার ভাগ নিনাকে দিতে মন থেকে সায় মেলেনি নিলয়ের। কিন্তু গোপনতার অন্তর্দাহ বড় কম নয়। কারণ ওদের দু'জনের মধ্যে কোনো আড়াল নেই, কোনোদিন আড়াল সৃষ্টির চেষ্টাও ওরা করেনি। সত্যিকারের ভালোবাসা-বন্ধুত্ব আড়াল রাখতে দেয় না। যত গোপনেই পর্দা টানা হোক একজনের মনের কোণায়, অন্যজন তার উপস্থিতি টের পাবেই, হয়তো জানবে না পর্দাটার রঙ-নকশা।

নিনা কয়েকবারই ওকে বলেছে এই ক'দিনে 'তুমি বোধ হয় কিছু লুকোচ্ছ আমার কাছ থেকে।' নিলয়ের উত্তর প্রশ্নটার বারবার ঘুরে আসা ঠেকাতে পারেনি। আশ্চর্য মানুষের মন, আশ্চর্য মানুষের সম্পর্ক। সামান্য গোপনতা নিলয়কে দিচ্ছে মানসিক যন্ত্রণা, আর নিলয়ের মনের সেই গোপন যন্ত্রণা নিনার মনেও ঢেউ তুলছে। অথচ সুলক্ষণা নির্বিকার ব্যভিচারে অভ্যস্ত, অরুণকুমারও নিশ্চয় তা-ই। ওদের মনে কি পরস্পরের কোনো আড়ালই আবেগ উৎকণ্ঠা প্রশ্ন সৃষ্টি করে না? অথচ সম্পর্কটা নাকি দু ক্ষেত্রেই এক—ভালোবাসার, বন্ধুত্বের এবং স্বামী-স্ত্রীর। নিলয়ের বারবার অদ্ভুত সব প্রশ্ন জাগে। কোন্ প্রয়োজনে অরুণকুমার-সুলক্ষণা একসঙ্গে থাকছে? দেহ? টাকার যাদের ইয়ত্তা নেই এ প্রয়োজন তারা যত্রতত্র মেটাতে পারে। সঙ্গ, সান্নিধ্য? অবিশ্বাস্য ঘৃণা আর বঞ্চনার ওপর দাঁড়িয়ে সঙ্গ-সান্নিধ্য? তাহলে কি বিপুল সম্পদ আর অবিশ্রান্ত ভোগের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে থাকতে মনের জানলা দিয়ে বাইরের নীল আকাশে তাকাতেও ভুলে যায় মানুষ? তৃপ্তিহীন অবিরাম ভোগ থেকে হৃদয়হীনতা—সুখের অসুখ। বিত্ত ভোগ আর হৃদয়হীনতার পাপবৃত্ত। অলস সময় বারবার নিলয়কে এইসব জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়।

এ সময় হঠাৎ নান্টুর আবির্ভাব।

চার বছরে বোনের বাড়িতে এই তার দ্বিতীয় আগমন। প্রথমবার এসেছিল বছর

তিনেক আগে। শ'চারেক টাকা ধারের আবেদন নিয়ে। টাকার যে-প্রয়োজন নান্টু জানিয়েছিল তাতে বা ফেরত পাবার সম্ভাবনায় নিনার বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। লজ্জায় মুখ বুজে থাকবার মতো মেয়েও ও নয়। তাই নিলয়ের উপস্থিতিতেই প্রচণ্ড জেরার মুখে পড়তে হয়েছিল নান্টুকে। নিলয়ের ভূমিকা ছিল নির্বাক দর্শকের। নতুন আত্মীয়ের সঙ্গে তার সামনেই নিনার এই ব্যবহারে নিলয় লজ্জা পাচ্ছিল, কিন্তু নান্টুর কীর্তিকলাপের যেটুকু তার জানা ছিল তাতে নিনাকে বাধা দেয়াও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বোন-ভগ্নীপোতের এই ষড়যন্ত্রে (!) নান্টুর আত্মসম্মানে (!) ভীষণ ঘা লেগেছিল। বেরিয়ে যাবার সময় সে প্রতিজ্ঞা করেছিল এ বাড়িতে যদি আর কখনো পদার্পণ করে তাহলে সে মনুষ্য-সন্তান নয়।

তারপর থেকে সত্যিই সে আর আসেনি। নিলয় মাঝে মাঝে নিনাকে মনে করিয়ে দিয়েছে—'তোমার বড়দা প্রতিজ্ঞা রেখেছে। একদিনও এল না তারপর। মিটিয়ে নাও না, হাজার হোক ভাই।' নিনার স্পষ্ট জবাব—'তুমি হয়তো মনে করছ অপমান করেছি বলে ও আসে না। আসলে তা নয়। আমার দাদাদের তুমি জান না। ধান্দার সুবিধা থাকলে লাথি খেলেও হাজার বার আসত।' নিলয় তর্ক বাড়ায়নি। ভাইদের সম্পর্কে বোনের এ তিক্ততা অকারণে নয়।

—আসুন বড়দা, আসুন, নিলয় অভ্যর্থনা জানাল, আপনি তো এমুখো হওয়া ভুলেই গেছেন।

নিনার বড়দা, সম্পর্কের মর্যাদা দেখাতেই হয় নিলয়কে।

—আরে নিলয়বাবু, সময় কোথায় আমার। পার্টির প্রোগ্রাম লেগেই আছে। আজ থানা ঘেরাও, কাল রেশন অফিসে আফিসারকে কড়কানো, পরশু কোর্ট, বুঝলে, এক মুহূর্ত সময় নেই। এলাকার পুরো চার্জে আমি। ফরফর করে বলে গেল নান্টু।

—আপনি পার্টি করেন? জানতাম না।

—কেন, সুরো বলেনি তোমাকে?

—না।

—বুঝেছি। সেদিন বাড়িতে সামান্য একটা ব্যাপার হয়েছিল। মানে সামান্য বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম আর কি। তা, বাপরে বাপ, সে কি রাগ, ভাত না খেয়ে চলে এল। তাই ভাবলাম, যাই দেখি রাগ পড়েছে কিনা। তা যা বলছিলাম নিলয়বাবু, ভেবে দেখলাম এ শালা দেশের ভালো করতে হলে পার্টি করতেই হবে। যাহা ভাবা তাহা কাজ। পার্টি আমাকে আগেই টোপ দিয়ে রেখেছিল। আমার

হাতে ভালো ভালো ছেলেপুলে আছে তো…হাঃ হাঃ…তাই আমি হ্যাঁ বলতেই পার্টি আমাকে লুফে নিল। আরে, আমাকে তো কেউ দামই দিল না। কিন্তু পার্টি আমার কদর বুঝেছে। আজ ও তল্লাটে আমাদের পার্টি মানেই যুবনেতা নান্টু রায়। অন্য পার্টি করা ঘুচিয়ে দেব শালাদের এবার। প্যাদানো সবে শুরু করেছি…হাঃ হাঃ। অনাবিল হাসি ছড়িয়ে দিল নান্টু।

—এই, ও ঘরে বসে বসে তোর বক্তিমে শুনছিলাম, ঘরে ঢুকেই দাঁত খিঁচিয়ে শুরু করল নিনা, তোকে আমার বাড়িতে কে আসতে বলেছে।

—দেখেছ নিলয়বাবু, নিনার কথা গায়েই মাখল না নান্টু, বড় ভাইকে কি রকম ডাঁটাচ্ছে। দোষ অবশ্যি আমাদেরই। বাবা-মা'র একটাই মেয়ে, আমাদের দু'ভাইয়ের একটা মাত্র বোন। আদর পেয়ে পেয়ে বাঁদর হয়েছে একটি। হাঃ হাঃ।

—হ্যাঁ, খুব আদর পেয়েছি, হাড়ে হাড়ে আদর পেয়েছি, নিনা ঝাঁজিয়ে উঠল, এখন কি তালে এসেছিস তা-ই বল্।

—এই নিনা, কি হচ্ছে! নিলয় অপ্রস্তুত হয়ে বলল।

—আরে নিলয়বাবু, তুমি মিথ্যে লজ্জা পাচ্ছ, নান্টু বলল, আমাদের ভাই-বোনে এ রকম খুনসুটি লেগেই আছে।

—থাক, প্রচুর ন্যাকামো হয়েছে। এবার কি বলবি বল্। নিনা বলল।

—বলব আবার কি। তোরা কেমন আছিস দেখতে এলাম। তা, শুধু কি ঝগড়াই করবি, চা-টা খাওয়াবি না?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। নিলয় ব্যস্ত হয়ে উঠল। নিনার ব্যবহারে সে লজ্জা পাচ্ছিল।

—এসেছিস যখন, চা এক কাপ পাবি, নিনা বলল, ছোড়দাকে ছেড়েছে?

—ছাড়বে না মানে। যুবনেতা নান্টু রায় অমনি অমনি কাটায় না। যে কথা সেই কাজ।

—কোর্ট খালাস করে দিয়েছে না জামিনে আছে?

—জামিনেই আছে। তবে ও আমি ঠিক খালাস করিয়ে নেব, দেখিস।

—বুঝেছি। বাড়ি বিক্রির মতলব ছেড়েছিস?

—কোথায় যে কি শুনিস…

—ঠিকই শুনেছি।

—আমি কি পাগল নাকি। আরে, ঐ জমিতে আমি পাকা বাড়ি তুলব। এ আর

সেই ফেকলু মহম্মদ নান্টু রায় নয়, যুবনেতা নান্টু রায়, মনে রাখিস। খবর নিস কলোনিতে, দেখবি আমার কি সম্মান।

নিনা ঠোট উলটে বলল—সম্মান না কচু। তোকে লোকে ভয় করে।

—কি যে বলিস তুই স্বরো, আমি কি বাঘ-ভাল্লুক যে লোকে আমাকে ভয় করবে। বাদ দে বাজে তর্ক। বাবুসোনা কোথায়?

—ও ঘরে, মা'র কাছে আছে।

—মা?

—হ্যাঁ, আমার মা। নিলয় বলল।

—তোমার মা কি এখন এখানে আছেন?

—হ্যাঁ।

—গুড, ভেরি গুড। নান্টুর ভঙ্গি বিজ্ঞজনোচিত।

—বোস্, আমি চা করে আনছি।

নিনা ভেতরে চলে গেল। নান্টু পকেট থেকে কিং-সাইজ দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল। সম্পর্কের বড়ত্ব বজায় রাখতেই সম্ভবত নিলয়কে নিতে বলল না। মোক্ষম টানে একবুক ধোঁয়া গিলে আস্তে আস্তে নাক-মুখ দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে বলল—তারপর?

—এই, চলে যাচ্ছে আর কি।

—নতুন করে ভাব, বুঝলে, নতুন করে ভাব। তোমরা ইয়ংম্যান, তোমরা দেশের জন্য না ভাবলে, না করলে, কে ভাববে, কে করবে।

নান্টুর বলার স্বর শুনে নিলয়ের মনে হল সে তার কোনো নেতার অনুকরণ করার চেষ্টা করছে। নেতা হবার শিক্ষানবিশী চলছে বোধ হয় ওর। হালফিল কোনো কোনো ডাকসাইটে নেতার যা ব্যাক-গ্রাউণ্ড দেখা যাচ্ছে তাতে অবশ্য নান্টুর যোগ্যতা প্রশ্নাতীত।

হাসি চেপে নিলয় বলল—যাকে তাকে দিয়ে কি দেশের কাজ হয়। কত স্যাক্রিফাইস দরকার।

—ঠিকই বলেছ। এই যে স্বন্টুকে পুলিস ধরে নিয়ে গেল, ওয়াগন ভাঙা আর পুলিসের ওপর বোমা মারার চার্জ এনে মামলায় ঝুলিয়ে দিল, এই যে কলঙ্কের কালি ওর মুখে লেপে দিল, এসবই যে স্বন্টু হাসিমুখে মেনে নিচ্ছে, সে তো শুধু দেশকে ভালোবাসে বলেই ··

নাণ্টুর বক্তৃতায় বাধা দেবার ইচ্ছা নিলয়ের ছিল না, কিন্তু মুখ দিয়ে বিস্ময় ও প্রশ্নের যুগ্ম ধ্বনিটা স্বতঃই বেরিয়ে এল—অ্যাঁ !?

—হ্যাঁ, আমাদের পলিটিক্যাল অপোন্যান্টরা চাইছে আমাদের নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে লোকের চোখে আমাদের হেয় করতে, কিন্তু দেখে নিও ওরা পারবে না, নাণ্টুর গলায় আবার বক্তৃতার সুর, আমরা জানি সুণ্টুর মতো দেশপ্রেম সবার থাকে না, দেশের জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকারও সবাই করতে পারে না, কিন্তু সবাই যদি দেশের কথা ভেবে ঠিকভাবে যার যার নিজের কাজ করে যায়, তাহলেই চড়চড় করে দেশ এগিয়ে যাবে। শিল্পপতি, ব্যবসাদার, শ্রমিক-কর্মচারী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, চোর-ডাকাত, আলুওলা, পটলওলা···

—চোর-ডাকাত ?

—ওটা ফোলোর মুখে বেরিয়ে গেছে, নাণ্টু হাসল, ভেবে দেখলে আমি কিন্তু ভুল বলিনি। চোর-ডাকাত যতই চুরি ডাকাতি করুক পুলিস ঠিকভাবে কাজ করলেই তারা ধরা পড়বে। তা তো করবে না, ধরবে সুণ্টুর মতো পেট্রিয়টদের।

—না বড়দা, চুরি ডাকাতি কালোবাজারি যাতে না হয় সেভাবে দেশটাকে তৈরি করতে পারলে তবেই অল্পস্বল্প অপরাধ হলেও তা দমন করা সম্ভব।

—দূর দূর, ও বইতে লেখা থাকে। কাজে হয় না।

—পৃথিবীতে এমন বহু দেশ আছে যেখানে অপরাধ জনসংখ্যার তুলনায় হিসেবের মধ্যেই আসে না। তারা রোগের আসল জায়গাটা ধরেছে।

—এই রে নিলয়বাবু, বিস্ময়ে নাণ্টুর চোখ গোল হয়ে উঠল, তুমি কম্যুনিস্টদের মতো বলছ ! সব প্রচার, মিথ্যে প্রচার ! আমেরিকার কথা তুলছিই না, গুরুদেব দেশ মাইরি, কি নেই। আমাদের দেশেও যা ফুর্তি-ফার্তার ব্যবস্থা আছে কম্যুনিস্টদের দেশে তাও নেই। তবে ?

নাণ্টুর মোক্ষম যুক্তির সামনে নিলয় থ বনে গেল। এরপর আর কোন্ বিষয়ে নাণ্টুর সঙ্গে আলোচনা করা যায় ভাবতে ভাবতেই নিনা চা আর নারকেল চিনি দিয়ে মাখা চিঁড়েভাজা নিয়ে ঘরে এল। যাক, শুধু এক পেয়ালা চা ঠেকানোর মতো কাণ্ড যে নিনা করেনি তাতে নিলয় খুশি হল।

নাণ্টু গদগদ হয়ে বলল—দেখলে নিলয়বাবু, যত গালাগালিই করুক; দাদাকে ভালোবাসে।

—খেয়ে বিদেয় হ। মুখ ঝামটা দিল নিনা।

এক গাল চিঁড়ে মুখে দিয়ে আরাম করে চিবোতে চিবোতে চিবোনোর ফাঁকে ফাঁকে নাণ্টু বলল—আরে নিলয়বাবু, তুমি ফিলিমে কি কাজ কর জানতাম না। স্বরো কখনো বলেনি। কাগজে নাকি বেরিয়েছে তুমি অরুণকুমারের ডামির কাজ কর। তোমাকে নিয়ে নাকি কি সব গোলমাল লেগেছে! অরুণকুমার জখম হওয়ার সময় তুমি ছিলে বলছে।

নিলয় বুঝতে পারল বিনোদন-বার্তায় তার ইণ্টারভিউটা বেরিয়েছে, এবং তুরুপ সেন সম্ভবত উলটোপালটা লিখেওছে।

চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করল নিলয়—কি লিখেছে জানেন?

—নাঃ। ফালতু কাগজ পড়ার সময় আমার নেই, ইচ্ছেও নেই। কিন্তু তুমি আর কাজ পেলে না? ডামিগিরি আবার একটা কাজ!

নিলয় মনে মনে বলল, হ্যাঁ আমি ডামি। তুমি কি শালা? তুমি ডামি নও?

মুখে বলল—কি করা যাবে বলুন, এটাও একটা প্রফেশন।

নাণ্টু কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে নিনা বলে উঠল—তোর মতো মস্তানি করে খায় না।

—বলিস না, বলিস না, নিনার কথা গায়েই মাখল না নাণ্টু, একটা বোগাস কাগজ আমাকে সমাজবিরোধী বলেছিল, তা আমার ছেলেরা এ অপমান সহ্য করতে না পেরে ওদের প্রেসটা জ্বালিয়ে দিয়েছে।

—নিজেই বলে দিচ্ছিস তোরা কি। নিনা বলল।

—আমার ওপর রাগটা তোর এখনো গেল না দেখছি, চায়ে মৌজ করে চুমুক দিল নাণ্টু, শোন্, কাজের কথাটা আগে সেরে ফেলি, পরে হয়তো ভুলেই যাব। হাজার ঝামেলা মাথায়…। এক ভদ্রলোক তোমাকে দিয়ে কিছু কাজ করাতে চান নিলয়বাবু, তুমি যদি রাজী থাক ভালো পয়সা দেবে।

—কি কাজ? নিলয় তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল নাণ্টুর দিকে।

—ফিল্মেরই কাজ। ঠিক কি করতে হবে জানি না, বিজ্ঞাপনের ছবি-টবি হবে। লোকটার অগাধ পয়সা, ভালো টাকাই দেবে মনে হল।

নিনা ঝাঁপিয়ে পড়ল একেবারে—এই, গুলপট্টি মারার জায়গা পাসনি? ওকে যার দরকার সে ওর কাছে সোজাসুজি না এসে তোর কাছে গেছে এ আমায় বিশ্বাস করতে হবে? তুই কে রে? তোকে কোনো ভদ্রলোক পাত্তা দেয়?

বিন্দুমাত্র মেজাজের হেরফের হল না নাণ্টুর, তেমনি সহজভাবেই বলল—কেন

আমাকে দিয়ে বলাচ্ছে তা জানি না। আমাদের পার্টির খুব কাছের লোক, সেই সূত্রেই আমার সঙ্গে আলাপ। আরে, আমার কি পজিশন তুই ভাবতে পারবি না। হাতে পাঁজি মঙ্গলবারের দরকার কি, আমি ভদ্রলোকের কার্ড রেখে যাচ্ছি, নিলয়ের পোষায় করবে, না পোষায় করবে না। আমি এর মধ্যে নেই। বিজনেস ইজ বিজনেস। ফেল কড়ি মাখ তেল। আমার বন্ধু বলে তোমাকে খাতির করতে হবে না ওকে। বলে একটা কার্ড পকেট থেকে বের করে নিলয়ের হাতে দিল নাণ্টু।

নিলয়ের সঙ্গে মুহূর্ত চোখাচোখি হল নিনার।

—দেখতে পার। নিলয়কে বলল নিনা।

—এই তো ভালো মেয়ের মতো বুদ্ধি। নাণ্টু হাসিমুখে বলল।

—কিন্তু দাদা, প্রস্তাবটা তুই এনেছিস বলেই আমার খটকা লাগছে। নিনা বলল।

নাণ্টু এবার হেসেই উড়িয়ে দিল।

তারপর কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে, নিনার গালমন্দ খেয়ে, বাবুসোনাকে আদর ও নিলয়ের মাকে প্রণাম করে, স্নেহ-ভালোবাসা ও গুরুজনে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নাণ্টু বিদেয় হতে নিনা বলল—ব্যাপারটার মধ্যে অনেকগুলো ফাঁক আছে।

—আমারও মনে হচ্ছে। দেখি না যোগাযোগ করে। অ্যাড-ফিল্ম হলে কবর। এতদিন কেউ চিনত না। বোধ হয় তুরুপ সেনের দৌলতে কিছু সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি হয়েছে। অ্যাড-ফিল্মে আমাকে দেখানোর এখন বিশেষ আকর্ষণ আছে। বিজ্ঞাপন-ওলাদের মাথায় অনেকরকম বুদ্ধি খেলে। অরুণকুমারের ডামি, দেখতে নাইনটি পারসেণ্ট অরুণকুমার, বিজ্ঞাপন লোকের চোখ ধরবেই। আসলে সেই অরুণকুমার। দেখ, দেখ, লোকটাকে দেখতে একেবারে অরুণকুমারের মতো। কি রকম খুঁজে খুঁজে জোগাড় করেছে! আমি বরং এই কার্ডের নম্বরে একবার রিং করে দেখি।

নিনা ঘাড় নাড়ল।

নাণ্টুর দেয়া কার্ডখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিলয়।

এদিকে নির্জনতা কিঞ্চিৎ বেঁচে আছে। মধ্য শহরের আইঢাই-করা ভিড় এখানে নেই। তার ওপর রোদের আঁচ প্রচণ্ড। সাড়ে এগারোটার মধ্যেই পথঘাট প্রায় ফাঁকা। খদ্দেরহীন অলস দোকানী, ছায়ার আশ্রয়ে বেওয়ারিশ কুকুর, রিকশাওলারা রাস্তার ধারে রিকশা রেখে নিজেরা আড়াল-আবডাল খুঁজে নিয়েছে। জনা তিনেক অফিসযাত্রীকে শুধু দেখা যাচ্ছে সামনের গুমটিতে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের উদ্দেশ্যে

দৌড়বার চেষ্টা করতে। নিলয়ের হাসি পেল। সাড়ে এগারোটায় বাসে উঠছে। হাজিরা দেবে ক'টায় ? বাসে উঠেই শুরু হবে ড্রাইভার কনডাকটর থেকে গোটা পরিবহন ব্যবস্থার আদ্যশ্রাদ্ধ। কেউ কাজ করে না মশাই, কেউ কাজ করে না, দেখেছেন বাসটা ছাড়বার কথা সাড়ে এগারোটায়, এগারোটা পঁয়তিরিশ হয়ে গেল, কাজের মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেলে দেশের আর থাকে কি বলুন তো। দশটার পরের বাসে যেদিনই উঠেছে নিলয় এ ধরনের সংলাপ শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে এবং প্রায়শই লোকগুলোর পশ্চাদ্দেশে বুটের ডগা দিয়ে জোরালো ঠোকর দেবার প্রবল ইচ্ছাও হয়েছে। অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয়েছে, ইচ্ছাপূরণ করলে শহুরে জনমত কখনোই তার পক্ষে যাবে না। শহরের মোটামুটি সচ্ছল থেকে ওপরের দিককার মানুষের মানসিকতায় বিশ্রী ঘুণ ধরে গেছে। কেবলই পেতে চাইব, দেয়ার প্রশ্ন উঠলেই চোখ রক্তজবা। অথচ দেশের বেশির ভাগ মানুষের চাইতে এরা শতগুণ ভালো আছে।

বাসটা গুমটি থেকে বেরিয়ে গেল। জোরে হাঁটলে নিলয় ধরতে পারত। কিন্তু দৌড়ে বাস ধরার তাগিদ বোধ করেনি। দশটার অফিসে সাড়ে বারোটা-একটায় হাজিরা দেয়ার মহান দায়বদ্ধতা তার নেই। পোস্ট-অফিস পর্যন্ত হেঁটে গেলেও তার চলবে। দূরত্ব সামান্যই।

পোস্ট-অফিসে টেলিফোনের দায়িত্বে আসীন মহিলাটি নম্বর পেতে নিলয়কে যথেষ্ট সাহায্য করল। শোনা যায় আজকাল ধর্মবিশ্বাসী অনেকেই টেলিফোনে নম্বর ডায়াল করবার আগে ইষ্টমন্ত্র বা গুরুর নাম স্মরণ করে নেয়।

—নিন, ধরেছে। বলে মৃদু হাসির সঙ্গে মহিলা রিসিভারটা নিলয়ের হাতে দিল।

—ধন্যবাদ। নিলয় রিসিভার নিল।

: হ্যালো, মিস্টার বাসু আছেন ?

: আপনি কোন্ বাসুকে খুঁজছেন ? আমার দুটো শুয়ারের বাচ্চা আছে তারাও মিস্টার বাসু।

: অ্যাঁ !

: হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার দুই ছেলে—দু'টি বিশুদ্ধ শুয়ারের বাচ্চা। যাক, আমাকে দিয়ে চলবে ? আমি ভি. কে. বাসু। অন্য দু'জনকে পাবেন না। কোথায় পাবেন তাও জানি না।

: আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম। নান্টুবাবু আমাকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে।

: ওহ্‌হো, নিলয়বাবু, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং।

: গুড মর্নিং। আমাকে আপনি কি কাজের জন্য চাইছেন? অ্যাড-ফিল্ম?

: ঐ ধরনেরই ছোট্ট কাজ। ···আচ্ছা, ষোল তারিখ মানে বৃহস্পতিবার আপনি ফ্রী আছেন?

: তা আছি।

: তাহলে দুপুর বারোটায় চলে আসুন আমার বাড়িতে। ঘণ্টা চারেক সময় নিয়ে আসবেন। আমার বাড়িতেই সমস্ত অ্যারেঞ্জমেণ্টস আছে। ওখানেই সেরে নেব। সামান্য কাজ। পেমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে। আপনি নান্টুবাবুর ভগ্নীপতি, আপনার খাতিরই আলাদা। হে, হে। ঐ কথাই রইল, বৃহস্পতিবার, দুপুর বারোটা।

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ।

নিলয় রিসিভার রেখে ভদ্রমহিলার হাতে একটি দু'টাকার নোট দিল। রসিদ লেখা হয়ে গেছে। মহিলা ড্রয়ার খুঁজে-পেতে ফেরত পয়সা আর রসিদ নিলয়ের হাতে দিয়ে বলল—কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

এক সেকেণ্ড ভাবল নিলয়। —বলুন না, মনে করবার কি আছে?

—আপনি নিলয় মজুমদার?

নিলয় বুঝল বিনোদন-বার্তা তাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। তবে অভ্যর্থনার আসনটা কেমন পাতা হয়েছে তা এখনো দেখা হয়নি। বিনোদন-বার্তার কপিটা জোগাড় করতে হবে।

চেষ্টাকৃত অবাক হওয়ার ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলে নিলয় বলল—নিলয় মজুমদার? না, আমার নাম তুরূপ সেন।

—তুরূপ সেন! ভদ্রমহিলাকে বিহ্বল দেখাল।

—হ্যাঁ, তুরূপ সেন।

—আপনি বিনোদন-বার্তার তুরূপ সেন? যিনি নিলয় মজুমদার আর অরুণকুমারকে নিয়ে দারুণ একটা আর্টিকেল লিখেছেন?

চোখ কপালে তুলল নিলয়। —বিনোদন-বার্তার তুরূপ সেন, নিলয় মজুমদার, অরুণকুমার, আর্টিকেল—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার নামও কিন্তু তুরূপ সেন—করি তাসের ব্যবসা। তবে অরুণকুমারকে সিনেমায় দেখেছি।

—যাকগে, হতাশভাবে ভদ্রমহিলা বলল, আপনার সঙ্গে কিন্তু অরুণকুমারের চেহারার দারুণ মিল।

—হ্যাঁ, নিদারুণও বলতে পারেন। নমস্কার। বলে, ভদ্রমহিলাকে দুর্বোধ্য হাসি উপহার দিয়ে নিলয় তাড়াতাড়ি পা চালাল।

ভদ্রমহিলা অসম্ভব জটিল অঙ্কটা বুঝতে না পেরে বোকার মতো তাকিয়ে রইল।

নিলয়ের পেটের মধ্যে দুরন্ত হাসি পাক খাচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল হো হো করে হেসে হাসিটাকে মুক্তি দিতে। কিন্তু তার মতো বিখ্যাত ব্যক্তির এটা করা সাজে না, তাই হাসিটাকে পেটেই চেপে রাখতে হল। মহিলা নিশ্চয়ই দু'রাত্তির ধাঁধাটার জ্বালায় ঘুমোতে পারবে না। তারপরেও বহুদিন, হয়তো যতদিন বেঁচে থাকবে, এই না মেলাতে পারা রহস্যের গল্প লোককে বলে যেমন আনন্দ পাবে তেমনি ভুগবে একটা অস্বস্তিতেও। অন্তত একটি মানুষের মনেও সে নিলয় মজুমদার তুরুপ সেন-টেনকে তালগোল পাকিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু অরুণকুমার তো স্বরাজ্যে স্বরাট, যেমন ঐ মহিলার মনে, আরো লক্ষ লক্ষ মানুষের চিন্তা ভাবনা কামনায় স্বপ্নে। এ চিন্তায় নিলয়ের উল্লাস নিষ্প্রভ হল।

বিনোদন-বার্তার কপিটা জোগাড় করা দরকার। কিন্তু বড় রাস্তার মোড়ে ছাড়া পাওয়া যাবে না। যেতে-আসতে এক মাইল। এই রোদে? থাক এখন। তাছাড়া, নিলয় হঠাৎ আবিষ্কার করল, অরুণকুমারের দু'নম্বরী চেহারাটা নিয়ে দোকানদারের কাছ থেকে বিনোদন-বার্তা কেনা তার পক্ষে অতি কঠিন কাজ। তুরুপ সেন নিশ্চয়ই তার ছবি ছেপেছে। নইলে মহিলা তাকে চিনল কি-করে?

অতএব নিলয় বাড়ির পথ ধরল।

আবাসনের গেটের কাছাকাছি রাস্তার ধারের অস্থায়ী চায়ের দোকান থেকে একটা ছোকরা বেরিয়ে এসে নিলয়ের সামনে দাঁড়াল। চেনা মুখ। এমন চেনা মুখ যা না চেনা থাকলেই মানুষ খুশি হয়।

—আরে দাদ্‌দা, আপনাকে দেখলে মনে হয় ভিজে বেড়াল। আপনার যে এত গুণ জানতাম না মাইরি। তা দাদা, গুরুকে প্যাঁদালেন কেন?

ছোকরার স্ব-অত্যাচারিত শরীরটা তার একখানা সপাট চড়ে ক'হাত দূরে গিয়ে পড়তে পারে—নিলয় ভাবল। কিন্তু ভাবনা পর্যন্তই।

বাস্তবে নিলয় একেবারে বিনয়ের প্রতিমূর্তি হয়ে বলল—কি বলছ তুমি? উনিই আমার এভরিথিং। ওকে আমি মারতে পারি? কে বলছে এসব?

—বলছে না, আবার বলছেও।

—কোনো কাগজ-টাগজ বুঝি?

—হ্যাঁ, বিনোদন-বার্তা। আপনি দেখেন নি? আপনার ইণ্টারভিউ ছেপেছে।

—ইণ্টারভিউ দিয়েছিলাম। কি ছেপেছে দেখিনি।

—যা লিখেছে অ্যা-ও হয় অ-ও হয়। সিগ্রেট খাবেন?

—দাও।

সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ছোকরার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নিলয় ওকে অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ দিল। সিগারেট ধরানো হতে বলল—আজ তবে চলি ভাই। পরে দেখা হবে।

—নিলয়দা, একদিন গুরুর শ্যুটিং দেখাবেন মাইরি? ছোকরা সিগারেটের সুবাদে আরজি পেশ করল।

—দেখবে, এ আর কি। চলি তবে।

বাড়ি ফিরতে নিনা বলল—এই রোদে ছাতা না নিয়ে বেরোয়! কি দেখাচ্ছে!

নিলয় হাসল—এরই মধ্যে বুড়ো বানিয়ে ফেলতে চাও? আর, কেমন দেখাচ্ছে? কেন, অরুণকুমারের মতো।···এই তোমার দাদার কেসটা কিন্তু জেনুইন। বাড়িতে শ্যুটিংয়ের ব্যবস্থা আছে, তার মানে রীতিমতো পয়সাওলা লোক। নাণ্টুদার নাম বলতে দেখলাম বেশ খুশি হল।

—সেইজন্যেই ভয়, নিনা বলল, কি কাজ, কত দেবে?

—জিজ্ঞেস করার চান্স পেলাম না। তার আগেই লাইন ছেড়ে দিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে যেতে বলেছে। ঘণ্টা চারেকের কাজ—ওর বাড়িতেই। পেমেণ্টও সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দেবে বলেছে। নাণ্টুদার দেখলাম খুব খাতির।

—দয়া করে ও নামটা বারবার করো না। সাবধানে এগোবে বলে রাখছি। এখনো বলছি আমার দাদাদের তুমি চেনো না। দাও, জামা-গেঞ্জি খুলে দাও, কেচে দিচ্ছি।

নিলয় হাসি-হাসি মুখে শার্টের বোতাম খুলতে লাগল।

১৩

জগদীশদা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে। অন্যদিন স্টুডিওতে কাজ থাকলে, কাজের পরেও আড্ডা চলে অনেকক্ষণ। আজ আর দেরি করেনি। কাজ শেষ হতেই

স্টুডিও থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

মন-মেজাজ ভালো না। জগদীশদা বেশ বুঝতে পারছে ফিল্ম-লাইনে নিলয়কে আর করে খেতে হবে না। ছেলেটা ভালো। জগদীশদাই ওকে এ কাজে টেনে এনেছিল। তাতে অবশ্য দোষের কিছু হয়নি। যার কোনো কাজই ছিল না তাকে একটা কাজের সুযোগ করে দিয়েছিল। রোজগারপাতি মন্দ করছিল না। অন্তত চলে যাবার মতো। নিনা মেয়েটাও বড় ভালো। ওদের দু'জনকে একটা ঘরের ঠিকানা দিতে পেরে জগদীশদা বড় আনন্দ পেয়েছিল। নিজেকে ওদের অভিভাবকের মতো ভাবতে ভালো লাগে।

জগদীশদার মনে, একটা গোপন আশা ছিল, যা সে কোনোদিন কারো কাছে প্রকাশ করেনি। আজ নিলয়ের যে চেহারাটা তাকে অরুণকুমারের ডামির বেশি কিছু হবার সুযোগ দিচ্ছে না, কয়েক বছর পরে সেই চেহারাটাই হবে তার নায়ক হবার ছাড়পত্র।

অরুণকুমার আপ্রাণ চেষ্টা করছে বয়সটাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখতে। কিন্তু বয়স নিঃশব্দে গুড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে। তাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য ব্যায়াম, ম্যাসাজ, ভিটামিন, ডায়েটিং। অন্যদিকে বয়সকে সাহায্য করবার জন্য আছে প্রকৃতি, প্রতি সন্ধ্যায় মদের ফোয়ারা এবং অনিবার্যভাবে রমণী। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসটাকে এখন কড়া মেক-আপেও তরুণ নায়কে নামিয়ে আনা যায় না। ঘনিষ্ঠ ক্যামেরা কখনো কখনো অসতর্ক হয়ে ধরে ফেলে মুখের অবাঞ্ছিত কোনো রেখা, চুলে দু'একটা সূক্ষ্ম রুপোলী দাগ, মাংসের ঢিলে-ঢালা ভাব, জায়গায় জায়গায় অজ্ঞাতে সঞ্চিত বয়সের মেদ। তবু মানুষ এখনো এসব ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। কারণ অরুণকুমারের অসাধারণ অভিনয়-ক্ষমতা। বয়সের অসঙ্গতি অভিনয়ে সে অনেকটাই পুষিয়ে দিতে পারে। আর আছে দীর্ঘ কুড়ি বছর নায়ক চরিত্রে একাধিপত্য করবার ইমেজ। অরুণকুমারকে নায়ক ভাবা দর্শকের পুরনো গভীর অভ্যাস। কিন্তু আরো কয়েক বছর পরে যখন অসঙ্গতি মাত্রাছাড়া জায়গায় চলে যাবে তখন দর্শকের অভ্যাসও ঘা খাবে। অরুণকুমার বুদ্ধিমান, ঐ জায়গায় পৌঁছবার আগেই সে সরে যাবে।

জগদীশদা জানে তখন নিলয়ের সামনে খুলে যাবে গন্ধর্বলোকের দরজা। প্রযোজক-পরিচালক নিলয়ের মাধ্যমে দর্শকের অভ্যাসটাকে ব্যবহার করতে চাইবে। নিলয়ের কাছে আসবে অফুরন্ত সুযোগ। আর মাত্র চার কি পাঁচটা বছর। কিন্তু জগদীশদার হিসেব ভণ্ডুল করে দিয়ে কি যে কাণ্ড হয়ে গেল একটা! তবু যদি বা ঘটনাটা আস্তে

প্রাণে থিতিয়ে যেত, বিনোদন-বার্তায় রিপোর্ট বেরুনোর পর আর কোনো আশাই নেই। সেদিনও নিলয় এসেছিল। কিন্তু তুরুপ সেনকে ইণ্টারভিউ দেয়া বা সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা করার খবর তো বলেনি। কেন এমন বোকামি করল নিলয়? তুরুপ সেনটা মহা শয়তান, কি চাল চেলেছে কে জানে। হয়তো ইণ্টারভিউ না দিয়ে উপায় ছিল না নিলয়ের। কিন্তু হতভাগাটা মরতে সুলক্ষণার কাছে গিয়েছিল কেন?

স্টুডিওতেই জগদীশদা প্রথম শোনে বিনোদন-বার্তার ব্যাপারটা। মানুষের অক্ষমতা আক্রোশের আশ্রয় খোঁজে। অরুণকুমার আহত হওয়ায় বহু লোকের রুজি-রোজগারে হাত পড়েছে। নিজেদের দুরবস্থার আসল কারণ খুঁজে বের করবার ক্ষমতা কারোই নেই, প্রতিকার দূরস্থান। তাই ডাইনি খোঁজার সংস্কার ভেতরে ভেতরে কাজ করে চলে। অরুণকুমারের দুর্ঘটনার জন্য যেন নিলয়ই দায়ী এমন একটা গুঞ্জন কিছুদিন ধরেই চলছিল। নিলয় ইচ্ছে করে অরুণকুমারকে মেরেছে এ ধরনের কথা কেউ বলেনি। কিন্তু, সতর্কভাবে কাজ করা উচিত ছিল, অরুণকুমারের লেগে যাওয়ার মানে বুঝিস, ঘুষি একটা চালালেই হল, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইচ্ছাকৃত অপরাধের দায়িত্ব ওরা নিলয়ের ঘাড়ে চাপায়নি, অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যই দায়ী করেছে। তবে ভুলটা বড় মারাত্মক, কয়েক হাজার মানুষের অন্নবস্ত্রের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু বিনোদন-বার্তার রিপোর্টে তুরুপ সেনের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বেশ মোটাভাবেই ওদের কাছে ধরা পড়েছে। নিলয় ইচ্ছে করে অরুণকুমারকে মেরেছে এমন মারাত্মক কথা ওরা খোলাখুলি বলতে শুরু করেছে। ওরা একবারও ভেবে দেখছে না এটা কতখানি অবাস্তব। মানুষ এ রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন না হলে বিনোদন-বার্তার মতো কাগজ লাখ লাখ বিক্রি হয়? তুরুপ সেনেরা মানুষের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা আর স্বভাবের নোংরা দিকটাকে ভাঙিয়ে খেতে ট্রেনিং নিয়েছে, যাকে ওরা বলে সাংবাদিকতা। যে যত বেশি মানুষের মনের মতো মিথ্যা লিখতে পারে বা দুর্বলতার জায়গাগুলিতে সুড়সুড়ি দিতে পারে সে তত বড় সাংবাদিক।

স্টুডিওতেই জগদীশদা বিনোদন-বার্তার এক কপি আনিয়ে পড়ে নিয়েছিল। আগাগোড়া তুরুপ সেনের চূড়ান্ত বদমায়েশি। খোলাখুলি না বলেও সমস্তই বলা। তুরুপ সেন জানে এই মুহূর্তে লক্ষ মানুষের মন চাইছে অরুণকুমারের আক্রমণকারী এক জল্লাদকে আবিষ্কার করতে। নইলে অরুণকুমারের দুর্ঘটনা বাসি খবরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে—চমকপ্রদ কিছু আর এতে থাকছে না। অতএব খুঁজে বের কর এক জল্লাদ, সৃষ্টি কর এক নতুন চমক। নিলয় সেই জল্লাদ, সেই নতুন চমক। আইন বাঁচিয়ে

জনমতের আদালতে তাকে অভিযুক্ত কর। জনমত নামক আদালতের রায়ে বিনোদন-বার্তার বিক্রি বিশ-তিরিশ-পঞ্চাশ হাজার বা লক্ষ বৃদ্ধি।

ধর্মাধিকরণে এই অধর্মের বিরুদ্ধে নিলয় যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না। কারণ বিচার বড়ই ব্যয়সাধ্য। এবং জাগতিক কারণে অধর্মের সঞ্চয়ে যাবতীয় সম্পদ বিধায় ধর্ম অধর্মে সম্পূর্ণ সমর্পিত। অর্থাৎ বিনোদন-বার্তা যা ইচ্ছা ছাপুক নিলয় প্রতিবাদ জানানোর ক্ষমতা রাখে না, বা, জানালেও পত্র প্রকাশের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে, যাতে বিনোদন-বার্তার ক্ষতি না হয়ে বৃদ্ধিই ঘটবে। জনে জনে এসব বলে বোঝানোর সাধ্য জগদীশদার নেই। তাই সে বিরক্ত হয়ে স্টুডিও থেকে চলে এসেছে।

জগদীশদা শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবছিল। অবশ্যই নিলয় সম্পর্কে। মণিবৌদিকে সবই বলেছে জগদীশদা। মণিবৌদি বিনোদন-বার্তাটা পড়তে নিয়ে গেছে ও ঘরে।

যোগ্যতার জোরে বেঁচে থাকার দিন শেষ হয়ে গেছে। যোগ্যতা বলতে সাধারণ গড় যোগ্যতা। অসাধারণরা চিরকালই অসাধারণ। ইতিহাসের পাতায় তাদের কীর্তিকলাপ লেখা থাকে।

কিন্তু ইতিহাসই লেখা হত না যদি না কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সাধারণ কাজ সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখত। অথচ আজ আমরা এমন জায়গায় পৌছেছি যে সাধারণ মানুষের সাধারণ কাজ করে বেঁচে থাকার সুযোগ ক্রমেই কমে আসছে। বেঁচে থাকার লড়াই নিচ্ছে অদ্ভুত অসুস্থ চেহারা। সাধারণকে অসাধারণ বানানোর মরিয়া চেষ্টায় সে হচ্ছে আরো অক্ষম, আরো খর্ব। আর সাধারণ কাজের সীমিত সুযোগের জন্য সাধারণদের মধ্যে চলছে অসুস্থ প্রতিযোগিতা।

বাঁকা পথে চলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে মানুষ। এসবই ঘটছে, ঘটতে থাকবে মানুষের সহজাত বাঁচার আকঙ্ক্ষায়। নিলয়ের মতো সৎ সক্ষম একজন মানুষের কি বেঁচে থাকার অধিকার নেই? অফিসের কেরানী বা কারখানার শ্রমিকের কাজ সে ভালো-ভাবেই করতে পারত। সে যোগ্যতা তার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যোগ্যতা এখন আর শেষ কথা নয়। সুযোগ আদায়ের গলিঘুঁজি না চিনলে বা গ্রহ-নক্ষত্রের আশ্চর্য যোগাযোগ না ঘটলে যোগ্যতার সোজা রাস্তা শেষ পর্যন্ত খোলা ময়দানে পৌছে দেয়, যেখানে প্রকৃতির অকৃপণ দান বাতাস প্রচুর মেলে, কাজের বিনিময়ে অর্থ মেলে না। নিলয় ময়দানেই পৌছে যেত, মাঝপথে জগদীশদা তাকে তুলে নিয়ে অদ্ভুত একটা কাজের গাড়িতে জুড়ে দিয়েছিল যে গাড়ির লক্ষ্য নিশানা গতি বড়ই অস্থির, অনিশ্চিত।

গাড়িটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিলয়ের সাধ্য নেই একে আবার চালু করবার। কারণ, ঠিকভাবে দেখতে গেলে এটা কাজই নয়, অভিনয়ের কাজ তো নয়ই, বলা যায় কাজের অভিনয়।

অর্থাৎ নিলয়কে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। তিনটি, না, চারটি প্রাণীর বেঁচে থাকার মালমশলা যোগানোর মতো দুরূহ কাজের গোড়াপত্তন করতে হবে তাকে। অথচ অর্থ নেই, অভিজ্ঞতা নেই, অসাধারণত্বের লেশমাত্রও নেই। না, না, জগদীশদা চিন্তার মধ্যেই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল, উপায় একটা বের করতেই হবে। সে কখনো হার স্বীকার করেনি, নিলয়কেও হারতে দেবে না। কিন্তু তার আগে এই অন্যায়ের প্রতিকার না হোক অন্তত প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

মণিবৌদি ঘরে এসে বিনোদন-বার্তাখানা জগদীশদার হাতে দিয়ে বলল—কি লিখেছে ছাতা-মাথা।

—লোকে গিলছে। তারিয়ে তারিয়ে গিলছে। জগদীশদা উঠে বসল।

—কিছু করার নেই আমাদের ? মণিবৌদির কপালে দুশ্চিন্তার আঁকাবাঁকা রেখা।

—ভাবছি, জগদীশদা অন্যমনস্কভাবে বলল, আমি একবার বেরুব। ফিরতে দেরি হতে পারে। আচ্ছা মণি, অমিয়দার ঘর দুটো কি ভাড়া হয়ে গেছে ?

—না। কালই দিদি বলছিল চেনাজানা লোক না পেলে ওরা ভাড়া দেবে না।

—ওদের গিয়ে বলে এসো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে। আমাকে জিজ্ঞেস না করে যেন কাউকে কথা না দেয়। পাঞ্জাবি গায়ে গলাতে গলাতে জগদীশদা বলল।

মলয় পাত্র টেকনিসিয়ানস্ ইউনিয়নের সেক্রেটারি। করিতকর্মা ব্যক্তি। বলে ভালো, লেখে মন্দ না, জন-সংযোগের কলাকৌশল রপ্ত করেছে চমৎকার। অর্থাৎ যাকে সংগঠনী প্রতিভা বলে সে গুণটি তার আছে। সিনেমার জগতে প্রবেশ পরিচালকের তৃতীয় বা চতুর্থ সহকারী হিসেবে। সেখানে প্রতিভার তেমন পরিচয় পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রতিভা তার স্ব-ক্ষেত্র খুঁজে নিয়েছিল। নেতৃত্ব দেবার সহজাত ক্ষমতা ছিল। দাবিদাওয়ার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং শেষ পর্যন্ত দেখে নেবার মানসিকতা আছে মলয় পাত্রের। বহু যুদ্ধের সৈনিক। কিছু বিশ্বনিন্দুক অবশ্য নানা কথা বলে। যোদ্ধার ঢাল-তলোয়ারগুলো নাকি অনেকসময়ই টিনের। জগদীশদা বিশ্বাস করে না। যেখানে লড়াইটা আখেরি নয়, সামান্য অর্থ বা সুযোগ-সুবিধা আদায়ের, সেখানে সবার

স্বার্থ সমানভাবে দেখা সম্ভব নয়, যোদ্ধাদের কপালে নিন্দামন্দও তাই জুটবেই। কিন্তু এত লোকের বিশ্বাস ও সমর্থনের পেছনে যোগ্যতার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে।

মলয় খাতির করে বসাল জগদীশদাকে। —বসুন জগদীশদা, বলুন কি খবর। চা খাবেন তো ?

—তা খেতে পারি।

চাকরকে ডেকে চা দিতে বলল মলয়।

অনেকদিন অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে আসা হয়নি জগদীশদার। এর মধ্যে ঘরের সাজসজ্জায় দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো পরিবর্তন ঘটেছে। দেয়ালে ফিকে সবুজ ডিসটেম্পার। নড়বড়ে পালিশ না পড়া টেবিল-চেয়ারের জায়গায় মাঝারি দামের স্টীলের ফার্নিচার। দু'জোড়া টিউব লাইট। স্টীলের র‍্যাকে গোছানো ফাইল-পত্র। ঘরের এক কোনায় ছোট টেবিলে নতুন টাইপ-রাইটার। আধা-সম্পন্ন ভদ্র চেহারার অফিস।

অবশ্য টেবিলের ওপর রাখা শস্তা সিগারেটের প্যাকেটের পরিবর্তন ঘটেনি।

—ঘরটা বেশ সাজিয়েছ দেখছি। জগদীশদা বলল।

—কই আর তেমন পারলাম। ফাণ্ডে টাকাই নেই। পয়লে দর্শনধারী। অফিস-টফিস ছিমছাম না হলে লোকে গুরুত্ব দিতে চায় না। মলয় সিগারেট ধরাল।

—আপনি তো সিগারেট খান না।

—সিগারেট আমার ঘাস ঘাস লাগে। বিড়ি না হলে জমে না। হ্যাঁ, যা বলতে আসা, বিনোদন-বার্তার কাণ্ডটা দেখেছ ?

—দেখেছি। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সতর্কভাবে বলল মলয়।

—কাজটা কি ওদের উচিত হয়েছে ?

—না। কিন্তু করলে আপনি ঠেকাবেন কি করে ?

—তা বলে যা ইচ্ছে তা-ই লিখবে ? মানুষের ক্ষতি করার অধিকার ওদের নেই নিলয়ের কি সর্বনাশ হয়ে গেল বুঝতে পারছ।

চাকর দু'পেয়ালা চা দিয়ে গেল।

—নিন, চা খান। মলয় বলল।

জগদীশদা চায়ে চুমুক দিয়ে পেয়ালা নামিয়ে রাখল।

—তুমি কোনো স্টেপ নিতে পার না ?

—আমি কি স্টেপ নেব ? গোটা সিসটেমটা পচে গেছে। হিউম্যান কনসিডারেশন

পর্যন্ত নেই। যে যেমন করে পারছে ফয়দা তুলছে। আপনি আমি চিৎকার করলে কি হবে? আমার লোকজনেরা কাজের অভাবে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে। আমার কাছে এসে ধরনা দিচ্ছে। আমি কি করব? কাজ থাকলে, তবে তো অনিয়ম অবিচার হলে আমি নাক গলাতে পারি। কাজ তৈরি করার ক্ষমতা আমার নেই। এই তো অবস্থা। নিজের লোকজনের জন্যই করতে পারছি না। নিলয়বাবুর জন্য কি করব?

—আমি নিলয়ের কাজের জন্য তোমাকে বলতে আসিনি। ইউনিয়নের একজন সভ্য হিসেবে আমি চাই এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হোক।

—তা-ই বা হয় কি করে? নিলয়বাবু আমাদের ইউনিয়নের সভ্য নন। সভ্য হতেও পারেন না। উনি টেকনিসিয়ান নন, আর্টিস্ট। আপনি আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলাপ করে দেখতে পারেন। আরেকটা কথা, আপনাকেই বিশ্বাস করে বলা যায়, গোটা ইন্ডাসট্রির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ হলে কাজ হত। তা হবে না। এ নিয়ে আমি মুখ খুললে আমার লোকেরাই বিরক্ত হবে। ওদের সেন্টিমেণ্টে যুক্তি নেই, যুক্তি আর সেন্টিমেণ্ট দুটো আলাদা জিনিস, দুটো মিললে ভালো, না মিললেও আমরা নিরুপায়। আমি জানি নিলয়বাবুকে আপনি খুবই স্নেহ করেন। কিন্তু আমার হাত-পা বাঁধা।

দূর থেকে মিছিলের স্লোগান ভেসে এল ঘরে। দুনিয়াকা মজদুর এক হো।

—চলি তাহলে মলয়। মিছিল-টিছিল যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। জ্যামে না আটকে পড়ি। জগদীশদা উঠে দাঁড়াল।

তারকা-তালিকায় দ্বিতীয় স্থানটি প্রবালকুমারের। অরুণকুমারের পরেই তার স্থান, যদিও জনপ্রিয়তা ও দক্ষিণার দাবিতে দু'জনের পার্থক্য উনিশ-বিশ নয়, দশ-একশো। তবে অরুণকুমারের মতো কিংবদন্তীর নায়ক হতে না পারলেও প্রবাল-কুমারের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে যা চলচ্চিত্র-জগতে অন্য কোনো নায়কের নেই। প্রবাল-কুমার শুধু ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীর সুবাদেই শিক্ষিত মানুষ নয়, লেখাপড়ায় তার আগ্রহ আন্তরিক, সংস্কৃতি-জগতের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ, তিনটি সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে তার আত্মীয়তা শুধুই বিখ্যাত জনের অঙ্গভূষণ নয়, এদের কাজকর্মে রীতিমতো সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকে প্রবালকুমার। তার লেখা প্রবন্ধ গল্প বেরিয়েছে পত্র-পত্রিকায়, সেগুলো নিছক প্রবালকুমারের পিতৃত্বের জোরেই ছাপা হয়নি। অন্য যে কোনো

নামে বেরুলেও পাঠক মহলে হৈ হৈ না হলেও ছিছিক্কারও পড়ত না। নানা মঞ্চ থেকে নানান বিষয়ে তার বক্তৃতায় ফিল্মী নায়কের সচরাচর-দৃষ্ট অজ্ঞতাকে আবিভাব দিয়ে পুষিয়ে নেবার অপচেষ্টা থাকে না, বরং বক্তৃতায় তার দাপট বহু ভাড়াটে বক্তাকেও লজ্জা দেয়। এটা বিষয়ের ওপর অধিকার ছাড়া হয় না। ফলে বিদগ্ধ সমাজেও প্রবালকুমারের বিশেষ স্থান আছে, যেটাকে স্থান বললে হয়তো অনেকের আপত্তি হতে পারে, সাময়িক আশ্রয় বললে কারোই আপত্তি হবার কথা নয়। ব্যক্তিগত জীবনেও প্রবালকুমার পরিচ্ছন্ন। মদ্যপানে পরিমিত। একবারই মাত্র একটি নায়িকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কিঞ্চিৎ আধিক্য ঘটায় স্ত্রীর দিক থেকে কলহের সূত্রপাত হয়। অবশ্য ব্যাপারটা সহজেই মিটিয়ে ফেলে প্রবালকুমার। তারপর থেকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে চিড় ধরাবার মতো কোনো অ্যাফেয়ার প্রবালকুমারের দিক থেকে ঘটেনি। একজন জনপ্রিয় তারকার পক্ষে এ যে কি কঠিন কাজ তা খুব কমই লোকই ধারণা করতে পারে।

এহেন প্রবালকুমার স্বাভাবিক কারণেই আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। তার সভাপতিত্বে বিভিন্ন সময়ে অ্যাসোসিয়েশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বন্যাত্রাণে অর্থ সংগ্রহের জন্য কয়েকবারই চলচ্চিত্র-শিল্পীরা পথ-পরিক্রমায় নেমেছে। এমন কি অরুণকুমার পর্যন্ত একবার খোলা লরীতে দাঁড়িয়ে প্রায় এক ঘণ্টা সংগ্রহের কাজে সাহায্য করেছিল। বিভিন্ন সংকটময় জাতীয় সমস্যায় প্রবালকুমারের নেতৃত্বে শিল্পীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে। তারা বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছে, জনগণকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছে। এ ছাড়াও তিনজন দুস্থ শিল্পীর সাহায্যার্থে তিনটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রবীণতমা অভিনেত্রী চারুপ্রভা দেবী পেয়েছেন তিন হাজার টাকা, বৃদ্ধ অভিনেতা জিতেন ব্যানার্জীকে চিকিৎসার জন্য দেয়া হয়েছে এক হাজার টাকা, অতীতের প্রখ্যাত ভিলেন চরিত্রাভিনেতা বরুণ মুনশীর কন্যার বিবাহে সাহায্য করা হয়েছে দু'হাজার পাঁচশো এক টাকা। প্রবালকুমারের সুযোগ্য নেতৃত্বে আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন এইসব কাজ করেছে বিগত কয়েক বছরে।

ফিল্মী দুনিয়ার সকলের দুয়ারই জগদীশদার জন্য খোলা।

প্রবালকুমারের ড্রয়িং রুমে বসে তার সঙ্গে জগদীশদার কথাবার্তা হচ্ছিল।

প্রবালকুমারের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দু'টি দেয়াল-জোড়া আলমারিতে পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা অসংখ্য বইয়ে দেশী-বিদেশী লোকশিল্পের মূল্যবান নমুনায় প

দেয়ালে টাঙানো অসাধারণ ছবির সংগ্রহে প্রকাশ পাচ্ছিল।

বেতের সোফায় মুখোমুখি প্রবালকুমার ও জগদীশদা। মাঝখানে বেতেরই নিচু টেবিলে দামী পোর্সেলিনের পেয়ালায় কফি। প্রবালকুমারের ঠোঁটে চুরুট। জগদীশদার ডান হাতের দু'আঙুলের ফাঁকে বিড়ি। দু'জনের সম্পর্ক খুবই অন্তরঙ্গ, যদিও অবস্থানে পার্থক্য বিস্তর।

প্রবালকুমারের চুরুট ঠোঁট থেকে হাতে নামল।—আপনি আমাকে কি করতে বলেন?

—তুমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাও। একটা মানুষকে নিয়ে বিনোদন-বার্তার পিংপং খেলা তুমি বরদাস্ত করবে?

—দুনিয়ার সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কি আমার আছে?

—না, নেই। কিন্তু এই অন্যায়ের প্রতিবাদ তুমি নিশ্চয়ই করতে পার।

—কেমন করে?

—তুমি কাগজে বিবৃতি দাও, তাতেই কাজ হবে।

—কি বিবৃতি দেব?

—লিখে দাও নিলয় মজুমদার সম্পর্কে বিনোদন-বার্তার আপত্তিজনক সংবাদের তোমরা তীব্র নিন্দা করছ। দরকার হলে বিনোদন-বার্তাকে তোমরা বয়কট করবে।

—বড্ড ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে না জগদীশদা? প্রবালকুমার হাসল।

—ছেলেমানুষি কোথায় দেখলে?

—ফিল্ম-ম্যাগাজিনে যা সব ছাপা হয় তার প্রতিবাদ করতে হলে আমাদের অন্য কাজ করার সময় থাকবে না। তা ছাড়া···

প্রবালকুমারের হঠাৎ থেমে যাওয়া লক্ষ্য করে জগদীশদা বলল—তা ছাড়া?

—আপনি ভালোই জানেন জগদীশদা, আমি না চাইলেও বেশির ভাগ আর্টিস্টই চায় ফিল্ম-ম্যাগাজিনে তাদের নিয়ে লেখা হোক। কেচ্ছা ছাপা হলেও আপত্তি নেই, লোকের নজর টানতে পারলেই হল। কেচ্ছাতেও পপুলারিটি বাড়ে। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এইসব কাগজ আর্টিস্টের কাজের অ্যাসেসমেণ্ট করার চেষ্টা করে না। অভিনয়ের ব্যাপারে সবাই অসম্ভব ভালো, খুব ভালো, বেশ ভালো, ভালো। অর্থাৎ দু'তরফেই আসল জায়গা ঠিক থাকছে। আপনাকে আর কি বলব, যাদের টাকা ফিল্মে খাটে তাদের টাকায়ই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিনোদন-বার্তার মতো কাগজও চলে। আপনি কোথায় হাত দেবেন?

—সেক্স-স্ক্যাণ্ডাল ছেপে বাজার মাত করা আর সেইসঙ্গে আর্টিস্টকেও পাবলিসিটি দেয়া এক জিনিস, কিন্তু একজনের ভাত মারবার মতো খবর ছাপানো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

—মেনে নিচ্ছি। কিন্তু করার কি আছে বলুন। অ্যাসোসিয়েশনের অন্যদের মনের খবর আমি জানি না, কিন্তু সুলক্ষণা নিলয়বাবুর ওপর ভীষণ খেপে আছে, একটু আগে টেলিফোন করেছিল। ধরে নিতে পারি অরুণকুমারের মনোভাবও আলাদা নয়। ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া মানে আমি আইসোলেটেড হয়ে যাব। অরুণকুমারের কৃপা কে না চায়? প্রবালকুমার কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল।

—তুমি অরুণকুমারের কৃপাপ্রার্থী? জগদীশদার হাসিটা বাঁকা।

—কৃপাপ্রার্থী না হলেও বন্ধুত্বপ্রার্থী অবশ্যই। প্রবালকুমার সহজ হাসির সঙ্গে উত্তর দিল।

—তার মানে, নিলয়ের যা হয় হোক, তোমরা আঙুলটি নাড়বে না।

—এ আঙুল যে নিজের ইচ্ছেয় নড়তে পারে না জগদীশদা। তা ছাড়া বিনোদন-বার্তার মতো কাগজে কি লেখা হল না-হল তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ফুচকা লোকে প্রচুর খায়, কিন্তু নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকায় ওটা থাকে না কিংবা ওটাকে প্রয়োজনীয় খাদ্য বলেও কেউ মনে করে না।

—তোমার কাছে যা খেলা, অন্যের তা মরণ। প্রবালকুমার, নিজের ভালোটাকে অক্ষত রেখে পরের ভালো করা যায় না। কি দরকার অ্যাসোসিয়েশন-ফ্যাসোসিয়েশন করে? তোমরা ক্রিম-ম্যাগাজিনওয়ালাদের চটাতে পারবে না, অরুণকুমার-সুলক্ষণার মতো নামী-দামীদের ভালো লাগার ওপর নির্ভর করে তোমাদের সিদ্ধান্ত। লোকের ভালো তা হলে কি করে করবে? তোমাকে বরাবরই ভাবতাম অন্যদের থেকে আলাদা, তাই তোমার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু···

—কিন্তু কি জগদীশদা? প্রবালকুমার তার স্মার্টনেস বজায় রেখে হাসতে চেষ্টা করল, হাসিটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল না।

—তোমার কালচার্ড মানুষের ভঙ্গিটাও নিজের প্রচারেরই কায়দা। তুমি জান অরুণকুমারের মতো ম্যাটিনি আইডল হবার ক্ষমতা তোমার নেই, তাই ইনটেলেক-চুয়াল সেজেছ। আরে বাবা, মানুষকে ভালোবেসে ত্যাগ স্বীকার করতে পারাটাই সবচেয়ে বড় কালচার। তোমার পুঁথিপত্তরের ডেফিনিশন থাক। জগদীশদা বিড়ির শেষটুকু অ্যাশট্রেতে ফেলল।

প্রবালকুমারের মুখ-চোখে অস্বস্তি, বিরক্তি। তার সামনে বসে থাকা তুচ্ছ মানুষটাকে সে এক্ষুনি চাকর ডেকে ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু নিরুপায় প্রবালকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নিজেকে সংযত করল। সমানে সমানে সম্পর্ক রাখাই ভালো। নিচের মানুষদের জায়গা নিচেই। লোকটাকে জগদীশদা ডেকে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ সে-ই দিয়েছে। এখন সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। লোকটা ডালপালা ছড়ানোর বিদ্যে ভালো জানে। ওকে অপমান করা মানে নিজেরও অপমান ডেকে আনা। প্রবালকুমার হিসেবে ভুল করতে রাজী নয়।

—ওঃ, গাল দিয়ে আর রাখলেন না। নিলয়বাবুর জন্য করার কোনো উপায় থাকলে আমি সত্যিই করতাম। কিন্তু প্রব্লেম অনেক। ওঁকে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের আওতায় আনা যায় না। উনি তো ঠিক আর্টিস্ট নন।

—হ্যাঁ, টেকনিসিয়ানও নয়। জগদীশদা আড়ামোড়া ভেঙে বলল।

—তার মানে ?

—এমনিই বললাম। চলি।

হঠাৎ জগদীশদার মনে হল দূর থেকে মিছিলের সেই ধ্বনিটা ভেসে আসছে। দুনিয়াকা মজদুর এক হো। কান পেতে মুহূর্ত দাঁড়াল জগদীশদা। নাঃ, শোনার ভুল। প্রবালকুমারের বাড়ি যে এলাকায় সেখানে মিছিল ঢোকে না।

জগদীশদার মুখের চেহারা নিলয়-নিনাকে ভয় পাইয়ে দিল। রুক্ষ ক্লান্ত গম্ভীর ও বিরক্ত।

জগদীশদা চৌকিতে বসে প্রথমেই হাত ঢোকাল কাঁধের ঝোলায়। নিনা নিলয় সামনে দাঁড়িয়ে। এমন মূর্তি কেন জগদীশদার—সে চিন্তা ওদের দু'জনেরই মনে।

ব্যাগ থেকে বিনোদন-বার্তার কপিটা বের করে ফরফর করে পাতা উলটে একটা জায়গা দেখিয়ে জগদীশদা বলল—কি লিখেছে এগুলো ?

নিনা হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল। নিলয়ও ঝুঁকে পড়ল কাগজের ওপর।

প্রথমে বড় হরফে :

"অকথিত কাহিনী

অরুণকুমার কি সত্যিই দুর্ঘটনার শিকার ?"

তারপর সুন্দর অফসেট ছাপায় দীর্ঘ কাহিনী :

"আপনারা কি জানেন অরুণকুমারের একজন ডামি আছেন? ঝুঁকির দৃশ্যে সাধারণত বড় অভিনেতারা ডামির সাহায্য নিয়ে থাকেন—সিনেমার খবর যাঁরা রাখেন ডামির সম্বন্ধেও তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন। তাহলে আর বিনোদন-বার্তা আপনাদের নতুন কি শোনাল? এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। উত্তরও আপনারা এখনই পাবেন।

দেখুন তো নিচের ছবি দুটো। একজন নিশ্চয়ই অরুণকুমার। অন্যজন? কি বললেন? অন্যজনও অরুণকুমার? না, ইনি অরুণকুমার নন। ইনি অরুণকুমারের ডামি নিলয় মজুমদার। আশ্চর্য মিল দু'জনের চেহারায়, তা-ই না? নিলয়বাবুকে সামান্য মেক-আপ দিলেই অরুণকুমারের সঙ্গে তার পার্থক্য খুঁজে বের করা সত্যিই শক্ত।

সেই অর্থে নিলয়বাবু একজন 'বিশেষ' ও 'মূল্যবান' ডামি। এ রকম একজন ডামি থাকলে নায়কের ঝামেলা-ঝক্কি কমে যায়। যে ডামির সঙ্গে অভিনেতার চেহারার মিল নেই তাকে দিয়ে কাজ করানোর অসুবিধা বিস্তর। পরিচালকরা হাড়ে হাড়ে তা টের পান। কিন্তু কোনো বড় নায়কের যদি নিলয়বাবুর মতো ডামি থাকে তাহলে পরিচালক ও নায়ক দু'জনেরই প্রচুর সুবিধা। রিস্ক-শট্ নিতে গিয়ে পরিচালককে কপাল চাপড়াতে হয় না। যে লোকটি নায়কের বদলি হিসেবে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল, পেছন থেকে নেয়া শটেও সে যে বদলি তা দর্শকের চোখে ধরা পড়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা আমাদের বহুবারই হয়েছে। তাই কাছের রিস্ক-শট্ অনেক সময় ঝুঁকি নিয়ে নায়ককে নিজেকেই দিতে হয়। নায়করা এটা পছন্দ করেন না। কিন্তু নিলয়বাবুর মতো ডামি হলে অরুণকুমারের মতো নায়করা নিশ্চয়ই নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করতে পারেন। সেইজন্যই বলছিলাম নিলয়বাবু একজন 'বিশেষ ও মূল্যবান' ডামি।

কিন্তু নিলয়বাবু যত বড় ডামিই হোন না কেন তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নিশ্চয়ই বিনোদন-বার্তার পাঠকদের নেই। আমাদের আগ্রহের কারণ অন্যত্র।

আপনারা কি জানেন যেদিন অরুণকুমার আঘাত পান সেদিন শ্যুটিংয়ে সেটে ছিলেন মাত্র দু'টি ব্যক্তি? অরুণকুমার আর তার ডামি নিলয় মজুমদার? প্রচণ্ড মারপিটের দৃশ্যে অরুণকুমারের দ্বৈত চরিত্রে অভিনয়। অভিনয় করছিলেন অরুণকুমার, দ্বৈত চরিত্রের অন্যটিতে তাঁর ডামি নিলয় মজুমদার। সেই সময় অরুণকুমারের আঘাত লাগে বা···।

সেই দৃশ্যের তিনটি স্টিল ফোটো, তিনটি বিশেষ মুহূর্তের, একমাত্র বিনোদন-বার্তাই পেয়েছে সংগ্রহ করতে। ছবি তিনটি আমরা পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। কে অরুণকুমার

আর কে নিলয় মজুমদার বোঝা সত্যিই মুশকিল, না? তৃতীয় ছবিটিতে দেখুন—যিনি আহত হবার ভঙ্গিতে তিনি অরুণকুমার, উদ্যতমুষ্টি অন্যজন নিলয়বাবু। আহত হয়ে নার্সিং হোমে যাবার আগে এটাই অরুণকুমারের শেষ ছবি।"

—ব্যাণ্ডো সাহেব! নিলয় অস্ফুটে বলল।

—ও ব্যাটা মাতালের মাথার ঠিক আছে, জগদীশদা বলল, তোকে এমনি প্রোজেকশন দেখিয়ে দিয়েছে। তুরুপ সেন দু'বোতল দামী মদ খাইয়ে প্রোজেকশন দেখেছে, তিনটে স্টিলও বার করে এনেছে। দেখ, দেখ, আরো কি লিখেছে দেখ. সবটা পড়া হয়ে গেল?

—না।

"পাঠক-পাঠিকারা লক্ষ্য করে থাকবেন ছবিটির প্রযোজক পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান সেদিনের দুর্ঘটনা সম্পর্কে একেবারেই মুখ খুলছেন না।

অরুণকুমার শুটিংয়ের সময় বাইরের লোককে থাকতে দেন না। শুটিংয়ের সময় ছিলেন শুধু অরুণকুমার, তার ডামি, প্রযোজক, পরিচালক, ক্যামেরাম্যান ও কয়েকজন কর্মী। কর্মীরাও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। অবশ্য কর্মীমহলে নানারকম আলোচনা চলছে নিজেদের মধ্যে। তাঁরা ক্ষুব্ধ। অবশ্যই নিলয়বাবুর বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ। তাঁরা নিলয়বাবুর দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকে দায়ী করছেন। তাঁদের ধারণা নিলয়বাবু সতর্ক হয়ে কাজ করলে অরুণকুমারের আঘাত লাগত না।

কর্মীদের ক্ষোভের কারণ আছে। অরুণকুমার আহত হওয়ায় তাঁদের অনেকেই আজ বেকার। কিন্তু তাঁদের অভিযোগে কি কোনো সত্যতা আছে? নিলয়বাবু কি এতই নির্বোধ যে বেপরোয়া কাজ করে গোটা সিনেমা শিল্পকে, সেই সঙ্গে নিজেকেও বিপদে ফেলবেন? অরুণকুমারের জন্যই ইনডাস্ট্রিতে নিলয়বাবুর কদর। না, নিলয়বাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাঁকে আমাদের মোটেই নির্বোধ মনে হয়নি, বরং আমাদের তাঁকে মনে হয়েছে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ভদ্র ও বিবেচক। নিলয়বাবুর এইসব গুণাবলীই দুর্ঘটনার রহস্যটাকে আরো জটিল ক'রে তুলেছে। আমাদের প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমরা তাঁর সৌজন্যে বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হয়েছি। কেন যে কোনো কোনো মহল থেকে তাঁকে দায়ী করা হচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা নিঃসন্দেহ যে সচেতনভাবে নিলয়বাবু অরুণকুমারকে আঘাত করেননি, করতে পারেন না।"

—এ যে গাধার গবেষণা। আমার মতো মুখ্যুও এসব লিখে কি হয় বুঝতে পারছে

না। নিনা মন্তব্য করল।

—আমাদের দেশে সত্যিকারের গাধা আর হারামীর সংখ্যা তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। নইলে এগুলো ছাপাও হত না, বিক্রিও হত না. জগদীশদা অশালীন শব্দ ব্যবহার করেও নির্বিকার, কদ্দূর হল? ইণ্টারভিউটা এসেছে?

—না।

—তাড়াতাড়ি পড়্। ছাইপাঁশ অনেকটা এখনো পড়তে হবে।

—না পড়লাম।

—না, তোদের পড়া দরকার।

"নিলয়বাবুর সঙ্গে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি তুরুপ সেনের সাক্ষাৎকার আমরা হুবহু ছেপে দিলাম।"

এরপর সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়েছে।

"আপনারা লক্ষ্য করবেন ডামি নিলয়বাবু সব সময় অরুণকুমার সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। নিজের আর্থিক দুরবস্থা, কাজের স্বীকৃতির অভাব ইত্যাদির জন্য নিজের যোগ্যতার অভাব বা ভাগ্যকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু তবুও তার চাপা ক্ষোভ ঈর্ষা ক্রোধ গোপন থাকেনি। সাক্ষাৎকারের সময় তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন নিজেকে সংযত রাখতে, তবু সময় সময় তার গোপন যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। মুখে ফুটে উঠেছে উত্তেজনা ও বেদনার নানা অভিব্যক্তি।

আমাদের ক্যামেরাম্যান জ্যাকি খাম্বাটা এমনি কয়েকটি মুহূর্ত ধরে রেখেছেন তাঁর ক্যামেরায়, তা থেকে তিনটি আপনাদের উপহার দিলাম।

·· আমরা বলতে চাই অ্যাক্সিডেণ্ট ইজ অ্যাক্সিডেণ্ট। নিলয়বাবুর ঘুষিতেই যদি অরুণকুমার আহত হয়ে থাকেন তাহলেও তিনি দায়ী নন। নিলয়বাবু অবশ্য বলেছেন তাঁর ঘুষি অরুণকুমারের পেটে লাগেইনি। তাঁর পেটে আঘাত লেগেছে পড়ে যাবার সময়, টেবিলের কোণে। যদি ধরেও নেয়া যায় যে নিলয়বাবুর ঘুষিই অরুণকুমারের আঘাতের কারণ, সে ক্ষেত্রে আমরা মনে করি তিনি সজ্ঞানে এ কাজ করেননি।

বছরের পর বছর ধরে নিজের অনেকটাই তিনি ধার দিচ্ছেন অরুণকুমারকে। অথচ ভদ্রভাবে জীবনযাপন করার মতো অর্থও তাকে দেয়া হয় না, সম্মান মর্যাদা খ্যাতি তো অবাস্তব কল্পনা। অরুণকুমারের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে নিলয়বাবু কি যন্ত্রণা ভোগ না করে পারেন? ফ্রাসট্রেশন কি তাঁর পক্ষে অনিবার্য নয়? কে বলতে

পারে যে সেই মুহূর্তে সাজানো ঘুষিটাই বজ্রমুষ্টি হয়ে ওঠেনি? আমরা নিলয়বাবুকে দায়ী করছি না। শুধু মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনার দিক থেকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছি। যদি এই ব্যাখ্যা সত্যি হয়, তাহলে সমস্ত ঘটনাটার জন্য দায়ী নিলয়বাবু নন, দায়ী ইনডাস্ট্রির বঞ্চনা, ইনডাস্ট্রির দীর্ঘ বঞ্চনাই হয়তো নিলয়বাবুকে সেই মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত করে ফেলেছিল।

যদি নিলয়বাবুর ঘুষির আঘাতেই অরুণকুমার আহত হয়ে থাকেন তাহলে এ ছাড়া ঘটনার আর কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে না। সজ্ঞানে নিলয়বাবুর পক্ষে এ কাজ করা অসম্ভব, অবাস্তব, অবিশ্বাস্য। অন্যথায় টেবিলের কোনায় আঘাত লাগা সম্পর্কে নিলয়বাবু যা বলেছেন তা-ই একমাত্র সম্ভাব্য বিকল্প বলে আমরা মনে করি।"

নিলয় নিনার পাশ থেকে সরে এসে জগদীশদার পাশে বসল। নিনা তখনো পড়ছে।

—তুই সেদিন আমাকে বলিসনি কেন যে তুরুপ সেন তোর কাছে এসেছিল? জগদীশদা জিজ্ঞেস করল।

নিলয় নীরব।

—বল্ কেন চেপে গিয়েছিলি।

—তুরুপ সেন ইণ্টারভিউর জন্য আমাকে দু'হাজার টাকা দিয়েছে। নিলয় মুখ নিচু করে আস্তে বলল।

—শুধু তা-ই?

—ইণ্টারভিউ না দিলে স্টিলগুলো ছেপে যা ইচ্ছে তা-ই লিখত।

—তুই অমনি ভয় পেয়ে গেলি। এখনো যা ইচ্ছে তা-ই লিখেছে। তুই স্টুডিও পাড়ার গুজবটাকে একেবারে কাগজে এনে ফেললি। আমি ভেবেছিলাম আস্তে আস্তে সব থিতিয়ে যাবে। কিন্তু আর কোনো রাস্তা রইল না। অরুণকুমার খেপেই আছে, আরো খেপে যাবে। কাগজগুলো এ নিয়ে গবেষণা চালাবে বহুদিন।·· তোকেই বা দোষ দিয়ে কি হবে, বুঝি সবই।

নিনা কাগজটা জগদীশদার হাতে দিয়ে নিলয়কে বলল রীতিমতো চড়া সুরে -তুমি বিনোদন-বার্তার বিরুদ্ধে মামলা কর। আচ্ছা জগদীশদা, মামলা করা যায় না?

—হ্যাঁ, যায়, জগদীশদা ম্লান হাসল, তিন লক্ষ টাকা খরচ করতে পারলে দশ লক্ষ টাকা হয়তো আদায় করা যায়। কিরে, পারবি?······দেখ্, অন্যায়ের প্রতিকার-

র্তিকার শুনতে ভালো। কিন্তু আদালত হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে গরিব মানুষই সবচাইতে অসহায়। মানুষ কোথায় নেমে গেছে ভাবা যায় না। নীতির প্রশ্নে লড়াই করা মানুষ ভুলে গেছে। লড়াই হবে আমার বা আমার গোষ্ঠীর মুখ চেয়ে। এবং লড়াইয়ের সঙ্গে সব সময় লাভ-ক্ষতির হিসেব থাকবে। সবচেয়ে আগে হিসেব করে দেখা হবে এ লড়াই শুরু করলে যারা রাগতে পারে তারা না-রাগলে আমার লাভ বেশি না লড়াইতে জিতলে লাভ বেশি। নীতি-ফীতি বহুকাল নির্বাসনে গেছে। মলয় পাত্রর কাছে গেলাম, সে যুক্তি দেখাল নিলয় টেকনিসিয়ান নয়, অতএব টেকনিসিয়ানস্ ইউনিয়নের কিছু করার নেই। প্রবালকুমারের কাছে গেলাম। সে বলল, নিলয় আর্টিস্ট নয়, তাই আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের এ ব্যাপারে নাক গলানো চলে না। কিন্তু নিলয় যে একটা সৎ সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ, তার প্রতি কয়েকটা লোক যে বিরাট অন্যায়টা করে যাচ্ছে শুধুমাত্র নিজেদের পকেট ভারি করার জন্য, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবে না? লড়াই মানে এখন দরাদরি করে কিছু আদায় করা। এটা যে সর্বনেশে ব্যাপার কেউ বুঝছে না। যার দরাদরি করবার ক্ষমতা বেশি, যারা দলে ভারি, তাদের আদায়ও হবে বেশি। যারা তুলনায় কম ভারি, তাদের আদায়ও হবে কম। আর যাদের দল বাঁধার ক্ষমতা নেই, যেমন নিলয়, তারা শুধু পড়ে পড়ে মার খাবে। পাওনা আদায়ের সমস্ত লড়াই একটা পরিষ্কার সমান নীতি থেকে হওয়া উচিত। নইলে আমরা নিজেরাই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাব। প্রবালকুমার প্রবালকুমারের মতোই বলেছে, ও নিয়ে ভাবি না। কিন্তু মলয় পাত্রর মুখে কি ও বক্তব্য মানায়? মানুষ কোন্ পরিচয়ে জোট বাঁধবে? আমি খেটে খাই—এই পরিচয়ে? না, আমি এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, অতএব বিশেষ সুবিধা আমার প্রাপ্য—এই পরিচয়ে?

জানি, পুরোপুরি এটা মেনে চলা সম্ভব নয়। কিন্তু, ক্রমাগত আলাদা আলাদা দলে সুযোগসুবিধা আদায়ের জন্য পাঞ্জা লড়া চলতে থাকলে কোথায় গিয়ে ঠেকব আমরা? মানুষের মিলবার জায়গাটাই যে নষ্ট হয়ে যাবে। কেউ নিজের গোষ্ঠীর বাইরে তাকাচ্ছে না। এই বুঝি তার সুবিধায় হাত পড়ে যায়।...আচ্ছা নিলয়, বিনোদন-বার্তার পাতা ওলটাতে ওলটাতে জগদীশদা বলল, তুই সুলক্ষণার কাছে গিয়েছিলি কেন?

সপ্রশ্ন চোখে নিলয়ের দিকে তাকাল নিনা। নিলয়ের চোখ মেঝের ওপর।

বিনোদন-বার্তার শেষের দিকে একটা জায়গা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কাগজটা নিলয়ের হাতে দিল জগদীশদা। নিলয় আচ্ছন্নের মতো হয়ে আছে। কাগজটা ওর

াতে, কিন্তু পড়ে দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

নিনা কাগজটা নিলয়ের হাত থেকে নিয়ে নিল।

মাঝামাঝি হরফে :

"অরুণকুমারের ফ্ল্যাটে নিলয় মজুমদার কেন?"

তারপর :

"এই সংখ্যায় নিলয় মজুমদারকে নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন যখন ছাপা হচ্ছে তখন আমাদের কাছে সংবাদ আসে যে তিনি হিলটন স্ট্রীটে অরুণকুমারের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। তিনি আধ ঘণ্টার মতো সময় সেখানে ছিলেন। হয়তো সুলক্ষণা দেবীর বিপদের সময় তাঁকে সান্ত্বনা দিতেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

আমরা টেলিফোনে সুলক্ষণা দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। অরুণকুমারের জন্য তিনি খুবই উদ্‌বেগ উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

নিলয় মজুমদার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কিনা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি সরাসরি নিলয় মজুমদারকে অরুণকুমারের দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করে বলেন যে, তিনি নিলয়বাবুর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করবেন। আমরা অবশ্য সুলক্ষণা দেবীর উক্তিকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। কারণ, মামলা করতে হলে করতে পারেন অরুণকুমার, সুলক্ষণা দেবী নয়। অরুণকুমার বিচক্ষণ মানুষ, তিনি অকারণ মামলায় একজন নির্দোষ মানুষকে জড়াবেন কেন? কিন্তু নিলয়বাবুর সঙ্গে সুলক্ষণা দেবীর কি কথাবার্তা হয়েছিল সে প্রশ্নে তাঁর নীরবতা রহস্যময়।"

কাগজটা খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে নিনা ফুঁসে উঠল—ইস, মামলা করবে? করুক না মামলা। একটা নোংরা মেয়েছেলে···। কিন্তু তুমি, তুমি ওর কাছে গিয়েছিলে কেন? আমাকেও তো বলনি।

নিলয় একবার নিনার মুখের পানে তাকিয়েই আবার মাথা নিচু করল।

—তুরুপ সেন আমাকে বলেছিল ওর সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে বলতে পারলে হয়তো সুবিধা হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম যাব না। কিন্তু সেদিন জগদীশদার বাড়ি থেকে ফেরার পথে হঠাৎই মনে হল দেখি না একবার গিয়ে।

—কি দেখলে গিয়ে? কি লাভ হল তোমার? নিনার গলায় ঝাঁজ।

নিলয় নিরুত্তরে অসহায়ভাবে তাকাল।

—তোকে আর বলতে হবে না, যা বোঝবার আমি বুঝে নিয়েছি, জগদীশদা

বলল, আরে বোকা, তুরুপ সেনের চাল তুই বুঝতে পারিস নি। ও তোকে টোপটা গিলিয়ে নিশ্চয়ই অরুণকুমারের ফ্ল্যাটের কোনো কাজের লোককে ঘুষ-ঘাষ দিয়ে নজর রাখতে বলেছিল। খবর শুধু যে আপনা-আপনি তৈরি হয় তা নয়, খবর তৈরিও করে নিতে হয়। যাক, সাগরে যার শয্যা শিশিরে তার ভয় কি? মামলা-ফামলা হবে না। ও নিয়ে আমি চিন্তা করছি না। কিন্তু…

মা চা নিয়ে ঢুকতে জগদীশদা চুপ করে গেল।

—নাও বাবা, চা খাও। জগদীশদার সামনে চায়ের পেয়ালা রেখে মা বললেন।

—আপনি আবার অসুস্থ শরীরে চা করতে গেলেন কেন মাসিমা?

—আমি এখন বেশ ভালোই আছি বাবা।

—জগদীশদা, যা বলছিলেন আপনি মা'র সামনেই বলুন। আমি যতদূর জানি মাকে সবই বলেছি। নিনা বলল।

—হ্যাঁ নিলু, বৌমা আমাকে বলেছে। জগদীশ, বাবা, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম। আমার ছেলেকে তুমি অন্য যে কোনো একটা কাজ ঠিক করে দাও। এ কেমন কাজ যেখানে প্রাণপণ খেটেও পরগাছা হয়ে থাকতে হয়? এ কাজ নিলুকে আর আমি করতে দেব না। আমার কিছু সোনা আছে। যদি দরকার হয় সেগুলো বিক্রি করেও টাকা পাওয়া যাবে। আমার ছেলেকে আমি জানি। দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবার ক্ষমতা ওর আছে। তুমি শুধু রাস্তাটা ওকে দেখিয়ে দাও বাবা।

—না মা, সোনা তুমি বিক্রি করতে পারবে না। নিলয় বলল।

—তুই তোর দাদা আর বোনেদের কথা ভাবছিস। ওরা কি মনে করবে—তা-ই না? ওরা আমার জন্য কতটুকু ভেবেছে, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কতটুকু দাম দিয়েছে যে আজ আমি ওদের জন্য ভাবতে বসব? না নিলু, অত উদার আমি নই। শুধু পাবার জন্যে যারা হাত বাড়িয়ে আছে, দেবার হাত কখনো বাড়ায় না তারা আমার সন্তান হলেও তাদের দিয়ে-থুয়ে ভালো-মা হতে আমি চাই না।

—আমিও যে শেষ পর্যন্ত ঐ রকমই হব না কে বলতে পারে। নিলয়ের মুখে হাসি ফুটল।

মাও হাসলেন—কেউ বলতে পারে না ঠিকই। তবে মা বোধ হয় অন্যদের চাইতে বেশি পারে।

—যাক, বাঁচা গেল, জগদীশদা হঠাৎ যেন নিজের স্বাভাবিক খুশির মেজাজ ফিরে পেল, আমি ভাবতেই পারছিলাম না কি করে কথাটা পাড়ব। নিলয়, আমি মাসিমার

সঙ্গে একমত, তোর ডামিগিরির এখানেই শেষ। তোকে নতুন করে শুরু করতে হবে। মানুষ মানুষের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে। সেখানে মানুষ যেমন দেয়, তেমনি নেয়। কম-বেশি থাকে। কিন্তু আমি একটা মানুষকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, অন্তত তার আধাআধি তো আমিই, অথচ তার দাবি ষোল আনার ওপর আঠারো আনা, আর আমার টিকে-থাকা সে দয়া করলে তবেই। অরুণকুমার যে তোকে আর দয়া করবে তাও মনে হয় না। নিলয়, অন্য পথ তোকে দেখতেই হবে।

অসহায়ভাবে নিলয় বলল—কি করব আমি?

—আরে বাবা, যার ঘরে এমন দু-দুটো সাহসের জায়গা আছে তার আবার ভয় কি? আমার একটা প্ল্যান আছে। অভিনয়ে অনেক রিস্ক তুই নিয়েছিস। যে কোনো সময়ে অ্যাক্সিডেণ্টে মারা পড়তে পারতিস। তার বদলে তুই পেলি কি? হঠাৎ আবিষ্কার করলি তোর নিজের কাজও তোর নিজের নয়। এবার থেকে তোর নিজের কাজের মালিক তুই নিজেই হবি। ফিল্ম-লাইনে তোর হবার মতো কাজ আপাতত আমি দেখছি না। আমি যা ভেবেছি, বলছি। মাসিমার সোনা এক্ষুনি বিক্রি করবার দরকার নেই। সোনা কিনতেই দাম, বিক্রির সময় অর্ধেকও পাওয়া যায় না। শোন্, তোর ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দে। খদ্দের আমি ঠিক করে দেব। বাড়িঘরের দাম যা বেড়েছে তুই সরকারী দেনা শোধ করেও হাজার তিরিশ টাকা লাভ পাবি। আমার বাড়ির কাছে দু'খানা ঘর দেখে রেখেছি। বড় ঘর, তবে টালির চাল, তাতে যায় আসে না। ওখানে উঠে চলে আয়।

—তারপর? মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল নিলয়।

—তারপরের ভাবনা আমার। তিরিশ হাজার মূলধন থাকলে মাসে দু-আড়াই হাজার রোজগার কোনো সমস্যা নয়। দোকান দিয়ে বসলেও ভালোই চলে যাবে। দোকানঘর আমি ঠিক করে দেব। দোকান চালু করে দেবার দায়িত্ব আমার। শহর যে রেটে বাড়ছে তাতে খদ্দেরের অভাব কোনোদিন হবে না।

—তার মানে আমাকে পালিয়ে বাঁচতে হবে? ফিল্মে আমি কাজ করতে পারব না?

—হ্যাঁ, পালিয়েই বাঁচতে হবে। যুদ্ধটা ফিল্মে কাজ করা না-করার নয়, যুদ্ধটা বেঁচে থাকার। কাজের মর্যাদা না থাকলে তার সঙ্গে আত্মমর্যাদার প্রশ্ন জুড়ে দেয়া ঠিক নয়। তাতে কষ্ট শুধু বাড়বে। বুঝতে পারছি, হঠাৎ একেবারে অচেনা রাস্তায় চলতে বললে মানুষ ইতস্তত করে, সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পায়। তুই ভেবে দেখতে সময় নে, কিন্তু

দিন সাতেকের বেশি না। ঘর দুটো হাতছাড়া হয়ে গেলে ঘর পাওয়া শক্ত হবে। মনে রাখিস, তোর চেনা রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন রাস্তা তোকে ধরতেই হবে। মোহ রাখিস না। এ সমাজে এসব সেন্টিমেণ্ট মোহ ছাড়া কিছু নয়। তুই ভেবে দেখ্।

জগদীশদা কাঁধের ঝোলায় বিনোদন-বার্তাটা রেখে উঠে দাঁড়াল। মা'র পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল—মাসিমা, নিলুকে আমিই এ কাজে এনেছিলাম। তখন ওর যা হোক একটা কাজের দরকার ছিল। এখন আবার ওরই ভালোর জন্য একেবারে নতুন পথে ওকে নিয়ে যেতে চাই। আপনি ওকে সাহস দেবেন। সাহস দেবার ক্ষমতা আপনার আছে। আমি বুঝেছি। চলি রে নিনা।

জগদীশদা চলে যেতে নিলয়ের মনে হল দুটো জরুরী বিষয় জগদীশদাকে তার জিজ্ঞেস করার ছিল। কিন্তু এমন অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে মনেও পড়েনি। আজ সকালের ডাকে ব্রতীন পুরকায়স্থর একটা চিঠি এসেছে। উনি তাকে দেখা করতে লিখেছেন। হঠাৎ তাকে ওঁর কি দরকার পড়ল? জগদীশদা আন্দাজ দিতে পারত। ডি. কে. বাসুর ব্যাপারেও হয়তো জানা যেত। যাকগে, পরে কথা বলে নেয়া যাবে। আপাতত সবচেয়ে বড় সমস্যা জগদীশদার প্রস্তাব। বড্ড বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে না কি?

১৪

বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স হবে ছেলেটির। তাজা সতেজ চেহারা। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। হাতে একটা বড় ডায়েরি, কয়েকখানা পত্র-পত্রিকা। দরজার বাইরে ছেলেটি।

আধ-খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে নিলয় বলল—কাকে চাই?

—আপনিই তো নিলয় মজুমদার?

—হ্যাঁ। আপনি?

—আমার নাম তরুণ লাহিড়ী। একটা ফিল্ম-ম্যাগাজিন চালাই—আমাদের চলচ্চিত্র। দেখেছেন কিনা জানি না। কমার্সিয়াল কাগজ নয়। সিনেমাটাকে আমরা সিরিয়াসলি বুঝতে চাই। আমরা মনে করি এটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল মিডিয়াম। সিরিয়াস প্রবন্ধ আলোচনা রিভিয়্যু আমরা ছাপি। আমাদের কাগজের বিক্রি কম, কিন্তু একটা বিশেষ সার্কেলে কদর আছে। আপনার সঙ্গে দরকার ছিল।

—আমার সঙ্গে দরকার? নিলয় সন্দেহের স্বরে বলল।

ছেলেটি হাসিমুখে বলল—সাংবাদিকদের বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে শক্ত। তবু একটু আলাপ করা যাক না।

ছেলেটির সহজ আন্তরিক ভঙ্গি নিলয়কে সরাসরি আপত্তি করতে দিল না। ইতস্তত করে বলল—আসুন।

—আমাদের পত্রিকার কয়েকটা সংখ্যা আপনার জন্য নিয়ে এসেছি, ছেলেটি চৌকিতে বসে বলল, পড়ে দেখবেন। মতামত দেবেন।

—আমার মতামতের কি দাম আছে? পত্রিকা নিয়ে দেখতে দেখতে নিলয় বলল।

—আপনারা, যারা ছবি তৈরির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আছেন, তাঁদের মতামতের দাম নেই? ছেলেটি উজ্জ্বল চোখে তাকাল নিলয়ের দিকে, আমার মনে হয় সত্যি-কারের দামী মতামত অ-নামী লোকের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। নামী লোকের মতামত পাবলিসিটি মিডিয়াগুলি খুব ফোকাস করে। আমার কিন্তু ভীষণ হাসি পায়, বেশির ভাগই ছেঁদো কথার বাণ্ডিল। দেখবেন আপনি লক্ষ্য করে। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় প্রথম খবর হয়ে হয়তো বেরুল—অমুক বলেছেন, ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য। আহা, কি আবিষ্কার!

তরুণ লাহিড়ীকে নিলয়ের ভালো লাগছে। জড়তা নেই, ভান নেই। কথা বলার সময় ওর চোখে বুদ্ধির দীপ্তি ও সারল্য একই সঙ্গে খেলা করে।

নিলয় হেসে বলল—তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনার কি কাজ হবে?

—মস্ত বড় একটা কাজ হবে বলেই আশা করছি। সাধারণভাবেই সাংবাদিকতার চরিত্র বহুদিন হল নষ্ট হয়ে গেছে। ফিল্ম-ম্যাগাজিনগুলোর ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি দেখা যাচ্ছে। চালু ফিল্ম-ম্যাগাজিন মানেই নোংরামির ফলাও কারবার। ইয়ং জেনারেশনকে অধঃপাতে পাঠাবার কাজটা এরা বেশ প্ল্যানড্ ভাবে করে যাচ্ছে। এর পেছনে স্পষ্ট রাজনীতি আছে। পয়সা কামানোই একমাত্র লক্ষ্য নয়। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সক্ষম প্রতিবাদ জানাতে পারে তরুণ সমাজ। তাদের গোল্লায় দিতে পারলে সমাজের সুবিধাভোগী অংশটা নিজেদের অনেক নিরাপদ ভাবতে পারে। এরাই চালায় বিনোদন-বার্তার মতো কাগজ। সমস্ত নিউজ আর অ্যামিউজমেণ্ট মিডিয়াগুলোকে এরা ভেবে-চিন্তে পলিউট করছে। এদের হাতেই

দেশের শিল্প-বাণিজ্য, সাদা-কালো টাকার পাহাড়, কাজেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশকে কিনে নিয়ে কারবারটা ভালোভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে। যাক, বক্তৃতা দিয়ে আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। এসব নিশ্চয়ই আপনি জানেন। আপনার সঙ্গে আমার দরকারটা বলি। আমাদের পত্রিকা শুধু পত্রিকা নয়, আন্দোলনের হাতিয়ার। বিনোদন-বার্তারা যা করতে চায়, আমরা করতে চাই তার বিপরীত কাজটা। আচ্ছা নিলয়বাবু, বিনোদন-বার্তায় আপনার সম্পর্কে যা বেরিয়েছে আপনি তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিতে চান? আপনি কি করবেন ঠিক করেছেন?

—করবার কি আছে? কি করতে পারি আমি?

—তা ঠিক, এদের বিরুদ্ধে একলার ক্ষমতায় লড়তে আপনি পারবেন না। কিন্তু আমরা যদি এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসি আপনি আমাদের সাহায্য করতে রাজী আছেন কি? ভেবে দেখুন, যদি মনে করেন আপনার ক্ষতি হতে পারে, তাহলে কখনোই আমি আপনাকে বলব না আমাদের প্রস্তাবে রাজী হতে।

—সিনেমায় আমার ক্যারীয়ারের ইতি হয়ে গেছে···আপনারা কি করতে চান বলুন।

—আমরা এই ব্রথেল-ম্যাগাজিনগুলোর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে চাই। ওরা যেসব নোংরা জিনিস ছাপে সেগুলো নিয়ে সমালোচনা করা যায়, ইস্যু হিসেবে নিয়ে আন্দোলন করা যায় না। কিন্তু শুধু একটা সেনসেশনাল নিউজ তৈরি করে পয়সা লোটবার জন্য ওরা আপনাকে ভিকটিমাইজ করেছে! এই ইস্যুতে অনেকদূর এগনো চলে। বিনোদন-বার্তার মতো কাগজগুলোকে শিক্ষা দেবার এই একটা সুযোগ। আমরা এটাকে ইস্যু করতে চাই।

—কিভাবে এগোতে চান?

—একজন সৎ সাধারণ কর্মী মানুষকে অকারণে স্ক্যাণ্ডালাইজ করার বিরুদ্ধে আমরা সম্পাদকীয় লিখেছি। সেটা ছাপব। আপনার একটা জোরালো বক্তব্যও ছাপা হবে। কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, যাঁরা বাস্টার্ডগুলোর কাছে মাথা বিক্রি করেননি, তাঁদের বক্তব্যও থাকবে। আমরা সহযোগী সংগঠনগুলিকে জড়ো করে প্রতিবাদ-সভা করব। ফাণ্ড তুলে আপনাকে দিয়ে মামলা করাব। মামলা আর আন্দোলন চলবে পাশাপাশি। আমরা মনে করছি একটা ধাক্কা ওদের দেয়া যাবে।

—অর্থাৎ আমাকে নিয়ে রাজনীতি করবেন? নিলয়ের মুখে কৌতুকের হাসি।

তরুণ অদম্য। বলল—নিশ্চয়ই। রাজনীতিকে ঠেকাতে হবে রাজনীতি দিয়েই।

হিতোপদেশের দিন শেষ হয়ে গেছে। আপনার ভালো কতদূর হবে জানি না, ক্ষতি যা হবার তা হয়েই গেছে। তবে ইস্যুটাকে আমরা যেভাবে নিতে চাই তাতে কিছু লোকের অন্তত চোখ ফুটবে। সেটাই লাভ। আপনার, আমার, সকলের।

নিলয় একটু ভাবল। তরুণ উদ্দেশ্য গোপন করেনি, নিলয়ের ভালো করার প্রতিশ্রুতি দেয়নি। ছেলেটা সৎ, সন্দেহ নেই। নিলয় মনের গোপনে জানে, পুরনো কাজ ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু ফিল্মের জগতেই কাজ করার অন্য কোনো সুযোগ এসে যাবে এ ধরনের অস্পষ্ট আশা মনের মধ্যে কাজ করছে। নইলে জগদীশদার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে তার রাজী হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

—আমি কি বিবৃতি দেব, নিলয় পাশ কাটাতে চাইল, বলা-লেখা কোনোটাই আমার আসে না।

—আমি বলে যাব, আপনি লিখে সই করে দেবেন। কোথাও ভুল বা আপত্তিজনক মনে হলে আলোচনা করে ঠিকঠাক করে নেয়া যাবে।

—আমি বলি কি, নিলয় আমতা আমতা করে বলল, বিবৃতিটা এখন থাক।

নিলয়ের চোখে চোখ রেখে মিটিমিটি হাসল তরুণ—সরাসরি জড়াতে চাইছেন না?

—হ্যাঁ। বিনোদন-বার্তার সঙ্গে ইনডাস্ট্রির বোঝাপড়া কোথায় এবং কতদূর তা আমার চেয়ে আপনি ভালো জানেন। ইনডাস্ট্রির কর্তাদের ওরা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। তাই আমার জড়িয়ে পড়া বোকামি। সম্পাদকীয়তে আপনাদের যা বলবার বলতে পারেন, বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যও ছাপতে পারেন। মামলা আপাতত থাক, প্রতিবাদ-সভার ব্যাপারটাও পরে ভাববেন।

—যা যা বন্ধ রাখতে বলছেন সেগুলোই যে আসল। সম্পাদকীয় আর বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য ছেপে আমরা যে কাজটা করতে চাইছি তা করা যাবে না। মামলা হলে সমস্ত কাগজে তার কভারেজ থাকবে, কারণ লোকে মুখিয়ে থাকবে মামলার খবরের জন্য। প্রতিবাদ-সভারও ভালো কভারেজ পাওয়া যাবে। এ দুটো কাজ আপনাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। মামলা করবেন আপনি, ফাও তুলে দেব আমরা। আপনার জন্য প্রতিবাদ-সভা, আপনি অনুপস্থিত, তা কি হয়। আপনার আপত্তি কোথায় বুঝতে পারছি না। আপনার ব্যক্তিগত লাভের জন্য আমরা কিছু করছি না, কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত ক্ষতিরও কোনো কারণ নেই। বলুন, আছে?

—আমি আপনাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই অ্যাপ্রিসিয়েট করি, নিলয় বলল, কিন্তু

খোলাখুলি আপনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেমে পড়লে দরজাটা যাতে একেবারে বন্ধ হয়ে যায় সে ব্যবস্থা ওরা করবে।

—করবে। তাতে আপনার কি হল? সব রাস্তাই আপনার বন্ধ হয়ে গেছে ধরুন, মামলা করলেও, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, জিততে পারবেন না। ক্ষতিপূর পাবেন? না। বোকার মতো আশা করে লাভ নেই। আমরা যা ভেবে সমস্তটাই লোকের সামনে ওদের চরিত্র অন্তত খানিকটা মেলে ধরবার একটা প্রসেস আপনি যদি মনে করেন এতে আপনার বিপদ আছে, আমরা আপনাকে বাধা করা পারি না। তরুণের চোখ তীক্ষ্ণ হল।

তরুণের স্পষ্টতার সামনে নিলয় বিব্রত অসহায় বোধ করতে লাগল। তরুণ ভালো কাজই করতে চায়। হয়তো ওদের চেষ্টায় ফলও মিলবে—হাতে হাতে প্রাপ্তি নয়, অনেক বড় প্রাপ্তির মুখ চেয়ে মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস। নিলয় বোঝে না তা নয়। তবু—

নিলয় তরুণকে বোঝাতে সচেষ্ট হল—আমি সবই জানি তরুণবাবু। কিন্তু মানুষ ডোববার সময় কুটোগাছটাও আঁকড়ে ধরতে চায়। আমি খুঁচিয়ে ঘা করতে চাই না।

—আপনার খোঁচানোর দরকার নেই। গ্যাংগ্রিন এমনিতেই শুরু হয়ে গেছে কেটে বাদ দিলে তারপর হয়তো ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে পারবেন। ওষুধের ভরসা থাকলে প্রাণটাও যাবে। তরুণের হাসিটা বিদ্রূপেও করুণ।

—মানুষের মন থেকে দয়ামায়া উবে গেছে বলছেন?

—কোন্ মানুষের কথা বলছেন? ব্যক্তি-মানুষ? না, পচা-গলা একটা সিসটেমে মধ্যে টাকা তৈরির যন্ত্রে পরিণত হওয়া মানুষ? তরুণ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল।

নিলয় না-বোঝার দৃষ্টি চোখে নিয়ে তাকিয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত, তারপ বলল—তবু…

—ধন্য আশা কুহকিনী, তরুণ হেসে ফেলল, ঠিক আছে, আপনাকে আড়াে রেখেই আপাতত আমরা যা করবার করব। তারপর যখন বন্ধ দরজার কড়া নাড়ে নাড়তে হাত ব্যথা হয়ে যাবে, দরকার মনে হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তখন আপনাকে নিয়ে আমি কিঞ্চিৎ রাজনীতি করব। আপনাকে কিছু পাইয়ে দেবার আশা দিতে আজও আসিনি, সেদিনও আসব না। সাদা বাংলায় বলি আপনাকে আমরা ব্যবহার করব বৃহত্তর স্বার্থে। আপনার জন্য দরজা খোলা থাকবে।

তরুণের ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল সে ওঠার জন্য তৈরি।

নিলয় মুখে হাসি টেনে বলল—এক মিনিট তরুণবাবু, আমার একটা জিনিস জানতে খুব ইচ্ছে করছে।

—বলুন।

—আমার সঙ্গে আপনি যেমন সহজভাবে আলাপ করলেন, অরুণকুমারের সঙ্গে কি তা পারবেন?

—আমি যদি ঘুরিয়ে প্রশ্ন করি, আপনি আমার সঙ্গে যে রকম সহজ হতে পারছেন অরুণকুমার কি তা পারবে?

—কথার প্যাঁচে আপনি ওস্তাদ।

—হতে পারি। তবে মিথ্যে বলিনি। আমরা দু'জনেই অংশত হলেও ব্যক্তি-মানুষ। অরুণকুমার যন্ত্র-মানব—বিশেষ সিসটেমের বিশেষ প্রোডাক্ট। ওর সঙ্গে শব্দের বিনিময় হতে পারে, র‍্যাপোর্ট হতে পারে না।

—কি যে বলেন বুঝি না, নিলয় আত্ম-সমর্পণ করল, অরুণকুমার যন্ত্র-মানব হলে আমি কি? আমি তো ওঁর ডামি।

—গোলমাল ঠিক ঐ জায়গাটায়—আপনার মানসিকতায়। ডামির কাজ আপনার প্রফেশন, ওটাকে আপনার মানসিকতা হতে দেবেন না। ধন্যবাদ। চলি তবে আজ।

—তাড়া না থাকলে বসুন না পাঁচ-দশ মিনিট, চা খেয়ে যান।

—তাড়া? বিন্দুমাত্র না। বরং আপনি না বললে বেরিয়েই চায়ের দোকান খুঁজতে হত।

নিলয়ের মনটা হঠাৎ আশ্চর্য স্নিগ্ধতায় ভরে উঠল।

১৫

রাস্তায় বিশেষ বেরোয় না নিলয়। পথ চলতে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। মনে হয় চারপাশের মানুষজনের দৃষ্টি তার ওপর। ওদের চোখে যেন ঘৃণা, অবিশ্বাস, বিস্ময়। সত্যিই কি তা-ই? নিলয় চোরা চোখে তাকিয়ে কোনো কোনো মুখের নীরব ভাষা চোখের ইঙ্গিত পড়তে চেষ্টা করার মতো সাহসী হয়ে ওঠে মুহূর্তেক।

নির্বিকার দেখায় মুখগুলো। নিজেকে প্রশ্ন করে নিলয়। সবটাই কি তার

কল্পনা? বিশাল শহরের অগুনতি মানুষের ক'জন বিনোদন-বার্তার খবর রাখে? বেঁচে-থাকার ঝঞ্ঝাটে মানুষ জেরবার। বেশির ভাগের ইচ্ছা-আগ্রহ-কৌতূহলে বিনোদন-বার্তার কেচ্ছা নিশ্চয়ই ভাগ বসাতে পারে না। বিনোদন-বার্তা লক্ষ কপি বিক্রি হলেও কয়েক কোটির তুলনায় সংখ্যাটা নিশ্চয়ই হিসেবে আনার মতো নয়। যারা পড়ে তারাও বিনোদিত হয়, মাথা ঘামায় না। চাল ডাল কেরোসিন রুজি-রোজগার মানুষের আসল সমস্যা, সেখানে তার আগ্রহ আন্তরিক ও গভীর। বিনোদন-বার্তাওলারা সমাজের শরীরটাকে কিভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে সে অনুসন্ধানের সময় বা বুদ্ধি তাদের নেই। প্রবল যুক্তির অন্তরালেও কিন্তু প্রবলতর অযৌক্তিক অনুভূতিটা কাজ করে চলে।

তবে সরকারী আবাসনে মাঝে মাঝে বিরক্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় বই কি। কারণ, এজমালি বাড়ি আর জল-কল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে যৌথ দায়িত্বের ফলে চেনাশোনা মেলামেশা অনেক বেশি। শহরের পাড়ার বাসিন্দাদের মতো ইচ্ছা হলে নিজেকে অপরিচিত রাখা এখানে সম্ভব নয়। নিজেদের প্রয়োজনেই মানুষকে মেলামেশা করতে হয়।

পরিচয়ের সুবাদে আবাসন এলাকার মধ্যে কারো কারো কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর নিলয়কে দিতে হয়েছে। এদের এড়িয়ে যাওয়া চলে না। সত্য-মিথ্যার মিশেল দেয়া কাহিনী নিলয় এদের উপহার দেয়। তবে কাহিনীটা যাতে সর্বত্র একই হয় এবং অসঙ্গতি না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। কারণ ভদ্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষেরা তাদের শিক্ষাদীক্ষার ঐতিহ্য বজায় রেখে সামনে সর্বদাই সদাশয় উদার সুবিবেচক। অন্তরালে নিজেকে ও নিজের পরিবারভুক্ত ক'জনকে বাদ দিয়ে যে কোনো মানুষের সহস্র সহস্র ছিদ্র এরা মুহূর্তে আবিষ্কার করতে পারে এবং নিজের যে প্রকৃতি-প্রদত্ত নবদ্বারের অতিরিক্ত কোনো ছিদ্র নেই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ট্রামে-বাসে, অফিস-কাছারিতে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এদের সম্পর্কে নিলয়ের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত, সে কারণে সামনে মিষ্টতা বজায় রাখতেই হয়। তবু এরা চেনা মানুষ। নিলয়ের ভয় অস্বস্তি আবাসন এলাকার বাইরে অচেনা মানুষজনের মধ্যেই বেশি। বাইরে বেরুতে সে আজকাল মাথায় রাখে সাদা খেলোয়াড়ী টুপি, চোখে গগলস্। নিজেকে গোপন রাখার আসল উদ্দেশ্যটাকে আড়াল রাখতে তৈরি আছে প্রচণ্ড গরমের অজুহাত।

নিনাকে অবশ্য অজুহাত দেখানোর দরকার হয় না। ও নিজেই নিলয়কে যাতে

বাড়ি থেকে বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়া বাইরে বেরুতে না হয় সে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বাজার দোকান ডাক্তার নিনাই দেখছে। বলেছে—তুমি কিছুদিন বাড়ি থেকে বেশি বেরুবে না। নেহাত যেখানে তোমার না গেলে নয় সেখানে যাবে।

—ভয় পাচ্ছ? লোকে আমাকে ধরে পেটাবে? নিলয় হেসেছে।

—না, ভয় পাচ্ছি না। তবে রাস্তাঘাটে তোমাকে বিরক্ত করার লোকেরও অভাব হবে না। আমাকেই এখানকার মেয়ে-বৌরা নানান প্রশ্ন করছে। নিনা বলেছে।

—তুমি কি উত্তর দিচ্ছ?

—যাকে যেমন উত্তর দিলে খুশি করা যায়।

—তার মানে?

—মানে আবার কি। ঘটনা তো একটাই। সেটাই যাকে যেমন করে বললে খুশি হয়। কেউ ভক্তিমতী বৌমার ভঙ্গি পছন্দ করে, কারো ভালো লাগে ছেনাল বৌদি, কেউ আবার খুব প্রাইভেট করে বলার ভাব দেখালে খুশি হয়। এই আর কি।

নিনার কথাগুলো মনে পড়তে নিলয়ের মনটা একটু হালকা লাগল।

নিনা বাজারে গেছে। যাচ্ছে ক'দিন ধরেই। নিলয়ের বাজারে যাওয়া তো চলবেই না, কারণ বাজারেই বেশি লোকের সঙ্গে দেখা হবে। এটাই নিনার যুক্তি।

মা রান্নাঘরে টুকটাক কাজ করছেন। মাকে কড়া শাসনে রেখেছে নিনা। তিনি কতটুকু কাজ করতে পারেন তা ও বেঁধে দিয়েছে। জানিয়ে দিয়েছে তার বেশি করলে হুলস্থুল কাণ্ড হবে। মা হাসিমুখে বৌমার শাসন মেনে নিয়েছেন।

বাবুসোনা এসে বাবার পাজামা খামচে ধরল।—এই বাবা, আয়।

—কেন? নিলয় বাবুসোনার থুতনি নেড়ে দিল।

—আয় না।

—এই ব্যাটা, বাবাকে কেউ তুই-তোকারি করে ছোটলোকের মতো?…কোত্থেকে শিখলি রে? তা, নষ্ট ভদ্রলোক হওয়ার চাইতে নির্ভেজাল ছোটলোক হওয়া ভালো, কি বলিস? বাবুসোনাকে কোলে তুলে নিলয় বলল।

—এই বাবা, আয় না। বাবুসোনা তার নিজস্ব সমস্যার সমাধানে অবিচল।

—চল্, ছাড়বি না যখন। বাবুসোনাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল নিলয়।

ছেলে বাবার হাত ধরে নিয়ে চলল।

—বাবা, জুজু…। বাবুসোনা কচি হাত তুলে ঘরের কোনায় দেখাল।

উইয়ের বাসা। সরু আঁকাবাঁকা রেখায় এগিয়ে চলেছে। অবাক কাণ্ড। বাড়িগুলো তৈরি হয়েছে মাত্র সাত বছর আগে। এরই মধ্যে মাটির আশ্রয় থেকে দেয়াল কুরে কুরে তিনতলা পর্যন্ত চলে এসেছে। অথচ বাড়ি তৈরির সময় নাকি ভিতে উই ঠেকানোর মালমশলা দেয়া হয়ে থাকে। তাহলে কি উই ঠেকানোর কথাটা ভাঁওতা? অথবা উই ঠেকানোর পদ্ধতিটাই আমাদের ভুল? ইঞ্চি কয়েক লম্বা একটামাত্র বাসা। নিলয় বাসার নিচে বাঁ হাতের তালু পেতে ডান হাতের আঙুলের টোকায় বাসাটা ভেঙে দিল। হাতের তালুতে ধুলোর মধ্যে কিলবিল করতে লাগল সাদা সাদা উইগুলো।

—জুজু…আলে বাবা…। বাবুসোনা দু'হাত তুলে এক পা পিছিয়ে গেল।

নিলয় উইগুলোকে লক্ষ্য করছে। আড়াল পেলে নিঃশব্দে কাজ সারতে ওরা ওস্তাদ, তাই কুরে কুরে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আড়ালটাও তৈরি করে নেয়। খোলা আলোয় বাতাসে ওদের ভয়, অস্থিরতা। নিলয়ের হাতের তালুতে ওরা ছটফট করছে, চেষ্টা করছে পালাতে, পারছে না, নিলয় হাতের তালু বারবার কুঁচকে ওদের এপাশ-ওপাশ সরে যাওয়া আটকাচ্ছে।

তারপর নিলয়, আস্তে আস্তে, বিচক্ষণ খুনীর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সমাধা করার মতো, ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে নির্বিকারভাবে ধুলো সমেত উইগুলোকে খৈনি ডলার মতো ডলতে ডলতে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। ওর স্থির দৃষ্টি তখন সাদা দেয়ালে একটা সূক্ষ্ম ফুটোর ওপর, যেখান দিয়ে ওরা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। দেয়ালের পেছনে ওদের অবাধ বিচিত্র সাম্রাজ্য কতদূর চলে গেছে কে জানে। হয়তো সমস্ত বাড়িটাকে নিয়েই চলছে ওদের কুরে কুরে খাওয়ার ষড়যন্ত্র। অদৃশ্য জালের মতো ওরা ঘিরে ফেলেছে বাড়িটাকে।

নিলয়ের হাত দুটো যন্ত্রের স্বয়ংক্রিয়তায় কাজ করে চলেছে।

—নিলু, কি হয়েছে রে ওখানে?

—অ্যাঁ!

মায়ের ডাকে নিলয় ঘুরে তাকাল।

—কি হয়েছে ওখানে? মা প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলেন।

—কিছু না। উই।

—ও। মা উই নামক সরল সত্যকে আমল না দিয়ে বললেন, উই আর দেখবার কি

আছে। ভূতের মতো কি দেখছিলি? চা খাবি?

—না। তোমার বৌমা ফিরলে আমি একবার বেরুব। নিলয় বলল।

—এসো দাদুভাই, তোমাকে দুধ খাইয়ে দি।

ঠাম্মার ডাকে বাবুসোনা সহজেই সাড়া দিল, সচরাচর যা ও করে না, কারণ দুধে আগ্রহ ওর কম।

এক হাতে বাজারের থলে আরেক হাতে এক তাড়া চিঠি নিয়ে বাড়ি ফিরল নিনা।

—এত চিঠি কিসের? নিলয় জিজ্ঞেস করল।

বাজারের থলে নামিয়ে রেখে নিলয়ের হাতে চিঠিগুলো দিয়ে নিনা বলল—তোমারই চিঠি। বিনোদন-বার্তা থেকে রি-ডাইরেক্ট করা।

—মা, মা, কি করছেন আপনি? নিনা হাঁক দিল।

—দাদুভাইকে দুধ খাইয়ে দিচ্ছি। মা বললেন রান্নাঘর থেকে।

—ঠিক আছে।

নিলয় আড়চোখে তাকিয়ে দুষ্টুমি করার ইচ্ছায় বলল—কাল থেকে আমি বাজারে যাব।

—কেন, খরচ বেশি করে ফেলছি?

—এ যে দেখছি উলটো চাপ। খরচ আমি দেখি কখনো? নিলয় হাসল।

—তবে?

—তোমার ওপর চাপ বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে।

—দয়া করে আমার জন্যে অত চিন্তা করো না। সইবে না। তারপর গলা নামিয়ে বলল নিনা, আর ক'টা দিন থাক। তোমার তো আজ বেরুনো আছে। কিছু করে দিচ্ছি, খেয়ে বেরুবে।

কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল নিনা।

চিঠিগুলো দেখতে লাগল নিলয়। বিনোদন-বার্তায় ভুরুপ সেনের কালোয়াতি বেরুনোর পর অরুণকুমারের ফ্যানদের প্রতিক্রিয়া। বহু মানুষের মগজে অরুণকুমারের বাণিজ্য কত গভীর তার পরিচয় রয়েছে চিঠিগুলিতে। নানান বয়সের, বিভিন্ন স্তরের, আপাত-শিক্ষায় আকাশ-পাতাল প্রভেদের মানুষ সব।

একজন লিখেছে—'অরুণকুমার মরিয়া গেলে আমি আত্মহত্যা করিব। কষ্ট আমি সহ্য করিতে পারিব না! তোকে আমি ঘেন্না করি।' মহিলার চিঠি। বয়স অনুমান

করার উপায় নেই, ভাষায় শিক্ষার বহর পরিষ্কার। যারা পরিচ্ছন্ন বা চোস্ত ইংরিজিতে নিজেদের শিক্ষার পরিচয় রেখেছে চিঠিতে তাদেরও চিঠির মর্মকথা অশিক্ষিতা মহিলাটির থেকে আলাদা নয়। 'আমার স্বপ্নের নায়কের জীবনে কোনো অঘটন ঘটে গেলে আপনাকে আমি ক্ষমা করতে পারব না। স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই অরুণকুমারকে আমি ভালোবাসি। এ প্রেম মাটির পৃথিবীর ক্ষণিক মোহের ফুল নয়, স্বর্গের অক্ষয় পারিজাত। রুপালী পর্দার বাইরে আমি তাঁকে দেখিনি, দেখার বাসনাও নেই, আমার মনের পর্দা জুড়ে রয়েছে তাঁর নির্মল সুন্দর মুখখানা।' ইংরিজি উদ্ধৃতি দিয়েছে একজন—'ফ্লিং অ্যাওয়ে অ্যাম্বিশন, বাই দ্যাট সিন ফেল দি অ্যানজেলস্।' মর্ম মাথায় ঢোকেনি নিলয়ের। পরে সাদামাটা ইংরিজিতে গালাগাল, সেগুলো বোঝা গেছে। 'একটি অ-স্বাক্ষরিত চিঠি শুধু ব্যতিক্রম। 'আরেকটু বেশি শক্তি কি আপনি ঘুষিটার জন্য ব্যয় করতে পারতেন না?' একটিই মাত্র বাক্য। গতানুগতিক সুরে কথা বলেনি পত্রলেখক বা লেখিকা। তবে কি যে বলতে চেয়েছে তাও নিলয়ের বুদ্ধির অগম্য।

চিঠিগুলো গুছিয়ে একটা গার্টার দিয়ে জড়িয়ে রাখল নিলয়।

খবরের কাগজটা দেখা হয়নি। তুলে নিল। প্রথম পৃষ্ঠার নিচের দিকে একটি খবর। অরুণকুমার বাড়ি ফিরছেন। অরুণকুমার দু'একদিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরবেন। চিকিৎসকরা মনে করছেন তাঁর আর নার্সিং হোমে থাকার দরকার নেই। তিনি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হয়েছেন, তবে কতদিনে কর্মক্ষম হয়ে উঠবেন তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

তাঁকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর প্রয়োজন আছে বলে চিকিৎসকরা মনে করছেন না। অবশ্য আমেরিকার দুই বিশেষজ্ঞ ডক্টর লিও টয় ও ডক্টর টনি টাকলোর সঙ্গে তাঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছেন।

অরুণকুমারের বাড়ি ফেরার সংবাদ ঘনিষ্ঠ মহলে প্রচারিত হবার পর থেকেই শুভেচ্ছা জানাতে বহু লোক আসছেন নার্সিং হোমে। তাঁদের সবাইকে অরুণকুমারের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না। অরুণকুমারের সেক্রেটারির কাছে ফুল ও শুভেচ্ছা-বার্তা পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছেন অনেকে।

খবরের কাগজে আর এগনো সম্ভব হল না নিলয়ের। মাথায় চিন্তার ভিড়।

১৬

ব্রতীন পুরকায়স্থ এ পর্যন্ত ছ'খানা ছবি করেছে। কুড়ি বছরে মাত্র ছ'খানা ছবি পরিচালকের সাফল্যের প্রমাণ নয়। ব্রতীন পুরকায়স্থর ছবিতে টাকা ঢালতে প্রযোজকের আগ্রহ কম, কারণ তার ছবি স্বদেশের বাজারে খদ্দের পায় না, যদিও বিদেশী সমালোচকদের চোখে নাকি তার কোনো কোনো কাজ অসাধারণ ঠেকেছে। ব্রতীনবাবুর এতে মন ভরলেও প্রযোজকের পকেট ভরে না। তারা হাত গুটিয়ে নিয়েছে। ফলে ব্রতীনবাবু সাম্প্রতিককালের একজন অত্যন্ত রাগী পরিচালক। ফিল্ম পাণ্ডিত্য নাকি তার অসাধারণ। কিন্তু মানুষ যদি সে পাণ্ডিত্যের নাগাল না পায় তাহলে দোষটা কার তা নিয়ে গবেষণা চালানো যেতে পারে, মানুষকে ছবি দেখতে বাধ্য করা চলে না।

ব্রতীনবাবুর কয়েকখানা ছবি নিলয় দেখেছে। তার ছবিতে মানুষের সুখ-দুঃখ, সমস্যা, ইঙ্গিত অতীব সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মতা অতি উচ্চ পর্যায়ের হলে অনেকসময় তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা বেশির ভাগ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। ব্রতীনবাবুর সৃষ্ট চরিত্রের সুখ-দুঃখ আবেগ এ দেশের গোলা-বুদ্ধি সাধারণ দর্শকের অচেনা। তারা নিজেদের সুখ-দুঃখ যেমনটি চেনে সিনেমায় তেমনটি দেখতে পেলে খুশি হয়। হিন্দি ছবির বয়স্ক রূপকথার অঢেল আমোদে মজে যেতেও তাদের আগ্রহের অন্ত নেই। ব্রতীনবাবুর বিচরণের ক্ষেত্র এ দুয়ের একটিও নয়। ব্রতীনবাবু হালকা আমোদের ছবি করে না। তার ছবি সিরিয়াস, অতিশয় জটিল মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণাই তার বেশির ভাগ ছবির বিষয়, যে যন্ত্রণার ঠিকানা ডাল-ভাত-রুটির যন্ত্রণার 'সদ্‌গতি'র দেশের মানুষদের জানা নেই। তারা তাই ব্রতীনবাবুর ছবির যন্ত্রণার ভাগ নিতেও আগ্রহ দেখায় না। নিজের সামান্য বিদ্যেবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় নিলয়ের এ রকমই মনে হয়েছে।

ব্রতীনবাবু তার ড্রইংরুম-কাম-লাইব্রেরিতে যত্রতত্র ছড়ানো এবং স্তূপীকৃত পত্র-পত্রিকা ও বইয়ের মধ্যে বসে আছে। গৃহসজ্জা বা সজ্জাহীনতা লক্ষণীয়। খাটের ওপর নায়েবী ডেক্সো। লেখার সরঞ্জাম। খাটের এখানে-ওখানে টুকরো টুকরো লেখা কাগজ দোয়াত নুড়ি অ্যাশ-ট্রে ইত্যাদি দিয়ে চাপা দেয়া আছে।

একটি মহৎ চলচ্চিত্রের অঙ্কুর—চিত্রনাট্য তৈরির কাজ চলছে। দিন কয়েক হল

আইডিয়াটা ব্রতীনবাবুর মাথায় এসেছে। এবং আসামাত্রই কাগজে-কলমে সেটাকে ধরে রাখার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

এ গল্পের প্রযোজকের অভাব হবে না। গত তিন বছরে একটা ছবি ফাইনান্স করার লোকও ব্রতীনবাবু পায়নি। তাদের বক্তব্য—তার ছবি নেবার মতো যোগ্য দর্শক এদেশে হয়নি। দেশটার হল কি ? ছবি না করলেও ব্রতীনবাবুর সংসার অচল হবে না। পৈতৃক সূত্রে যা পাওয়া গেছে তাতেই ছোট্ট সংসার ভালোভাবে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সে টাকায় ছবি তৈরি করবার ঝুঁকি নেয়া যায় না। অথচ ছবি না করেও ব্রতীনবাবুর উপায় নেই। সৃষ্টি! সৃষ্টি! সৃষ্টির যন্ত্রণা! তাই, বাধ্য হয়েই তাকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। না, ছবির বিষয়ে বা ভাষায় কোনো আপস থাকবে না। সেখানে ব্রতীন পুরকায়স্থ ইজ ব্রতীন পুরকায়স্থ। সবাই পুকুরের মাছ। যে যার নিজের পুকুরেই ভালো থাকে। কিন্তু প্রযোজক এবং তারপর দর্শককে টানবার জন্য কৌশলের আশ্রয় নিতেই হবে—মন থেকে পুরোপুরি সায় না মিললেও। প্রতিভা নিয়ে জন্মানোর বড় জ্বালা!

চিত্রনাট্যের একটা জটিল জায়গায় ঠেক খাওয়ার পর চিৎপাত হয়ে শুয়ে ব্রতীনবাবু ভাবতে ভাবতে একের পর এক সিগারেট পুড়িয়ে চলছিল।

—এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। নাম বললেন নিলয় মজুমদার। মিসেস পুরকায়স্থ দরজা থেকে বলল।

তড়াক করে উঠে বসল ব্রতীনবাবু---নিয়ে এসো, নিয়ে এসো। শোন, দু'কাপ চা পাঠিয়ে দিও।

—চা হবে না, দুধ নেই। ঝি আসেনি। তোমার ছেলেকে বললাম, তার সময় নেই দুধ আনবার, আড্ডা মারতে বেরুল। মিসেসের উচ্চারণ যান্ত্রিক, এ ধরনের বাক্যের সহযোগী ক্ষোভ উষ্মা বিরক্তি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

—ঠিক আছে, লেবু চা-ই দিও দু'কাপ।

মিসেস চলে যেতে মুহূর্ত ভাবল ব্রতীনবাবু, মিসেসের কথা বলার ভঙ্গিটা যদি কোনো চরিত্রের অভিনয়ে ব্যবহার করা হয় এ দেশের দর্শক তার কি ব্যাখ্যা করবে? ব্রতীনবাবু তার বিবাহিত জীবনের ইতিহাস স্মরণ করতে চেষ্টা করল। মন্দিরা বরাবর এইভাবে কথা বলত না। একসময় ওর স্বভাবেও যথেষ্ট আবেগ উচ্ছলতা ছিল। ও কবে থেকে নিরাবেগ হতে শুরু করল? কেন? জটিল অনুসন্ধান-প্রক্রিয়া বেশিদূর এগোতে পারল না।

নিলয় ঘরে ঢুকে বলল—নমস্কার।

—বসুন, বসুন। সন্দেহজনক চেহারার একটা চেয়ার দেখিয়ে ব্রতীনবাবু বলল।

শরীরটাকে যথাসম্ভব হালকা করে সাবধানে বসল নিলয়। আস্তে আস্তে চাপ বাড়াল। না, ভেঙে পড়বার ভয় নেই।

একটা তাকিয়া কোলের ওপর রেখে তার ওপর দুই কনুই এবং তদুপরি দুই তালুতে থুতনি রেখে ব্রতীনবাবু বলল—আমার ছবি আপনি দেখেছেন নিলয়বাবু?

—দেখেছি। কয়েকটা।

—কেমন লেগেছে আপনার? মোটা চশমার পেছনে ব্রতীনবাবুর চোখ অন্তর্ভেদী।

নিলয় সময় নিয়ে বলল—ভালোই লেগেছে। তবে সব জিনিস বুঝতে পারিনি।

ব্রতীনবাবু হেসে বলল—দ্যাট্‌স্ অ্যান অনেস্ট কনফেশন। দিস প্রেজেন্ট টাইম—বর্তমান সময় আমাকে পুরোপুরি বুঝবে না। বিকজ আই থিংক অ্যাহেড অব্ মাই টাইম। বহু শিল্পী সাহিত্যিক কবিকে তাদের সময় বুঝতে পারেনি। মনে করবেন না যেন আমি নিজেকে জিনিয়াস বলে দাবি করি, ভাবীকাল আমাকে মাথায় তুলে রাখবে না আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলবে তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমি যা অনুভব করি তা আমাকে বলতেই হবে।

নিলয় বুঝে নিয়েছে তার ভূমিকা আপাতত নির্বাক শ্রোতার। এখন চলছে প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনার পর্ব পার হয়ে আসল বক্তব্যে না পৌঁছতে তার কিছু বলার থাকতে পারে না। এত বইপত্রের সঙ্গে যার বসবাস তার সামনে শ্রোতা হওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

—এ এক তাজ্জব দেশ মশাই, এ দেশে একবার নাম করে ফেললে আপনি দেবতাদের কাছাকাছি চলে গেলেন, আপনি তখন যা ইচ্ছে তা-ই করেই বাহবা কুড়োতে পারেন। সত্যজিৎবাবু পরিচালক হিসেবে কত বড় সে বিচারে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু তিনি পৃথিবীজোড়া নাম করেছেন। অতএব তাঁর সবকিছুই করার রাইট আছে। পড়েছেন ওঁর লেখা সায়েন্স ফিকশন? আইজ্যাক আসিমভ, আর্থার সি ক্লার্ক বা মারে লেইনস্টার যারা পড়েছে তারা সত্যজিৎবাবুর সায়েন্স ফিকশন দু'পাতা পড়তে পারবে না। ও রকম দেনো লেখা কল্পনা করা যায় না। ছোটদের গল্পে উনি অ্যাংজায়েটি নিউরোসিস, প্যারানোইয়া, স্কিজোফ্রেনিয়া, এমন কি প্যারা-সাইকোলজি পর্যন্ত ঢোকাচ্ছেন। এগুলো ছোটদের গল্পের বিষয়? যদি বলেন ছোটদের নিয়ে বড়দের জন্য লেখা, তাহলে বলব ছোট-বড় কারো জন্যই গল্প লেখার যোগ্যতা

সত্যজিৎবাবুর নেই। সাহিত্যের ভাষাই ওঁর কলমে নেই। অথচ হু হু করে বিক্রি হচ্ছে। একদল কাগজওলা ওঁর লেখা নিয়ে নির্লজ্জের মতো স্তাবকতা করে যাচ্ছে। বিদেশের কথা ছেড়েই দিলাম, আমাদের দেশেও সত্যিকারের শিশু-সাহিত্য যথেষ্ট আছে, পাঁঠাগুলোর যদি তাও পড়া থাকত! তাই বলছিলাম, নাম করবার পর এ দেশে আপনি যা ইচ্ছে করে যেতে পারেন। আপনার কি মনে হয়?

—আমি পড়িনি, নিলয় সভয়ে বলল, পড়লেও ভালো লাগা মন্দ লাগার বেশি বলার মতো বিদ্যেবুদ্ধি আমার নেই।

একটি ছোট মেয়ে খাটের ওপর দু'কাপ চা রেখে দিয়ে চলে গেল।

—নিন, চা খান, ব্রতীনবাবু বলল, আপনাকে জিজ্ঞেস না করেই দিয়ে গেল। আপনি লেবু-চা খান তো? আমাদের বাড়িতে আবার দুধ চিনি দিয়ে চা খাওয়ার অভ্যেস কারো নেই।

অনভ্যস্ত লেবু-চায়ে চুমুক দিয়ে নিলয় বলল—ভালোই তো।

—লেবু দিয়ে চা খাওয়া অভ্যেস করুন। ইট্‌স্ গুড। দুধ চিনি দিয়ে চা খাওয়া আর বিষ খাওয়া একই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, যেমন ধরুন আপনাদের অরুণকুমার, ইজ হি অ্যান অ্যাকটর অ্যাট অল? যে কোনো চরিত্রে দিন, একই অভিনয়। অথচ লাখ লাখ টাকা পিটে নিচ্ছে। আসল জিনিস হচ্ছে এডুকেশন, রীয়্যাল এডুকেশন, এডুকেশনই নেই তো হবে কি। পাবলিসিটির হাওয়া তুলতে পারলে লোককে যা ইচ্ছে গেলানো যায়। রুচি তৈরি করবার দায়িত্ব কেউ নিচ্ছে না। কমার্সিয়াল ছবির কথা বাদ দিন, আর্ট-ফিল্মের নামে যা তৈরি হচ্ছে তা-ও কি সত্যিকারের আর্ট-ফিল্ম? সেখানেও দেখবেন রীয়্যাল মোটিভেশন হচ্ছে ব্যবসা—কম পয়সায় ব্যবসা। আইজেনস্টাইন…

আইজেনস্টাইন, চ্যাপলিন, ফেলিনি, গদার, ত্রুফো, সত্যজিৎ, মৃণাল, ন্যু ওয়েভ, থার্ড ওয়ার্ল্ড সিনেমা ইত্যাদির অথৈ জলে নির্বাক নিলয়কে নাকানিচোবানি খাওয়াতে খাওয়াতে যখন তার কান-মাথা ভোঁ ভোঁ করতে শুরু করেছে তখন হঠাৎ ব্রতীনবাবু অন্য প্রসঙ্গ তুলল—আপনি এখন কি করবেন ভাবছেন? অরুণকুমার আর কাজে ফিরতে পারবে কিনা সন্দেহ। পারলেও…

বাক্যটা শেষ না করে নিলয়ের মুখের দিকে চিন্তিতভাবে তাকাল ব্রতীনবাবু।

নিলয় নিরুত্তর।

সময় নিয়ে আবার শুরু করল ব্রতীনবাবু—একটা আইডিয়া আমাকে হণ্ট করছে।

দারুণ কমপ্লিকেটেড থিম। একজন যথার্থ নায়কের অন্তর্লোকের সমস্যা। সে ভালো ছবিতে সত্যিকারের রক্তমাংসের চরিত্রে অভিনয় করতে চায় অথচ ইনডাস্ট্রি তাকে ছকের বাইরে যেতে দেবে না, কেননা তাতেই টাকা। অভিনেতার পক্ষেও বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়, কারণ স্ট্যাটাসের ভূত তার ঘাড়ে চেপে আছে। একটা ভিসাস সাইকেল। নায়ক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। এই সময় হঠাৎ সে প্যারালিসিসে আক্রান্ত হয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিন কাটায়। সেরে ওঠার আশা কম। টাকাপয়সার অভাব নেই, সেরে না উঠলেও তার চলবে। মনে রাখবেন, সেরে না উঠলেও চলবে। এটা তার মুক্তি না মৃত্যু? আমি ঠিক এই জায়গা থেকে শুরু করতে চাই। আমি আপনাকে এই চরিত্রের জন্য ভেবেছি।

চমকে উঠল নিলয়। এতক্ষণ সে মন দিয়ে গল্পটা শুনছিল। মনে হচ্ছিল গল্পটার মধ্যে বস্তু আছে।

—আমি? এ রকম কঠিন চরিত্রে অভিনয় করব আমি? আমি কখনো অভিনয় করিনি।

—আমি করিয়ে নেব।

—আপনি বরং অন্য কাউকে, যেমন ধরুন প্রবালকুমারকে, নিন না।

—ওটা আমার ভাবনা নিলয়বাবু। আপনি রাজী কিনা বলুন। দেখুন, এই অফার রিফিউজ করার আপনার একটামাত্র কারণ থাকতে পারে। আপনি হয়তো ভাবছেন আমার ছবিতে নায়কের রোল করবার পর অরুণকুমারের ডামি আপনি আর হতে পারবেন না। কিন্তু না করলেও কি আর পারবেন? আমি সব খবরই রাখি নিলয়বাবু। আপনার জীবনে ফিল্মে অভিনয়ের প্রথম ও শেষ সুযোগ আমিই আপনাকে দিচ্ছি। নেয়া না-নেয়া আপনার ইচ্ছে। শব্দগুলোকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ভেঙে বলল ব্রতীনবাবু।

নিষ্ঠুর সত্য। বলার ভঙ্গিটা আরো নিষ্ঠুর। ভেতরে ভেতরে তেতে উঠল নিলয়, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বলল—আপনি যা বললেন তা ঠিক। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে। আমার মনে হচ্ছে আপনিও ব্যবসা করতে চান। গল্পটা আপনি ছবি করতে যাচ্ছেন এমন সময়ে যখন অরুণকুমার শয্যাশায়ী—আপনার নায়কের মতোই। আমাকে নায়ক করতে চাইছেন অরুণকুমারের সঙ্গে আমার চেহারার মিলের জন্য। আপনি অরুণকুমারের জনপ্রিয়তাকে এভাবে ব্যবহার করে ছবির কমার্শিয়াল সাকসেসের দিকটা ভাবছেন। ঠিক কিনা বলুন।

ব্রতীনবাবু অল্প সময় চুপ করে থেকে বলল—এসটাব্লিশমেণ্টকে আঘাত করার জন্য যদি আমি এসটাব্লিশমেণ্টের কায়দাই ব্যবহার করি তাতে ক্ষতি কি? আপনারও ক্ষতি নেই।

—না, আমার কোনো ক্ষতি নেই। নিলয় আস্তে আস্তে বলল।

—তাহলে আপনি রাজী?

চুপ করে কয়েক মুহূর্ত বসে থেকে নিলয় বলল—হ্যাঁ, আমি রাজী। আপনি তৈরি হয়ে আমাকে খবর পাঠাবেন। তবে সেভেনটি ফাইভ পারসেণ্ট টাকা আমাকে অ্যাডভান্স দিতে হবে।

ফ্রিজ-শটের মতো স্থির ব্রতীনবাবুর মুখে বিস্ময় ও বিরক্তির আশ্চর্য মিশ্র অভিব্যক্তি।

আর নিলয় ভাবছে অরুণকুমারকে যে টাকা দিতে হয় তার শতকরা দু'ভাগের বেশি তাকে দেয়া হবে না। এবং আগাম টাকাটাই তার নিশ্চিত প্রাপ্তি, বাকিটা অনিশ্চয়তার গর্ভে। যেহেতু (১) সে অরুণকুমার নয়। (২) পরিচালক ব্রতীন পুরকায়স্থ জানে তার ক্ষমতার বহর। যে আদায় করে নিতে অক্ষম তাকে বেশি দেয়ার মতো মূর্খ সংসারে কমই আছে। বিশেষত ব্রতীনবাবুর মতো তত্ত্বজ্ঞানীরা এ প্রকার সরল তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োগে ভুল কদাচ করে না।

শহরের নতুন সম্পন্ন এলাকা। এখানে শহর অনেক মুক্ত, পথের জ্যামিতি পুরনো শহরের মতো তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের মুখ চেয়ে তৈরি ঘিঞ্জি অবৈজ্ঞানিক নয়। চওড়া সমান্তরাল পথ। পথের দু'পাশে সুপরিকল্পিত গাছের সারি। দুপুরের চড়া রোদের তাপও তেমন গা-জ্বালানো মনে হচ্ছে না। হাওয়ার চলাচলে বাধা নেই।

পথে মানুষজন না থাকার মতোই। মাঝে মাঝে ফাঁকা রাস্তায় হু হু ছুটে যাচ্ছে সরকারী-বেসরকারী যানবাহন।

বাসের কনডাক্টর ছেলেটি ভদ্র। নিলয়কে ঠিক জায়গায় নামিয়ে পথের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে।

নিলয় বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে চলেছে। বাড়িগুলি যথেষ্ট ব্যবধান রেখে তৈরি। সুন্দর, খোলামেলা অবশ্যই। অধিকাংশ বাড়িতেই আধুনিক স্থাপত্য-বিদ্যার নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কোনো কোনোটিতে কল্পনা-পরিকল্পনা ইত্যাদির সঙ্গে প্রচুর

অর্থের মিলনে খুব যে সুফল ফলেছে তা বলা চলে না। প্রসাধন কতখানি পর্যন্ত সৌন্দর্যের সহায়ক সেটা জানাও একটা বিদ্যা, না জানলে রূপ খোলে না, বড় জোর অলঙ্কারের আতিশয্যে নির্বোধ অহংকার তৃপ্ত হয়। নম্বর মিলিয়ে যে বাড়ির সামনে নিলয় দাঁড়াল তাকে কিন্তু এ অপবাদ দেয়া যায় না। প্রচুর অর্থের সঙ্গে সুরুচির মেলবন্ধন ঘটেছে। বাড়ির নাম তীর্থভূমি, শ্বেতপাথরের ওপর খোদাই-করা অক্ষর যথার্থ শিল্পীর হাতের কাজ। ডি. কে. বাসু রুচিবান মানুষ নিঃসন্দেহে।

বাড়িতে লোকজন আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সদর দরজা বন্ধ। বাইরে তালা ঝোলানো নেই, অতএব ভেতর থেকে বন্ধ, অর্থাৎ বাড়িতে লোক আছে। কিন্তু তাদের খবর দেয়া যায় কিভাবে? বাইরে কলিংবেল থাকলেও হত।

নিলয়ের সমস্যার সমাধান করতেই যেন একটি মাঝ-বয়সী গোল-পানা ভাবলেশহীন মুখের মানুষ দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলল—আসুন।

লোকটির চেহারা পোশাক-আশাক কাজের লোকের মতো। তাকে নিশ্চয়ই নিলয়কে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য মোতায়েন রাখা হয়েছিল।

নিলয় লোকটিকে অনুসরণ করতে লাগল।

তিনতলায় একটি দামী দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত নিলয় বাড়িতে এই লোকটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করেনি।

—এখানে দাঁড়ান। বলে লোকটি দরজায় দুটো টোকা দিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

সন্তর্পণে কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হল দরজা। একটি সতর্ক মুখ উঁকি দিল।

নিলয় ভালো করে বোঝবার আগেই 'আসুন আসুন' অভ্যর্থনার সঙ্গে বিরাট হলঘরের মধ্যে। পেছনে দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। নিলয় নিজেকে আবিষ্কার করল ছোটখাট একটি স্টুডিও-ফ্লোরে। এয়ার-কুলারের ঠাণ্ডা আমেজ। অনেকগুলি জানলা, কিন্তু সবক'টাই বন্ধ। ঘরের এক কোনায় শোবার ঘরের সেট পড়েছে। আলো ক্যামেরা তৈরি। শুটিং শুরু করলেই হয়। বাড়ির ভেতরে এত আয়োজন, অথচ বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় ঠেকতে লাগল নিলয়ের।

ঘরের ভেতরে নিলয় বাদে আর তিনজন মানুষ। সোফায় বসে নিচু পর্দায় কথা বলছে এক ভদ্রলোক ও একটি মহিলা।

যে ভদ্রলোক নিলয়কে দরজা খুলে দিয়েছিল পাশ থেকে সে বলল—আসুন

নিলয়বাবু, এঁদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দি। প্রথমে নিজের পরিচয় দেয়া দরকার। আমি ডি. কে. বাসু।

—নমস্কার।

নিলয় বাসুর দিকে তাকাল। ছিপছিপে ধারালো চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা ব্যাকব্রাশ-করা চুল, পরনে টি-শার্ট ট্রাউজার, মোটা মাইনাস পাওয়ারের চশমার পেছনে চোখ দুটো ছোট দেখাচ্ছে—কিন্তু অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল। বয়স্ক বুদ্ধিজীবী মানুষের চেহারা বাসুর।

সোফায় বসা ভদ্রলোক ও মহিলা উঠে দাঁড়িয়েছে।

বাসু বলল—নিলয়বাবু, ইনি মিস্টার সান্যাল। আমার প্রোডাকশনের পুরো দায়িত্ব এঁর। আর, আমরা যে ছোট্ট কাজটা করতে যাচ্ছি এ হচ্ছে তার নায়িকা।

নমস্কার বিনিময় করতে করতে নিলয় অপরিচিতা মেয়েটির মুখে লক্ষ্য করল সহজলভ্য অন্তরঙ্গতার হাসি। মেয়েটির মুখে লাবণ্যের অভাব, কিন্তু দেহটি সুঠাম। হঠাৎ নিলয়ের মনে একটা প্রশ্ন খচ্ করে উঠল। মিস্টার সান্যালের পুরো নামটা কি? বিভু সান্যাল? জগদীশদা কি সেদিন এই ব্যক্তিটির কথাই বলেছিল? সৌজন্যের খাতিরে প্রশ্নটাকে চেপে রাখল নিলয়।

—বসুন নিলয়বাবু। বাসু বলল।

বলে ঘরের আরেক প্রান্তে দেয়াল-আলমারির কাছে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এল প্লেটে লাড্ডু জাতীয় দুটো মিষ্টি আর এক গ্লাস জল নিয়ে। নিলয়ের সামনে ছোট টেবিলে রাখল।

—লিন, খেয়্যো লিন। মেয়েটি বলল হেসে।

মেয়েটির অমার্জিত উচ্চারণ বিস্মিত করল নিলয়কে।

—হ্যাঁ, তেতে-পুড়ে এসেছেন, একটু জল মিষ্টি খান, খেতে খেতে আলাপ করা যাবে। বাসু বলল সোফায় নিলয়ের পাশে বসতে বসতে।

নিরুত্তরে একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে কামড় দিল নিলয়। অপরিচিত স্বাদ, সামান্য তিতকুটে মিষ্টি, আর ফিকে বুনো গন্ধ। খেতে মন্দ না।

—নিলয়বাবু, আপনাকে এখন দারুণ প্রব্লেমের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে, তা-ই না? সান্যাল বলল।

—হ্যাঁ। তবে প্রব্লেমটা সাময়িক। নিলয়ের উত্তর সাবধানী।

—আপনি যা-ই বলুন নিলয়বাবু, কথাটা তুলে নিল বাসু, আপনিও জানেন,

আমরাও জানি, অরুণকুমারের ডামি হিসেবে আপনার ফিউচার শেষ। অরুণকুমার সুস্থ হয়ে উঠলে আপনার কোনো চান্সই নেই। আর যদি সে সেরে না ওঠে তাহলে হয়তো আপনাকে দিয়ে জোড়া-তাড়া করে কয়েকটা ছবি শেষ করা হবে। কিছু কাজ আপনি পাবেন। তারপর ?

—প্রব্লেমটা যখন আমার, আমাকেই ভাবতে দিন না।

—সিওর, সিওর, সান্যাল বলল, আমরা বিজনেসম্যান, নিঃস্বার্থভাবে কারো উপকার আমরা করি না। আমরা আপনাকে একটা ওয়াণ্ডারফুল ওপেনিং দেব। প্রচুর টাকা—ইজি মানি। আমরাও নিশ্চয়ই প্রচুর টাকা লাভ করব। সত্যি বলতে কি, আপনার প্রব্লেম-টব্লেম নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। আমাদের প্রব্লেম নিয়েও আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। ইট্‌স্ এ বিজনেস ডিল। বাসু সাহেব আর যা-ই হোন দানছত্র খুলে বসার লোক নন। আপনাকে দিয়ে ওঁর কাজ হবে বুঝেই উনি অলরেডি নাণ্টুবাবুকে এক হাজার টাকা দিয়েছেন।

—নাণ্টুবাবুকে টাকা দিয়েছেন ? কেন ? রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল নিলয়।

—আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার পারিশ্রমিক বলতে পারেন, দালালিও বলতে পারেন। সান্যাল কালো-কালো ছোপধরা দাঁত বের করে হাসল।

মেয়েটি এখন নিলয়ের পাশে বসে আছে। এবং দু'জনের ব্যবধান এমন সঙ্কীর্ণ করে এনেছে যে নিলয় ওর শরীরের নরম স্পর্শ পাচ্ছে। পাচ্ছে পুরনো নারকেল তেল আর চড়া সেণ্টের গন্ধ।

মেয়েটি নিলয়ের হাতে হাত রাখল। নিলয় মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। মেয়েটি ভারি ঠোঁটের নির্লজ্জ হাসি উপহার দিয়ে নিলয়ের আঙুলগুলো পেঁচিয়ে ধরল নিজের আঙুলে।

ওর অপরিচ্ছন্ন পরিচয় এখন নিলয়ের কাছে স্পষ্ট, তবু নিলয় হাত সরিয়ে নেবার তাগিদ বোধ করল না। হঠাৎ যেন তার সহনশীলতা অদ্ভুত বেড়ে গেছে, এবং স্নায়ুগুলো অনুভূতির তীক্ষ্ণতা হারিয়ে স্থির নরম আমেজ ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা শরীরে।

নিলয় মুখ নিচু করে ভাবতে লাগল। মেয়েটি তার আঙুল নিয়ে খেলা করে চলেছে। ওর শরীর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে লেপটে আছে নিলয়ের শরীরের সঙ্গে। অথচ নিলয় উত্তেজনা বা বিরক্তি বোধ করছে না। আশ্চর্য! ও নির্বিকারভাবে ভেবে চলেছে। কি এমন কাজ যে তার মতো একজন নগণ্য ব্যক্তির সঙ্গে শুধু যোগাযোগ করিয়ে দেবার পারিশ্রমিকই এক হাজার টাকা ? অবশ্য রহস্যটা অল্প পরেই আর রহস্য

থাকবে না। কিন্তু যা বলবার ওরাই বলুক, নিলয় আগ্রহ দেখাবে না।

—সান্যাল, তোমার কি মনে হয় থ্রি-এক্সই তোলা যাক? ডিটেলস্‌গুলো ভালো আসবে।

—না বাসু সাহেব, ডাবল এক্সই ভালো হবে। ডিটেলস্ কম থাকবে বটে, কিন্তু লংশটে নিলয়বাবুকে হুবহু অরুণকুমারের মতো দেখাবে। সে আমি বুঝে নিয়েছি। দ্যাট উইল সার্ভ আওয়ার পারপাজ বেটার। অরুণকুমারের অ্যাডভানটেজ থাকলে থ্রি-এক্স এর চেয়ে ডাবল এক্স-এর দাম বেশি পাওয়া যাবে। ফান্টুসওলারা কি করছে? শ্রেফ অন্য বডির ওপর পপুলার কোনো আর্টিস্টের মাথা বসিয়ে দিচ্ছে। অর্ডিনারি ফান্টুসের চেয়ে এর দাম অনেক বেশি। এখানে আমরা ডাবল এক্স করলে পুরো অরুণকুমারকে পাচ্ছি। বুঝুন! নামটাও আমার মাথায় এসে গেছে। অরুণকুমার অ্যাণ্ড মিস্মি। হাঃ হাঃ।

—রাইট।

সাংকেতিক শব্দগুলোর অর্থ নিলয়ের জানা নেই। তবে সে বুঝতে পারছে অরুণকুমারের সঙ্গে তার চেহারার মিল এদের কাছেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

নিলয় মুখ তুলল। তাকাল বাসুর মুখের দিকে। চোখে প্রশ্ন।

—আরে, আপনাদের দু'জনে বেশ ভাব হয়ে গেছে দেখছি, বাসু হাসল, খুব ভালো, খুব ভালো, আফটার অল ইউ আর পার্টনারস্।

—হ্যাঁ, খুব ভাব হয়ে গেছে, নিলয় ভাবলেশহীন গলায় বলল, তা, আপনাদের প্রস্তাবটা জানতে পারলে এবার ভালো হয়।

—জাস্ট এ মিনিট। সান্যাল, নিলয়বাবুকে ট্যাঙ্গো অ্যাণ্ড ববিটা দেখিয়ে দাও। নিলয়বাবু, আপনাকে একটা ফিল্ম দেখাচ্ছি। ভালো করে দেখে রাখবেন। ইউ হ্যাভ টু রিপিট দোজ থিংস। কোনো চিন্তা নেই। দিস লেডি ইজ ভেরি হেল্প্‌ফুল। সান্যাল এক্সসেলেণ্ট ক্যামেরাম্যান। ঘণ্টা চারেকের কাজ। আপনাকে আমরা চারটের মধ্যে ছেড়ে দেব।

সান্যাল একটা প্রোজেকটর অ্যাডজাস্ট করছে। দেয়ালে আলোর আয়তক্ষেত্রটা বাড়ছে কমছে। শব্দ হচ্ছে কিরকির করে।

মিনিট খানেক পরে সান্যাল বলল—ঠিক আছে।

সুইচ টেপার শব্দ হল। ঘরের আলোগুলো নিভে গেল। কয়েক সেকেণ্ড নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তারপরই প্রোজেকটর থেকে আলোর বিচ্ছুরণ দেয়ালে গিয়ে ফুটিয়ে তুলল

তিনটি শব্দ—স্যাণ্ডো অ্যাণ্ড ববি।

—নিলয়বাবু, পাশ থেকে নরম গলায় বলে চলল বাসু, পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণী দুটো ইনস্টিংক্ট নিয়ে জন্মায়। প্রিজারভেশন অ্যাণ্ড রিপ্রোডাকশন অব্ লাইফ। রিপ্রোডাকশনের প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষের মধ্যে দেখা দেয় অদম্য যৌন আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার নানাভাবে প্রকাশ ঘটছে, বিকাশ ঘটছে। এবং এটা ঘটছে প্রাকৃতিক নিয়মেই। এর মধ্যে অনেকে বিকৃতি আবিষ্কার করে। আমরা বলি, না, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক জিনিস। প্রকৃতি মানুষের মধ্যে যে অফুরন্ত আনন্দের উপকরণ ঢেলে দিয়েছে তাকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার অধিকার মানুষের জন্মগত। কিন্তু কিছু নকল নীতিবাগীশ আইন করে মানুষের এই জন্মগত অধিকারকে খর্ব করতে চায়। এদের হাতে ক্ষমতা, আইন, স্টেট-পাওয়ার। কিন্তু আমরা মানি না। আমরা তাই মানুষের চরম আনন্দের দৃশ্য ফিল্মে ধরে রাখি, মানুষকে চূড়ান্ত আনন্দের আস্বাদ দিতে চাই। আমরা আনন্দের কারবারী—ডিলারস্ ইন প্লেজার। হ্যাঁ, উই মেক মানি আউট অব্ ইট। পৃথিবীতে কিছুই বিনা মূল্যে পাওয়া যায় না। আনন্দ পেতে হলেও টাকা দিতে হয়।…

এ পাশ থেকে চলছে বাসু সাহেবের অবিরাম কথকতা, অন্যদিক থেকে মেয়েটি নিলয়ের নিরুত্তর শরীরটাকে নিয়ে দু'হাতে ইচ্ছামতো খেলা করে চলেছে। নিলয়ের ঠাণ্ডা ঘাড়ে গালে পড়ছে ওর ঘন গরম নিশ্বাস। ভারি ঠোঁট দুটো বারবার নিলয়ের গালে ঠোঁটে নিবিড় হয়ে আসছে।

আর দেয়ালের ওপর চলছে একটি বলিষ্ঠ নিগ্রো যুবকের সঙ্গে একটি শ্বেতাঙ্গ যুবতীর অবিশ্বাস্য কামকেলি।

নিলয়ের মনটা ধীরে ধীরে বুনো মোষের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে শিং উঁচিয়ে দাঁড়াচ্ছে। বুকের ভেতরে পাথুরে ঠাণ্ডা ক্রোধ।

তার আর বুঝতে বাকি নেই যে সে একটা ব্লু-ফিল্ম দেখানো ও তোলার আখড়ায় এসে পড়েছে। এতকাল সে শুনেই এসেছে, কিন্তু এটা যে সমাজের আপাত-সুস্থ চেহারার আড়ালে কতখানি গভীরে শিকড় ছড়িয়েছে তা জানার সুযোগ হয়নি। ছি ছি, মানুষ কোন্ অধঃপাতে নেমে গেলে নিজের বোনের স্বামীকে এখানে পাঠিয়ে টাকা নিতে পারে! নাণ্টুকে শিক্ষা দেবার সুযোগ এই মুহূর্তে তার নেই। কিন্তু অপমানের কিছুটা অন্তত এই ভদ্রবেশী কুকুর দুটোকে ফিরিয়ে দিতে হবে। নিলয় তার অসম্ভব মানসিক দৃঢ়তা ও স্নায়ুহীন শীতলতায় অবাক।

ছবি শেষ হল। ঘরের আলো জ্বলে উঠল। বাসুর অনর্গল তত্ত্বকথা

তখনো চলেছে।

—প্লিজ মিস্টার বাসু, এক ঝটকায় মেয়েটির হাত সরিয়ে টান টান হয়ে উঠে দাঁড়াল নিলয়, আপনার থিয়োরি থামান। কি করতে হবে বলুন।

—যা দেখলেন তা-ই।

—বেশ। কত দেবেন?

—ক্যাশ ডাউন এইট থাউজ্যাণ্ড। এবং মেনি মোর সাচ্ অফারস্ ইন ফিউচার। বাসু হাস্যময়।

—ঠিক আছে। আমি রাজী, নিলয়ের মনে একটা কূট দাবাড়ু কাজ করছে, কিন্তু ছবি তোলার আগে মেক-আপ দিয়ে আমার অরুণকুমার-অরুণকুমার চেহারাটা পালটে দিতে হবে।

—কি বলছেন আপনি, আঁতকে উঠল সান্যাল, ওটাই আপনার আসল অ্যাসেট। নইলে পাঁচশো দিলে আচ্ছা আচ্ছা পাঠ্ঠাই জোয়ান ছোকরা পাওয়া যায়।

—এই ফ্যানটাসটিক টাকাটা দিচ্ছি সিমপ্লি ফর ইওর অ্যাপিয়ারেন্স। বাসু বলল।

—আমার অ্যাপিয়ারেন্স বলবেন না, বলুন অরুণকুমারের অ্যাপিয়ারেন্স। অরুণকুমারকে দেখাতে হলে অরুণকুমারের যা মিনিমাম ফী তা-ই আমাকে দিতে হবে।

—কত চান আপনি? বাসু জিজ্ঞেস করল।

—তিন লাখ। নিলয় ছোট্ট শব্দ দু'টিকে টেনে যথাসম্ভব দীর্ঘ করল।

—আর ইউ ম্যাড! বাসু লাফিয়ে উঠল।

—হতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনার চিকিৎসায় সেরে উঠেছি। ধন্যবাদ।

—আপনি এ রকম করবেন জানলে আমি অ্যারেঞ্জমেণ্টস্ করতাম না, বাসু মুখের চেহারা গম্ভীর করল, জানেন আমার কত টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে।

—যদি মনে করেন আপনার সঙ্গে আমার কোনোরকম চুক্তি হয়েছিল, নিলয় বলল, চুক্তিভঙ্গের জন্য মামলা করতে পারেন।

—নিলয়বাবু, আপনার কালচার এডুকেশন কি আপনার থেকে অন্তত পঁচিশ বছরের বড় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে শিখিয়েছে? আপনি জানেন আমাদের সম্পূর্ণ ব্যবসাটাই চলছে বিশ্বাসের ওপর। আমরা মানুষকে বিশ্বাস করি। খাতাপত্র হিসাব আমাদের থাকে না…

—রাখা সম্ভব নয়। নিলয় ধরিয়ে দিল।

—হ্যাঁ, রাখা সম্ভব নয়। নাণ্টুবাবু আমাকে ওয়ার্ড অব্ অনার দিয়েছিলেন।

—নাণ্টুবাবুর নামের সঙ্গে ওয়ার্ড আর অনার শব্দ দুটো মানায় না। দেখা হলে ওকে বলবেন ওর জন্য একজোড়া নতুন চপ্পল আমি কিনে রাখব। ওর গালে ছোঁড়বার জন্য।

সান্যাল এক মুঠো লাড্ডু নিয়ে খেতে খেতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।—ছি ছি ছি নিলয়বাবু, নাণ্টুবাবু আপনার স্ত্রীর বড়ভাই। তার সম্পর্কে এ ধরনের···

নিলয় সান্যালকে বাধা দিয়ে বলল—চপ্পল জোড়ার এক পাটি নাণ্টুবাবুর গালে ছিঁড়ব আমি, আরেক পাটি ছিঁড়বেন আমার স্ত্রী। আমাদের এইসব অভদ্র আচরণ নিয়ে আপনাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। আচ্ছা, আপনার নাম কি বিভু সান্যাল?

—হ্যাঁ।

—চমৎকার। তাহলে তিন লাখ আপনারা দিতে পারছেন না? চলি তাহলে।

দরজার দিকে এগোল নিলয়।

বাসু ছুটে এসে বলল—এখনো ভেবে দেখুন নিলয়বাবু। এ সুযোগ আর পাবেন না।

নিলয় দাঁড়াল। মুখে হাসি।—একটা আইডিয়া দিতে পারি। ভেবে দেখতে পারেন। আমার বদলে আপনি বা মিস্টার সান্যাল নেমে যান ঐ বেশ্যাটার সঙ্গে। চমৎকার একটা কমিক ব্লু-ফিল্ম হবে।

তেড়ে এল মেয়েটি। অশ্লীল গালাগাল করতে লাগল। নিলয় নির্বিকার।

—নিলয়বাবু, আপনি যেতে পারেন। আজ যা দেখলেন তা যেন বাইরে প্রকাশ না পায়। পরিণাম ভালো হবে না। বাসুর মুখের চেহারা অত্যন্ত কঠিন ও নিষ্ঠুর।

—ভয় দেখাবেন না। ভয় আমি আর পাই না। বলে হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল নিলয়।

বাস থেকে নেমে নিলয় প্রথমে ঢুকল বাজারে। সুন্দর একটা ফুলের তোড়া কিনল। দোকানীর কাছ থেকে এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিয়ে লিখল—আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি—নিলয় মজুমদার। কাগজটা ফুলের তোড়ার ওপর এঁটে দিল।

নার্সিং হোমের বাইরে সারি সারি গাড়ি। এখানে-ওখানে মানুষের জটলা।

নিলয় টুপি আর গগলস্ খুলে ফেলল।

তারপর কোনোদিকে না তাকিয়ে রিসেপশন কাউন্টারে গিয়ে বলল—আমি অরুণকুমারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কাউন্টারের মেয়েটি বলল—আপনার নাম ?

—নিলয় মজুমদার।

—আমি খবর পাঠাচ্ছি। তবে দেখা বোধ হয় হবে না। উনি খুব কম লোকের সঙ্গেই দেখা করছেন, আপনি অপেক্ষা করুন।

—আপনি বরং বোকেটা ওঁকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন। তারপর যদি আমাকে যেতে বলেন যাব। আমি বলছি।

—দিন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ফুলের তোড়াটা ফেরত এল নিলয়ের হাতে। কাগজের টুকরোটার উলটো পিঠে লেখা—আপনি আর কখনো আমার সঙ্গে যোগা-যোগ করবার চেষ্টা করবেন না।

কাগজটা দেখতে দেখতে নিলয়ের মুখে একটা অদ্ভুত হাসির আভাস ফুটে উঠল।

ও তরতর করে নেমে এল রাস্তায়। কাগজটা উড়িয়ে দিল হাওয়ায়। ফুলের তোড়াটা দোলাতে দোলাতে খুশির চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হাঁটতে লাগল।

বারো-তেরো বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার ধারে। কাঁধে ঝোলানো স্কুলের ব্যাগ।

নিলয় মেয়েটির কাছে গিয়ে বলল—মামণি, তুমি ফুলগুলো নেবে ?

মেয়েটি ইতস্তত করতে লাগল।

—নাও না। নিলয় মিনতির স্বরে বলল।

এবার হাসিমুখে হাত বাড়াল মেয়েটি।

নিলয় মেয়েটির হাতে ফুলের তোড়াটি দিয়ে বলল—লক্ষ্মী মেয়ে। তুমি আমার ছোট্ট মা।

তারপর রাস্তা পার হয়ে বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়াল। হাতঘড়িতে সময় দেখল। বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। তা হোক। মা নিনা ভাববে। তাহলেও উপায় নেই, শহরের দুই প্রান্তে দু'টি মানুষ তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাদের কাছে তাকে আজই যেতে হবে। এখনই।